বারাকপুরের
সেকাল একাল

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা ঃ কানাই পদ রায়

BARRACKPORER SEKAL EKAL

Vol.-II

Edited By Kanai Pada Roy

প্রকাশ কাল ১০ ডিসেম্বর, ২০০০
প্রকাশক কানাই পদ রায়, সম্পাদক, নগর পেরিয়ে
প্রচ্ছদ চিত্র হালিশহর বারেন্দ্রগলির একটি শিব মন্দিরের টেরাকোটা
প্রচ্ছদ চিত্রশিল্পী পরিতোষ দাস
অলংকরণ শ্যামসুন্দর বেরা
ডি টি পি কম্পোজ ও মুদ্রণ লেজারপ্লাস, ২০, নোনাডাঙা রোড
শেওড়াফুলি, হুগলী, দূরভাষ : ৬৩২-৫১৭৯
প্রাপ্তিস্থান দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মূল্য ৭০ টাকা মাত্র

বিষয়সূচি

হালিশহরের কথা

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও।।"

'বারাকপুরের সেকাল একাল', দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পুরানো দলিল, মানচিত্র এসবের সাহায্য নিয়ে বারাকপুর মহকুমাকে সামগ্রিকভাবে এবং হালিশহর, ইছাপুর ও নবাবগঞ্জ—এই তিনটি প্রাচীন জনপদকে পৃথকভাবে মননশীল প্রবন্ধ, তথ্য, পরিসংখ্যান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে এই খণ্ডে। তথ্য সন্নিবেশনে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, উত্তর ২৪ পরগণা গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য পেয়েছি। সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য'র ব্যক্তিগত উদ্যোগ মুগ্ধ করেছে। হালিশহর নিবাসী অলোক মৈত্র, গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর শর্মা ও পরিতোষ দাস প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেছে। আনন্দপ্রসাদ রায় গ্রন্থটির বিকাশে সদা সচেষ্ট, নারায়ণ চন্দ্র সাহাও সাহায্য করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে আমার সঙ্গী হয়ে তথ্য সংগ্রহে এবং শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করেছেন। লেজারপ্লাস'র শ্যামসুন্দর বেরার তত্ত্বাবধানে সুমন্ত গোস্বামী, সুতপা ভট্টাচার্য ও অন্যান্য সহকর্মীরা অক্ষর বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। ছোট কাগজ 'নগর পেরিয়ে'র পক্ষ থেকে এঁদের সকলকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

এইসব জনপদের অনেক তথ্য অজানা থেকে গেল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কোন গবেষক এ ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন, আশা করি।

বানান প্রসঙ্গে

সেনাদের ব্যারাক থেকে 'বারাকপুর' নামকরণ হয়নি, সেকারণে এই গ্রন্থে 'ব্যারাকপুর' বানান লেখা হয়েছে 'বারাকপুর'। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে রেফ-এর পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (র্য্য) বর্জন করা হয়েছে। কিন্তু স্মরণিকা/অন্যভাবে সংগৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। এই গ্রন্থে 'হালিশহর' ও 'হালিসহর' দু'টি বানানই ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালে 'হালিসহর' বানানটির প্রচলন বেশি থাকলেও বানান দু'টির পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি না থাকায় এবং ইংরেজি বানানে 'Sh', 'শ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকায় বানান 'হালিশহর'র প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। তাছাড়া, ফার্সী শব্দ 'শহ্‌র্‌'-এর বানান 'শহর' এবং 'সহর' দুটোই হয়ে থাকে।

বারাকপুর ১০ ডিসেম্বর, ২০০০

ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে ২২ অগাস্ট ১৯৯৯ তারিখে 'বারাকপুরের সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করছেন। পাশে সম্পাদক অধ্যাপক কানাইপদ রায়।

প্রথম অধ্যায়

বারাকপুরের কথা

নদীর বুকে সোহাগ ভরে মহকুমা বারাকপুর, প্রাচীন কাব্যে

—————————— কানাইপদ রায়

উত্তর ২৪ পরগণার পশ্চিমে হুগলী নদী বারাকপুর মহকুমাকে স্পর্শ করে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। এই নদীপথ ধরেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ছত্রভোগ হয়ে নীলাচলে গেছেন; চাঁদ সদাগর গেছেন বাণিজ্য যাত্রায়। হুগলী নদীর পূর্বতীর ধরে বারাকপুরের প্রাচীন জনপদগুলি দাঁড়িয়ে আছে স্বমহিমায়। বেশকিছু প্রাচীন জনপদ রয়েছে বারাকপুরে—বীজপুর, কাঞ্চনপল্লী, নৈহাটি, কুমারহট্ট, গরিফা, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, মূলাজোড়, গারুলিয়া, ইছাপুর, বাঁকিবাজার, দিগঙ্গ, চাণক, বুড়নিয়া, খড়দহ, আগরপাড়া, সুকচর, কামারহাটি এবং আড়িয়াদহ প্রভৃতি। এইসব জনপদের অনেকেরই উল্লেখ আছে প্রাচীন কাব্যে।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যে (১৪১৭ শকাব্দ = ১৪৯৫ খ্রীঃ) চাঁদসদাগর বাণিজ্য যাত্রাপথে ত্রিবেণীতে অবস্থানের পর আবার ডিঙা ভাসিয়ে সিংহল অভিমুখে রওনা হল—

দিন দুই তথা বহি মেলিল বুহিত[১]।
কুমারহট্টে[২] গিয়া ডিঙা হইল উপনীত।।

বীজপুর ও কাঞ্চনপল্লী (বর্তমান কাঁচরাপাড়া)—প্রাচীন জনপদ হিসেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা আলোকিত করলেও, প্রাচীন কাব্যে তাদের উপস্থিতি কদাচিৎ চোখে পড়ে। এই দু'টি জনপদের পরই আমরা পাই কুমারহট্ট, তারপর—

"ডাহিনে হুগলি বহে বামে ভাটপাড়া
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্বে কাঁকীনাড়া।

১। বুহিত = নৌকো, ২। কুমারহট্ট = হালিশহর।

মূলাজোড় গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর
পশ্চিমে পাইকপাড়া বাহে ভদ্রেশ্বর।
চাঁপদানি ডাহিনে বামেতে ইছাপুর
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে বাঁকিবাজার[১] বাহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বাহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে[২]।
পুজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম।
চানক[৩] বাহিয়া যায় বুড়নিয়ার[৪] দেশ
তাহার মেলান বাহে আকনা মাহেশ।
খড়দহে শ্রীপাট করিয়া দণ্ডবত
বাহ বাহ বলি রাজা ডাকে অবিরত।
রিসিড়া ডাহিনে বাহে বামে সুকচর
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর।
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে
পূর্বেতে আঁড়িয়াদহ ঘুসুড়ি পশ্চিমে।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে (১৪৬৬ শকাব্দ = ১৫৪৪ খ্রীঃ) শ্রীমন্ত সাধুর সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"গরিফা বাহিয়া সাধু বাহে গোন্দলপাড়া
জগদ্দল এড়াইয়ে গেলেন নপাড়া।।
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা।।
উপনীত হইল নিমাই তীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা জবা ফুল ফোটে।
ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রয়।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ কয়।"

গঙ্গার উৎস থেকে সাগরে মিলে যাওয়া পর্যন্ত পথের বিবরণ দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র যে 'সুরধুনী' কাব্য (১৮৭১) লেখেন, সেখানে তিনি অতি অল্পকথায় কয়েকটি জনপদের চারিত্র্যলক্ষণসহ নাম উল্লেখ করেছেন—

১। বাঁকিবাজার=নবাবগঞ্জ, ২। দিগঙ্গ=মণিরামপুর, ৩। চাণক=বারাকপুর, ৪। বুড়নিয়া =টিটাগড়।

"বামে হালিশহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য-গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী—পরিপাটী,
পণ্ডিত মণ্ডলী করে শাস্ত্র আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড়দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন
কলকণ্ঠ-কলে করিত কলন,
সুললিত পদাবলী, বিরচিত তাঁর,
সকল কথক-সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পী সাধু যাঁহার রচিত।

মূলাযোড়, ইছাপুর, সশস্ত্র চাণক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়রঞ্জক।
গোঁসাই-গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম,
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা শোভিত,
গাইতেছে নরনারী দেভিদ সঙ্গীত।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাডেমি থেকে প্রকাশিত) পাই—

"বামভাগে হালিসহর ডাহিনে ত্রিবেণী
দুন্দলের কোলাহলে কিছুই না শুনি।" (পৃঃ ২০১)
"গরিফা বহিআ সাধু বায় ভাগীরথী
করতোআ এড়াইআ পাইল সরস্বতী।" (পৃঃ ২৩৮)

তথ্যসূত্র : 'মনসাবিজয়'—ড. সুকুমার সেন সম্পাদিত এশিয়াটি সোসাইটি থেকে প্রকাশিত; রঙ্গলাল রচনাবলী—ড. শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—শ্রী অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক পরিচিতি : অধ্যাপক

বারাকপুর মহকুমা, স্মৃতির চিত্রণে নজরুল

—বাঁধন সেনগুপ্ত

অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার বারাকপুর মহকুমার উত্তরাংশের সঙ্গেই কাজী নজরুল ইসলামের যোগাযোগ ছিল বেশি। তুলনায় জেলার দক্ষিণাংশের সঙ্গে কিছুটা কম। আসলে কলকাতার কাছাকাছি উত্তরাংশের অঞ্চলগুলিতে তখন রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও একাধিক বিখ্যাত লেখকদের অবস্থানভূমি ছিল জেলার শহরতলী সংলগ্ন এই বিশাল অঞ্চল। বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, আড়িয়াদহ, বেলঘরিয়া, পানিহাটি, বারাকপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁচরাপাড়া বা হালিশহর দীর্ঘকাল বাংলাসাহিত্যের বহু দিক্‌পাল লেখকের পদচারণায় ধন্য হয়ে এসেছে। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেম বাগচী, মোহিতলাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত এই অঞ্চলের সাহিত্য ও তার ইতিহাস তাই চিরকালীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। কাজী নজরুল ইসলামেরও তাই একাধিকবার আগমন ঘটেছিল এই জেলার উত্তরাংশে। সেই ঐতিহ্যের আকর্ষণে তিনি বারাকপুর মহকুমার নানাপ্রান্তে ছুটে এসেছিলেন।

বস্তুত অন্যান্য কবি বা লেখকদের এই জেলায় আগমনের কারণ ছিল মূলত সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যিক সংসর্গ। যেমন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আসতেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে হালিশহরে ও নৈহাটিতে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আসতেন সমকালীন সাহিত্য জগতের রথী-মহারথীরা। পানিহাটিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও সাহিত্যচর্চা পেনেটির যে গৌরব বাড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাজী নজরুলের এই জেলার উত্তরাংশে আগমনের কারণ শুধু সাহিত্য সংসর্গ বা সাহিত্যচর্চাই নয়, এই জেলার রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য ও বৈপ্লবিক তৎপরতাই ছিল নজরুলের একাধিকবার আগমন ও অবস্থানের কারণ। আসলে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবন ছিল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় পরিপূর্ণ। এমন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক যোগাযোগ সেকালে আর কোনো কবি বা লেখকের ছিল না। ফলে নজরুলের এই জেলায় উপস্থিতি ও কর্মচাঞ্চল্য নানাকারণেই ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত।

বিশের দশকের গোড়ায় নজরুল প্রথম এই জেলায় এসেছিলেন। নৈহাটির মিত্রপাড়া লেনের কবি সুবোধ রায় ছিলেন নজরুলের অনুরাগী। নৈহাটির বর্ধিষ্ণু এলাকা মিত্রপাড়ায় সুবোধ রায়ের বাড়িতে প্রায়ই সাহিত্যের আড্ডা বসত। 'বিজলী'

পত্রিকা প্রকাশপর্ব (ডিসেম্বর ১৯২১) থেকেই কবি সুবোধ রায় ও নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত সেই পত্রিকার সহ-সম্পাদক। সুবোধ রায় নজরুলকে প্রায়ই নৈহাটিতে নিয়ে আসতেন। সেই আড্ডায় আর যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নৈহাটির কবি ও শিক্ষক খগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মাদরাল অঞ্চলের কালিদাস ঘোষাল, ওমর খৈয়াম অনুবাদক কবি বিজয় ঘোষ, প্রাবন্ধিক এ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও তরুণ সাহিত্যিক মন্মথ ভট্টাচার্য। মিত্রপাড়ার লাগোয়া শ্যামাসুন্দরীতলায় থাকতেন খগেন্দ্রনাথ ঘোষ। নজরুল সেখানে তাঁর বাড়িতেও যেতেন। সে সময় নৈহাটির তরুণ সাহিত্যসেবীরা প্রকাশ করতেন 'খেয়ালী' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা। সেই পত্রিকার আড্ডা বসত যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে। নজরুল সে আড্ডায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। তাঁর উপস্থিতিতে তরুণ লেখকের দল উৎসাহিত হতেন। 'খেয়ালী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। তিনি নিয়মিত গঙ্গা পার হয়ে নৈহাটিতে সাহিত্যের আড্ডায় উপস্থিত থাকতেন। পত্রিকার অন্য দুই সম্পাদক ছিলেন মন্মথ ভট্টাচার্য ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ মল্লিক। পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করবার জন্যে নজরুল ১৯২৪ সালে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় 'খেয়ালী' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। বছর ত্রিশেক পরে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় সেই কবিতাটি তাঁরই লিখিত 'কাজী নজরুল' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ ২৬মে ১৯৫৫) পুনরায় সংযোজিত করেছিলেন। কবি লিখেছিলেন—

কবি শ্রীমান প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু
আয়রে পাগল আপন বিভোল
খুশির খেয়ালী
হাতে নিয়ে রব বেণু
রঙীন পেয়ালী।
ভোজপুরীদের প্রমত্ততায়
মাতুক ওরা রাজার সভায়।
আঙ্গিনাতে জ্বালরে ও তুই
অরুণ-দেয়ালী
ওরে খুশির খেয়ালী।

হুগলী ২০.১০.২৪ শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

পত্রিকা 'খেয়ালী'র সঙ্গে সেকালের খ্যাতনামা অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন। যেমন কবি সুনির্মল বসু। তাঁর কবিতা ও ছবি 'খেয়ালী'তে ছাপা হত। এছাড়া যাঁরা লিখতেন বা নৈহাটিতে 'খেয়ালী'র আসরে এ্যাডভোকেট যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়িতে যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি হেমচন্দ্র বাগচী, চণ্ডী মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শ্যামাসুন্দরীতলার প্রাবন্ধিক খগেন্দ্রনাথ ঘোষও ছিলেন নজরুলের খুবই ঘনিষ্ঠ। দুজনেই ছিলেন প্রায় সমবয়েসী। খগেন ঘোষ হিসেবমতো নজরুলের জন্মের ঠিক পরের মাসে অর্থাৎ ২৪ শে জুন (মতান্তরে ২১শে ১৮৯৯) তারিখে জন্মেছিলেন। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, নজরুল নাকি খগেনের হাত দেখে বলতেন, জুন মাসে জন্মেছ বলে তুমি ঘর বাঁধতে পারবে না। আমি মে মাসে জন্মে গৃহী হব। খগেন ঘোষ ব্যক্তিজীবনে শেষ পর্যন্ত অবশ্য অকৃতদার হিসেবেই কাটিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ১৫ জুন তারিখে সমাজসেবী ও আজীবন শিক্ষাব্রতী খগেন্দ্রনাথ ঘোষ নৈহাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। মৃত্যুর আগে এই নজরুল-সখা তাঁর মূল্যবান বিশাল গ্রন্থাগার, সঞ্চিত অর্থ এবং বসতবাটি সবই দান করে গিয়েছিল।

আগেই বলেছি, নৈহাটিতে নজরুলের আগমন কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা বা সাহিত্য সংসর্গের কারণেই নয়। নৈহাটি-ভাটপাড়া-গরিফা-হালিশহর অঞ্চলের যুবসমাজের মধ্যে যে রাজনৈতিক তৎপরতা ও বিপ্লবী সচেতনতা ছিল নজরুলের এই অঞ্চলে আগমনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ তাই। নৈহাটিতে এলে যুবসমাজ নজরুলকে নিয়েই মেতে থাকতেন। ইচ্ছে হলে কলকাতা থেকে ফেরার পথে নৈহাটিতে এসে তাই তিনি রাত্রে থেকে যেতেন এবং তাঁর দু'চার দিন নৈহাটিতে অবস্থানকালে গানে, আবৃত্তিতে ও নতুন নতুন লেখা পাঠ করে নৈহাটির মানুষকে মাতিয়ে তুলতেন তিনি। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সেদিনের এসব ঘটনার সাক্ষী। তাঁর মতে, 'নজরুলকে সবাই তাঁদের বাড়িতে সাদরে নিয়ে গিয়ে নরনারী নির্বিশেষে আদর করত, খাওয়াত। তাঁর কথা, গান ও আবৃত্তি শুনবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। নৈহাটির যাঁরা স্থায়ী বাসিন্দা তাদের মধ্যে একটা সহজাত সাহিত্যপ্রিয়তা ছিল। তাই নজরুলকে পেয়ে যেন তাঁদের উৎসাহ শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল।'

লক্ষণীয়, ১৯২৪ সালে দেশে যখন গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তখন চব্বিশ পরগণার বারাকপুর মহকুমার যুবসমাজও তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেন নি। খেলাধুলার মাধ্যমে একদিকে যুব সমাজকে স্বাস্থ্যচর্চা ও চরিত্রগঠনে সাহায্য করা এবং সাহস ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে গোপনে সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে যোগ দেবার পরিকল্পনাকে নৈহাটি ভাটপাড়ার যুবসমাজ কার্যে রূপ দিতে চেয়েছিলেন।

দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে চারদিকে তখন দেশীয় খেলাধুলার প্রবর্তন হয়। খেলাধুলার আড়ালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে প্রধানতঃ এই অঞ্চলের যুব সমাজ গোপনে যোগ দিতে আসতেন। হুগলী জেলাতে চন্দননগরের 'সন্তান সঙ্ঘ' ছিলেন এ ব্যাপারে অগ্রণী। ভাটপাড়ার 'তরুণ সঙ্ঘ' হা-ডু-ডু খেলার জন্যে বন্ধুত্বমূলক প্রতিযোগিতায় সন্তান সংঘকে সেবার ভাটপাড়ায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কুমোরপাড়ার মাঠে এই প্রতিযোগিতায় কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সভাপতি। তাঁকে বিপুল উৎসাহে উদ্যোক্তারা প্রায় মিছিল করে অনুষ্ঠান মঞ্চে নিয়ে আসেন। উদ্দীপ্ত নজরুল প্রতিযোগিতা শেষে নিজেও সভাপতির আসন ছেড়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন এবং ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেন। সময়টা ছিল ১৯২৪ সাল এবং বিদ্রোহী খ্যাত কবির বয়স তখন মাত্র পঁচিশ।

জানা যায়, নৈহাটির কবি সুবোধ রায় একবার খগেন্দ্রনাথ ঘোষের দুটি কবিতার খাতা নজরুলকে পড়তে দিয়েছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশ পরিকল্পনা অনুযায়ী নজরুল মোট ৫৬টি কবিতা বেছে নেন। এর মধ্যে ৫টি ছিল দীর্ঘ কবিতা। লাজুক কবি খগেনের কবিতা ছিল তাঁর স্বভাবজাত সারল্যের দ্বারা প্রভাবিত। সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য সেই কবিতা সংকলনটির নাম দিয়েছিলেন নজরুল 'চিত্রলেখা'। নজরুল কাব্যগ্রন্থখানির জন্যে একটি ভূমিকাও লিখে দেন। গ্রন্থটি ১৯৩৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন এম সি সরকার এন্ড সন্সের সুধীরচন্দ্র সরকার। নজরুল এই গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ 'পরিচায়িকা' অংশের শেষে লিখেছিলেন, '..কবি বাণীর জয়মাল্য গলায় নিয়ে এসেছেন, কাজেই কোন কবিরই পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নাই। তার এই কবিতাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। বাঙলার কাব্যগগনে এতদিনে এক নূতন জ্যোতিষ্কের উদয় হল, এই জ্যোতিষ্ককে আমার সঙ্গে সকলেই সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করবেন, সন্দেহ নাই।'

হালিসহরের খ্যাতনামা বিপ্লবী পুরুষ বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বিশের দশকে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রচারক এবং বাঙলার বিপ্লববাদের অন্যতম প্রধান সংগঠক। 'যুগান্তর' দলকে তিনি ভাটপাড়া এলাকায় সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করেছিলেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন নৈহাটি-ভাটপাড়া অঞ্চলের বিশ্বস্ত সংগঠক বোঁচাদা (রায়), হরনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক নরোত্তম দাশ ঘোষ, নৈহাটির শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল সুর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বিপিন গাঙ্গুলীর সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় শিয়ারসোল স্কুলে পড়বার সময়ই নজরুলের প্রথম পরিচয় ঘটে শিক্ষক নিবারণ ঘটকের মাধ্যমে। সেটা ১৯১৬-১৭ সালের ঘটনা। আত্মগোপনকারী হিসেবে শিয়ারসোল রাজবাড়ির নতুন কর্মচারী 'রণেন গাঙ্গুলী' নামে ছদ্মবেশী বিপিন বিহারীকে নজরুল তখনই চিনতেন। বিপিন গাঙ্গুলীকে ভাটপাড়ায় পরে বিপ্লবীরা প্রায়ই গোপনে নিয়ে আসতেন। বিশের দশকের

মাঝামাঝি ভাটপাড়ার বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল সেদিনের 'তরুণ সঙ্ঘ'। নজরুলকেও হুগলী থেকে নৌকোয় চাপিয়ে ভাটপাড়ায় নিয়ে আসতেন এই সঙেঘর কর্মীরা। তাঁর মুখে কবিতা ও গান শুনে ভাটপাড়ায় রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে বছরই নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস 'হীনজাতির জলচল আন্দোলন' প্রস্তাব সমর্থন করেন। একে কেন্দ্র করে সে বছর গ্রীষ্মকালে ভাটপাড়া নৈহাটি অঞ্চলের মাঝখানে গঙ্গারধারে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের পাশাপাশি দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা বিরাট সামিয়ানা টাঙিয়ে গঙ্গারধারে ভাটপাড়ায় 'নিখিল ভারত ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন' এর ব্যবস্থা করেন। পাশেই বলরাম সরকারের ঘাটে নব্যপন্থীরা অধ্যাপক নরোত্তম দাশ ঘোষের সভাপতিত্বে '২৪ পরগণা জাতীয় সম্মেলন' আহ্বান করেছিলেন। 'নমঃশূদ্রের জলচল' প্রস্তাবের সমর্থনে নবীনদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন একাধিক পণ্ডিতের দল। কিন্তু ভাটপাড়ার প্রাচীনপন্থীদের নেতা মহামহোপাধ্যায় লক্ষণ শাস্ত্রী সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করায় গণ্ডগোলে সম্মেলন ভেঙে যায়। তরুণদের সম্মেলনে নজরুল স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। কবি তাঁর কবিতা ও গানের মাধ্যমে মানুষের অধিকার বিষয়ে সম্মেলনে সকলকে সচেতন করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বহিরাগত পণ্ডিতেরা প্রকাশ্যে সেদিন নজরুলের বক্তব্য সমর্থন করে নব্যপন্থীদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। এর ফলে কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণদের এলাকা ভাটপাড়ায় এলাকার মানুষও সেদিন নজরুলকে সমাদরে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি। মহকুমার সর্বত্র তখন নজরুলের জনপ্রিয়তা।

এই মহকুমার গরিফায় নজরুল আসতেন প্রধানত কালীপতি মজুমদার, মণি সেন ও সুবোধ মজুমদারের বাড়িতে। সেখানে পাশাপাশি সাহিত্যের আড্ডা এবং বিপ্লবী গোপন সংগঠনের কাজকর্মে নজরুল উৎসাহ প্রদান করতেন। আড্ডায় রাত হয়ে গেলে সেনপাড়ার যুবকেরা গরিফার রামঘাটে কবিকে পৌঁছে দিতেন। নৌকোয় হুগলীতে গিয়ে নজরুল যখন পৌঁছতেন তখন হয়তো রাত বারোটা। গরিফার দক্ষিণ সংলগ্ন নৈহাটির বরদা ব্রীজের ওপারে ফাঁকা প্রায় জনশূন্য মাঠে ভাটপাড়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে তখন জড়ো হতেন। কাছাকাছি জঙ্গলে গোপনে ছেলেদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে নজরুলকেও প্রায়ই আসতে হত। বিপ্লবী নির্মল সুর ছিলেন নজরুলের গানের সঙ্গী এবং নজরুলের দ্বারা সেদিনের অস্ত্রশিক্ষায় শিক্ষিত।

অন্যদিকে, হালিসহর ছিল বিপিন বিহারীর পিতৃভূমি। এখানে এলে তিনি স্থানীয় বিপ্লবী যুব সমাজে 'যুগান্তর' এর সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নিয়মিত বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দিতেন। বিশের দশকে 'তরুণ সঙ্ঘ' একবার গঙ্গা তীরবর্তী হালিসহর উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি সভার আয়োজন করেছিলেন বলে শোনা যায়। তখনকার

পরিস্থিতিতে যুবসমাজের আশু কি কি করণীয় এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হবার কথা। বিপিনবিহারী সে সভায় তাই নজরুলকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। নজরুল সেই সভায় যোগ দেবার ফলে মুহূর্তের মধ্যে তিনিই হয়ে ওঠেন সভার মধ্যমণি। তাঁর বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। সভাশেষে কবি সকলের সঙ্গে ঠোঙায় মুড়ি ও তেলেভাজা খাওয়ায় অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। রামপ্রসাদ ভিটায় কালীমন্দিরে তিনি একাধিকবার এসেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর রচিত শ্যামসঙ্গীত সে কালেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। অনেকের মতে, স্ত্রী প্রমীলার অসুস্থতার পর দেবদেবীর কাছে বিভিন্ন যে সব ধর্মস্থানে বা মন্দিরে নজরুল প্রার্থনার জন্যে যেতেন রামপ্রসাদের ভিটা অর্থাৎ কালীমন্দির এবং বালিদাঘাটায় সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ছিল তার অন্যতম।

এছাড়া হাজিনগর জুট মিলে ধর্মঘটের সময় মিলগেটের সামনে (১৯২৯) ও বস্তিতে বস্তিতে ও মিলের সামনে সমাবেশে নজরুল ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে একবার স্বয়ং এসে গান ও আবৃত্তি শুনিয়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

জেলার সীমান্ত শহর কাঁচরাপাড়াতেও নজরুলের একাধিকবার আগমন ঘটেছিল। বিশেষ করে ১৯৪০ সালে মনে পড়ে কাঁচরাপাড়ায় সে বছরের 'রেলওয়ে সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতিযোগিতায় কাজী নজরুল ইসলাম বিচারক হিসেবেও আমন্ত্রিত হয়ে কাঁচরাপাড়ায় একবার এসেছিলেন। সেবার কাঁচরাপাড়ায় নজরুলকে নিয়ে এসেছিলেন এরিখ এ্যালবার্ট ফোরম্যান। তিনি ছিলেন রেলের তখন ওয়েলফেয়ার অফিসার। স্থানীয় হাইন্ডমার্স ইনস্টিটিউটের সামনে চেয়ারে উপবিষ্ট নজরুলের একটি মূল্যবান ছবি স্থানীয় মণি ভট্টাচার্যের সৌজন্যে বছর দুই আগে কাঁচরাপাড়ার 'মুখোমুখি' (মে ১৯৯৮) পত্রিকার রবীন্দ্র-নজরুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় সমকালীন তরুণ আবৃত্তিকার সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সেবার 'বিদ্রোহী' আবৃত্তি করে কবির হাত থেকে পুরস্কার লাভ করেছিলেন। নজরুল সে সময় 'নবযুগ' পত্রিকার শেষ পর্বের সম্পাদক।

দেখা যাচ্ছে, পাকাপাকিভাবে বারাকপুর মহকুমার কোথাও অবস্থান না করলেও এই মহকুমার উত্তরাংশে কবির বহুবারই পদার্পণ ঘটেছিল। দক্ষিণাংশে বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বর আড়িয়াদহ এলাকায় তিনি তিরিশের পর্বে নিয়মিত যাতায়াত করতেন।

কবির পালিতা কন্যা শান্তিলতা দাশগুপ্তা ছিলেন কবিপত্নী আশালতা অর্থাৎ প্রমীলার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। তিনি ও তাঁর ভাই খোকন অর্থাৎ বিজয় সেনগুপ্ত ছোটোবেলা থেকেই কবি পরিবারে লালিতপালিত হয়ে এসেছেন। এঁদের পিতার নাম নিবারণ সেনগুপ্ত ও মাতার নাম সুশীলা দেবী। সুশীলা দেবী বজবজে একটি প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে শান্তিলতা মায়ের অসুস্থতার কারণে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শেষদিকে থাকতেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার শ্যামপুর এলাকায়

নারকেলডাঙ্গা গ্রামে। গ্রামটি বজবজ ডাকঘরের অধীন। বিধবা মায়ের সঙ্গে শান্তিলতা ছ'সাত বছর বয়সে কবি পরিবারে বেড়াতে এসে ১৯২৭-২৮ সাল নাগাদ সেখানেই থেকে যান। কবি তখন কৃষ্ণনগরে বসবাস করতেন। থাকতেন কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক এলাকায় গ্রেস কটেজে। বুলবুলের বয়স তখন বছর দুই। কবি পরিবারের বাসা বদলের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিলতাও কবি পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, সতীনাথ রোড, গ্রে স্ট্রিট, শ্যামবাজার স্ট্রিট ও বাদুড় বাগানের বাসায় স্থানান্তরিত হয়েছেন। একমাত্র পানবাগান লেনের বাসায়ই শান্তিলতা থাকেননি। তিনি তখন শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। কবি এঁকে 'খুকু' বলে ডাকতেন। ভাই বিজয় সেনগুপ্তকে নজরুল চিঠিপত্রেও 'খোকা' বলে উল্লেখ করেছেন। বজবজে শান্তিলতার বড়ো মেয়ে মালবিকার অন্নপ্রাশন খেয়ে ফেরার পর প্রমীলা প্রথম হরিঘোষ স্ট্রিটের বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বছর কয়েক আগে (১৯৮৭) এক সাক্ষাৎকারে কবির সেই পালিতা কন্যা শান্তিলতা দাশগুপ্তা স্বামী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (মৃত্যু ১৯৭১) জানিয়েছেন, 'কবি কালীসাধনা করতেন না। পূজা অর্চনার সময় বা অন্য কোনো সময় আমরা বললে কবি দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে নিয়ে যেতেন আমাদেরকে। অসুস্থতার পর একবার দক্ষিণেশ্বর যান এবং একরাত্রে আসেননি। নিজেই বললেন ঃ "মা আমাকে ডাকছেন, স্বপ্নে দেখলাম।" কিন্তু সেটা মাথা খারাপ হওয়ার পর। সুস্থাবস্থায় নয়।' কবির কালীসাধনার কথাও নৈহাটি শ্যামাসুন্দরীতলায় বসে সঙ্গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিবেশনার অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অবশ্য আগেই পাওয়া গেছে। কবি বিষ্ণু দে ও নজরুলের জীবনের সুস্থাবস্থার শেষ দিকে কালীঘাট কালীমন্দিরে সকালে পুজো দিতে যেতেন বলে বর্তমান লেখককে ষাটের দশকে জানিয়েছিলেন। কবির গলায় ঝোলানো থাকত জবার মালা। তাছাড়া কবির নিজের জীবনের বহু উক্তিতে কালী সাধনা ও সঙ্গীত রচনায় তার প্রভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যাই হোক, তিনি যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন সে কথা শান্তিলতা দেবীও সাক্ষাৎকারে অস্বীকার করেননি। নৈহাটির মৃণালকান্তি ঘোষের কণ্ঠে নজরুলের গানের বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীত যেমন প্রাণ পেয়েছিল তাতেও নজরুলের শাক্তসাধনার চিত্রখানিই সুপরিস্ফুট। অসুস্থ অবস্থায় নজরুল একবার আপনমনে ব্যস্ত বি টি রোড ধরে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ও গতিপথ সম্ভবত তাঁর নিজেরও জানা ছিল না। চল্লিশের গোড়ায় সেই অপরাহ্ন বেলায় নজরুল ট্রাফিকের ফাঁদে পড়ে লরিতে চাপা পড়বার মত অবস্থা হয়েছিল। বেলঘরিয়ায় পুলিশ চৌকিতে তাঁকে চিনতে পেরে নিয়ে যান ছাত্ররা। সেখানেই কবি বিশ্রাম করতে থাকেন। পরে খবর পেয়ে টেলার্স হস্টেলের ছেলেরা গিয়ে মোটরে কবিকে কলকাতার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। নজরুলকে তখন সাধারণ মানুষেরাও দেখলে চিনতে পারতেন। ঝাঁকড়া চুল সারা মাথায় তখনও ছিল। গায়ে থাকত গেরুয়া

বা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবী অথবা গরদের পাঞ্জাবী। পরনে থাকত সাদা ধুতি। আর গলায় ওড়না অর্থাৎ উত্তরীয়। পায়ে নাগরা জুতো অথবা পাম্প স্যু। এ চেহারাটি ছিল তখন সকলেরই চেনা। সেই কারণেই আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত থেকে সম্ভবত সেদিন নজরুল রক্ষা পেয়েছিলেন। নিরুদ্দিষ্ট কবিকে খুঁজে না পেয়ে বড় ছেলে স্কুল-পড়ুয়া সানি অর্থাৎ সব্যসাচী বাবাকে খুঁজতে ইন্দুবালার বাড়িতে গিয়েছিলেন। অবশেষে খবর পাওয়া যায় সে বি টি রোডের মাঝখান দিয়ে আত্ম-বিস্মৃত কবিকে ডানলপ ব্রিজের দিকে যেতে দেখা গেছে। সেদিনও সম্ভবতঃ নজরুল দক্ষিণেশ্বরেই যেতে চেয়েছিলেন।

নজরুল বারাকপুর মহকুমার নানা প্রান্তের এমনতরো বহু স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। প্রসঙ্গত তাই দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের কথা মনে পড়তে বাধ্য। ইন্দ্রকুমার ও বিরজাসুন্দরীর ছেলে বীরেন্দ্রকুমার ছিলেন নজরুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বীরেনের দুই বোন কমলা ও অঞ্জলি। আশালতা এঁদের জ্যেঠামশায়ের একমাত্র মেয়ে যার সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয়। বিয়ের পর নজরুলই আশালতাকে নাম রাখেন 'প্রমীলা'। অঞ্জলির সঙ্গে ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের বিয়ে হয়েছিল। অর্থাৎ নজরুল ও অনন্তকুমার ছিলেন ভায়রাভাই। অনন্তকুমার দক্ষিণেশ্বরে বিন্ধ্যবাসিনীতলায় ২২ নম্বর কেদার ব্যানার্জি রোডে ললিত মোহনদের বাড়িতে দোতলায় ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতেন। অনন্তকুমারের ভ্রাতুঃষ্পুত্র বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সচিব ড. মানব সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের পিতা অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্তের (সেনশর্মা) সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয় হয় দক্ষিণেশ্বরের ভাড়া বাড়িতে। সুস্থ অবস্থায় কবি অন্ততঃ তিনবার দক্ষিণেশ্বরে সেই বাড়িতে এসেছিলেন। একবার অনন্তকুমারের পিতৃদেব অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর খবর পেয়ে এসে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে নজরুল সান্ত্বনা দিয়ে যান। অশ্বিনীকুমারের সদ্যবিধবা পত্নীকে কবি সেদিন গেয়ে শুনিয়েছিলেন 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে' গানটি যা ছিল স্বয়ং নজরুলেরই রচনা। দ্বিতীয়বার কবি গিয়েছিলেন অশ্বিনীকুমারের পারলৌকিক কাজের শেষে নিয়মভঙ্গের দিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তৃতীয়বার গিয়েছিলেন কবি একটি নতুন সার্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করতে। কিন্তু নিমন্ত্রিত নজরুল প্রগতি সংঘের উদ্বোধনী সেই অনুষ্ঠানে (১৯৩৮) বক্তৃতা দিতে ওঠার অল্প পরেই বৃষ্টি শুরু হয় এবং সভাটি ভেঙে যায়। সম্প্রতি অনন্তকুমারের বড়ো ছেলে অঞ্জনকুমারই এ সব তথ্য জানিয়েছেন। এছাড়া সে সময় প্রতিবেশী পদ্মপলাশ সিংহের ছেলে জিতেন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে, '১৯৪১ সালে দুর্গাপূজার সময় বেশ কিছুদিন নজরুল ড. সেনগুপ্তের দক্ষিণেশ্বরের ওই ভাড়া বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির সামনে ইন্দুভূষণ ব্যানার্জির বাড়ির মাঠে কবি নজরুল ব্যাডমিন্টন খেলতেন ও ড. সেনগুপ্তের বাড়িতে সকলের সঙ্গে তাস খেলতেন।

ঐ পাড়ায় স্বদেশচন্দ্র চ্যাটার্জি মহাশয়ও ডঃ সেনগুপ্তের বাড়িতে বহুবার কবি নজরুলের সঙ্গে তাস খেলেছিলেন। ১৯৪১ সালে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় নজরুল উপস্থিত ছিলেন। দুর্গাপূজায় থিয়েটারমঞ্চে কবি নজরুল কিছু বক্তব্য রাখবার সময় ভক্তিভরে মা দুর্গার আবির্ভাবের বর্ণনা দেন ও শক্তিপূজার উৎস ব্যাখ্যা করেন।...'

দক্ষিণেশ্বরের প্রতি কবির আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিচারণায় কবির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীও লিখেছেন, এই বাড়ির বউ হয়ে আসার পর একটা জিনিস আমি দেখতাম কবি থেকে শুরু করে অনিরুদ্ধ, বাড়ির সব ছেলেরই দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির প্রতি এক অদ্ভুত টান ছিল। আমরা যখন টালার মন্মথ দত্ত রোডের বাড়িতে থাকতাম তখন একদিন দেখি কবি বাড়িতে নেই। চারিদিকে হুলুস্থুল কাণ্ড। বাড়ির সকলে পাগলের মত খুঁজছে, উদ্বেগ আর চিন্তায় শাশুড়ির মন আনচান। হঠাৎই খবর পাওয়া গেল হাঁটতে হাঁটতে কবি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি চলে গেছেন। তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে আসা হল। বাড়িতে এসে তিনি যেন অনেক কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু চিন্তাশক্তি আর বলার মধ্যে কোন যোগসূত্র পাচ্ছিলেন না। হঠাৎই চুপ করে গেলেন। লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও লিখেছিলেন, 'কোনদিন বা নজরুলকে পাওয়া যেত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরের এলাকায়, কখনো বা গঙ্গার তীরে। কোথাও তার নির্জন হবার সুযোগ নেই। কেউ না কেউ তাকে চিনে ফেলত, আর একজন চিনলেই ধীরে ধীরে অনেকে এসে জমত। তারাই উদ্যোগী হয়ে পৌঁছে দিয়ে যেত বাড়িতে'।

পাশাপাশি আড়িয়াদহ এলাকার দিল্লীপাড়ায় নজরুল যখন প্রথম যাতায়াত শুরু করেছিলেন তখন তাঁর তেমন নামডাক হয়নি। কবি আসতেন তখন ২ নং যদুনাথ মুখার্জি স্ট্রিটে ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সে সব বিশের দশকের প্রথম দিকের কথা। এই ফণীভূষণের শ্যালক ছিলেন নজরুলের সৈনিক জীবনের সঙ্গী এবং পরবর্তীকালে 'লাঙ্গল' পত্রিকার (১৯২৫) সম্পাদক হিসাবে যাঁর নাম ছাপা হত সেই মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম। মণিভূষণ আড়িয়াদহের বাড়িতে প্রায়ই ভগ্নীপতি ফণীভূষণের কাছে আসতেন। ফলে সেখানে নজরুলও আসতেন ও মাঝেমধ্যে থাকতেন বলে জানা যায়। ফণীভূষণের দাদা নেপালচন্দ্র ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। তাঁর ছেলে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। হরেকৃষ্ণ তাঁর স্মৃতি চারণায় জানিয়েছিলেন, 'আমাদের দিল্লিপাড়ার পৈতৃক বাড়িতে নজরুল প্রায়ই আসতেন ও দীর্ঘসময় থাকতেন।' মামা মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন নজরুলের আগমনের কারণ। মণিভূষণ অবশ্য পরবর্তী জীবনে স্বামী মোক্ষানন্দ গিরি নাম নিয়ে ধর্মীয় চিন্তার জগতে ডুবেছিলেন বলে জানা যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর দিন (১৬ই জুন ১৯২৫) নজরুল ছিলেন হুগলীতে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই আড়িয়াদহ কংগ্রেস সংগঠনের তৎকালীন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের আড়িয়াদহের বাড়িতে বসে ৬ই আষাঢ় ১৩৩২) চিত্তরঞ্জনকে স্মরণ করে নজরুল লিখেছিলেন তাঁর গান 'অকাল সন্ধ্যা'। গানটি লেখার পর গানটি গাইতে গাইতে আড়িয়াদহতে, (২০ শে জুন ১৯২৫) শোকমিছিল বেরোয়। তাতে নজরুলও অংশগ্রহণ করেছিলেন। মিছিলের পর নজরুল দেশবন্ধুকে নিয়ে আরও একটি গান লিখেছিলেন—খোলো মা দুয়ার খোলো/প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো,/দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনেও 'অকাল সন্ধ্যা' গানটি গাওয়া হয়েছিল। পরে গানটি 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৩২) ছাপা হয়। আড়িয়াদহে নজরুলের আরও স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

'মিলনী' মাঠে (বর্তমানে আড়িয়াদহ হাসপাতাল) ১৯৩০ সালে আড়িয়াদহ মিলনী ক্লাবের হৈমন্তিক উৎসবে নজরুল প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নজরুল 'মিলনী'র সভায় সব্যসাচী কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। সেইসঙ্গে সভাপতি শরৎচন্দ্রের আগমনকে সম্মান জানিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন—'আজ কোন শরতে পূর্ণিমার চাঁদ আইলা ধরণীতে'। অনন্তকুমার সেনগুপ্ত আড়িয়াদহ কালাচাঁদ স্কুলের কাছে ১১ নং এম এম ফিডার রোডে এসে যখন বসবাস করতেন তখন সে বাড়িতেও নজরুল এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। এ সবই কবির জীবনের সংকটময় পর্বের কথা। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় বলে প্রায়ই তিনি এই পরিবারে সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন। উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক ড. অনন্তকুমার সেনগুপ্তের এই পরিবারটি বর্তমানে লেখকের মাতুলালয়ের দিক থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মাতুল তাঁর মাতুলালয় দক্ষিণেশ্বরে উমেশ দাশগুপ্তের কাছে যেতেন। উমেশ দাশগুপ্তের মাতুল নগেন দাশগুপ্ত ছিলেন অনন্তকুমার সেনগুপ্তের পরিবারভুক্ত। ছোটোবেলায় দিদিমার সঙ্গে (সৌদামিনী দত্তগুপ্তা) দক্ষিণেশ্বরে বড় দাদু উমেশ দাশগুপ্তের দোতলা বাড়িতে গিয়েছি। চল্লিশের দশকে অনন্তকুমারের বাড়িতে নজরুল যখন অবস্থান করতেন তখন তাঁকে দেখতে এসেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা। শেফালি দেবী (মণিমা) ছিলেন ড. অনন্তকুমারের ভাই নারায়ণ সেনগুপ্তের স্ত্রী। তিনি ছিলেন সুগায়িকা। ফলে তাঁর সঙ্গেও নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর গান শোনার পর নজরুল স্বেচ্ছায় শেফালী সেনগুপ্তকে ভক্তিগীতি শিখিয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থার প্রাথমিকপর্বে আড়িয়াদহের বাড়িতে বসেই নজরুল শেফালীদেবীর গানের খাতায় লিখেছিলেন, 'আমি যেমন ছিলাম তেমনি ভাল আছি/হৃদয় পদ্মে মধু পেল মনের মৌমাছি।'

বেলঘরিয়াতেও নজরুলের যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিল। জানা গেছে, প্রায়ই তিনি কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় আসারপথে (১৯২৬-২৭) বেলঘরিয়ায় চণ্ডীচরণ

মিত্রের বাড়িতে আসতেন। চণ্ডীচরণ কবিতা রচনা, অনুবাদ সাহিত্য ও ভ্রমণ কাহিনী লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সে সময় স্থানীয় বৈদ্যনাথ ঘোষালের বাড়িতে 'রসচক্র' নামে সাহিত্যের মজলিশ বসত সেখানে নজরুল ও কল্লোল গোষ্ঠীর বহু লেখক যোগ দিতেন। চণ্ডীচরণের উদ্যোগে সে সময় বেলঘরিয়া এম ই স্কুলে বাৎসরিক ভোজের ব্যবস্থা হত এবং সেই সঙ্গে ছিল কবি সম্মেলনের আয়োজন। তাতে নজরুল সহ জলধর সেন, হেম বাগচী, নরেন দেব, শৈলজানন্দ, প্রভাবতী দেবী, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, গোলাম মুস্তাফা, দিনেশ দাশ প্রমুখ ব্যক্তিরাও যোগ দিতেন। নজরুলের কবিতা ও গান এবং সেই সঙ্গে যুবক নজরুলের উচ্চকণ্ঠের হাসি ছিল সেই সম্মেলনের অন্যতম মধুর স্মৃতি। আসলে, মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই নজরুলের জনপ্রিয়তা বিশাল ছায়া ফেলেছিল। তাই আড়িয়াদহ বা বেলঘরিয়া, নৈহাটিতে দুলটি বাবু অর্থাৎ মৃনালকান্তি ঘোষের গানের আসর, সর্বত্রই তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে মুকুটহীন সম্রাট। এমন বহুমুখী প্রতিভার আকর্ষণ যে কোন আড্ডার পক্ষেই প্রার্থিত এবং সেখানে কবিকে স্ব-মহিমায় পাওয়া ছিল গৌরবের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, বিপিন পাল থেকে শুরু করে সর্বত্র পছন্দের তালিকায় একদা তাঁর নামই ছিল শীর্ষে। সৌভাগ্যের বিষয়, বারাকপুর মহকুমার সর্বত্র তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল বলে এখানকার মানুষ তাঁকে কাছে পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন, গান শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর কবিতা, তাঁর আবৃত্তি ও বক্তৃতা থেকে এই মহকুমার মানুষ কখনোই বঞ্চিত হননি। রাজনৈতিক বলয়েও তাঁর দীপ্ত পদসঞ্চারে উদ্বেলিত হয়েছে মহকুমার বিপ্লবী সমাজ। তিনি ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রাচীন অনড়, কুসংস্কার আর অবিশ্বাসের জগদ্দল সমাজকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এত উপাদান সত্ত্বেও নজরুলের সঙ্গে এই মহকুমার সেই আত্মীয়তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত আজও লেখা হয়নি। শতবর্ষ পরেও ফলত মহকুমাবাসীর সেই সাধ অপূর্ণই রয়ে গেছে। আসলে, অসীম তৃষ্ণা আর অন্তহীন অন্বেষার অপর নামই বোধহয় কাজী নজরুল ইসলাম।

তথ্যসূত্র :

১. কাজী নজরুল — প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ ১৯৭৩)
২. শেখ দরবার আলম — নজরুল জীবন ও পালিত কন্যার স্মৃতিকথা (ঢাকা, ১৯৯৮)
৩. পুরপথিক (নজরুল জন্মশতবর্ষ সংকলন) সম্পাদনা—অমরনাথ ভট্টাচার্য (১৯৯৯) কামারহাটি পৌরসভার মুখপত্র
৪. সিন্ধুহিন্দোল (নজরুল জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ সংকলন ১৯৯৯) — বারাকপুর মহকুমা নজরুল জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতি। নৈহাটি।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক ও নজরুল গবেষণার পথিকৃৎ

সামাজিক ইতিহাসের খসড়া ঃ উত্তর বারাকপুর ও সংলগ্ন অঞ্চল

অলোক মৈত্র

এক

১.১ উত্তর বারাকপুর অঞ্চল বিশেষতঃ পলতা, ইছাপুর, গারুলিয়া ও শ্যামনগর শিল্পাঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস সংকলনের প্রধান সমস্যা তথ্যের অপ্রতুলতা এবং যেটুকু পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের পারস্পরিক বিরোধীমত। গত দুইটি শতক ধরে এই অঞ্চলের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন নানা পরিবর্তন, সেটি সত্য যেমন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য, তেমনি শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের নানা রাজনৈতিক টানা-পোড়েনও এটি সত্য। শিল্পায়নের এই অভিঘাত ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ইতিহাসবোধ তাঁদের যতটা না জারিত করেছে, তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে জীবনযাত্রা পরিচালনার বিষয়টি। এর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে সামাজিক ইতিহাসের নানাবিধ উপাদান।

১.২ নামকরণের মধ্যেও এই অঞ্চলের কিছু কিছু উপাদান পেয়ে যাই। যেমন, এখন 'ব্যারাকপুর' নামটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। সংবাদপত্র, লোকমুখে, কিছু কিছু সরকারি কাগজেও 'ব্যারাকপুর' নামটির যথেচ্ছ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রবীণ লোকেরা 'বারাকপুর' এই শব্দটিই বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অঞ্চলটি চাণক মৌজা হিসেবে পুরোনো দলিলপত্রে চিহ্নিত। আবার চাণক নামটি জোব চার্ণকের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অপর এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কারণ, বিপ্রদাস পিপিলাই তাঁর 'মনসা বিজয়' গ্রন্থে প্রকাশকাল (১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ), চাণক গ্রামের উল্লেখ করেন। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খৃষ্টাব্দ) এর আমলে দিগঙ্গ-চাণক মৌজার এই সংবাদ বিপ্রদাস থেকে জানতে পারছি। অপরদিকে জোব চার্ণক কলকাতায় উপস্থিত হন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষের ষষ্ঠ খণ্ডে, ২৩১ পৃষ্ঠায়, অচানক নামটির উল্লেখ মেলে। সেখান থেকে চার্ণক নামটি পরিগ্রহ করে। কেউ কেউ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সেনা-ছাউনি প্রতিষ্ঠার জন্য Barrack থেকে 'ব্যারাকপুর' এই নামে পর্যবসিত হয়েছে বলে মনে করেন। এই মতেরও বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। মোগল সেনাপতি বরবাক নামের অপভ্রংশে 'বারাক' নামটি হয়েছে বলে তাঁরা মত দেন। তবে আধুনিক সিদ্ধান্ত পাই "West Bengal District Gazetteers, 24 Parganas, March, 1994 এ ৬৩৩ পৃষ্ঠায় যেখানে বলা হয়েছে "The name of the town,

derived from the term Barrack is due to the fact that troops have been stationed here since 1772. The Indian name for it is Chanak, which is sometimes said to have been derived from Job Charnock who had a country house here. There appears, however, to be no authenticity of this derivation, for the name dates back to a time anterior to Charnock : Chanak is quite a common village name of Bengal. It may almost certainly be identified with the village of "Tsjannock" entered in Vanden Brouche's map of 1660 and referred to by him as 'the small town of Tsjannock', which this account shows, was situated midway between "Cangnerre" and "Barrenger" ie Kankinara and Baranagar. Historically, the place is interesting as the scene of two mutinies of the Bengal Army (in 1824 and 1857)".

১.৩ ঘোষপাড়ারোড ও নবাবগঞ্জ রোডের সংযোগস্থলে ফাঁসিডাঙ্গা বলে যে জায়গাটি আছে তা Oral and traditional History-র দিক থেকে কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। প্রাসঙ্গিক লোকশ্রুতি আঞ্চলিক ইতিহাসকে পুষ্ট করে। সামগ্রিক ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হয়। পূজাবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে শ্রী অপূর্বনাথ ঘোষ 'প্রাচীনের সন্ধানে' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ এই অঞ্চল থেকেই প্রতাপাদিত্যকে ধরে নিয়ে যান এবং এই সংযোগস্থলে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদের ফাঁসি দেওয়া হয় বলে 'ফাঁসিডাঙ্গা' নামে পর্যবসিত।[১] এ অঞ্চলে জগদ্দল দুর্গটি ছিল প্রতাপাদিত্যের, যার জন্য বর্তমান নাম 'জগদ্দল' থানা। দুর্গের নাম অনুসারে আঞ্চলিক নাম গড়ে উঠেছে। যুদ্ধ ঘটেছিল মোগল সুবেদারী ইসলাম খানের সঙ্গে। তাকে বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (Pratap submitted and was sent as a prisoner to Dhaka)। লোকশ্রুতির মধ্যে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যটি লুকিয়ে রয়েছে ফাঁসিডাঙ্গা নামকরণের মধ্যে।

১.৪ নবাবগঞ্জের প্রাচীন নাম বাঁকিবাজার। ইতিহাস থেকে যে তথ্য মেলে তা হল ১৭২১-২২ খৃষ্টাব্দে ফ্লেমিশ অস্ট্রোজার্মান কোম্পানি ভাগ্যান্বেষণে চন্দননগরের ফরাসীদের সহায়তায় এখানে এসে উপস্থিত হয়ে নবাব মুর্শিদকুলি খানের কাছে বাণিজ্য করার প্রার্থনা জানায়। নবাব রাজস্ব বৃদ্ধি ও ইংরেজদের প্রতিপত্তি খর্ব করার জন্য অনুমতি দিয়ে দেন। তখন কোম্পানি বাঁকিবাজারে একটি কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এতে বরানগরের ডাচেরা ঈর্ষাবশতঃ হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মিথ্যা অভিযোগ করে

যে অস্টেন্ড কোম্পানি বাঁকিবাজারে যুদ্ধের জন্য দুর্গ নির্মাণ করছে। এতে নবাব ক্ষুব্ধ হয়ে কুঠিটি ধ্বংস করেন এবং জমিদার পালেদের হাতে এলাকাটি ন্যস্ত করেন। জমিদার পালেরা ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে প্রতিদান হিসেবে বাঁকিবাজারের নাম দেন 'নবাবগঞ্জ'। কুঠি ধ্বংস হওয়ার সঙ্গেই বাঁকিবাজারের নামও বিলীন হয়ে যায়।

১.৫ এ অঞ্চলে আরও কয়েকটি হাঙ্গামার সংবাদ মেলে। বাংলাদেশে বরগির হাঙ্গামা হয় পরপর তিনবার. ১৭৪২, ১৭৪৩ ও ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে। মহারাষ্ট্রে ঘোড়-সওয়ার সৈন্যকে 'বারগির' বলা হয়। তার থেকেই 'বরগি' শব্দটির উৎপত্তি। রঘুজি ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কর রাম কোলহাতকর বা ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করেন। বর্ধমানের রাজা চিত্রসেন বরগির হাঙ্গামার ভয়ে গারুলিয়ার অদূরে কাউগাছিতে একটি দুর্গ গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ এই এলাকাটি তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আয়ত্বাধীন। তিনি গঙ্গাবাসের জন্য কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে জমি পত্তনি দেন। বরগিদের মূল লক্ষ্য ছিল বর্ধমান রাজের সর্বস্ব লুণ্ঠন করা। ভুল করে বর্তমান ইছাপুরের নোয়াই খাল ধরে তারা আক্রমণ শুরু করে এবং নীলগঞ্জের কাছে পাকুড়িয়া যেতে সিঙ্গের বেড় পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম ধুলিসাৎ করে দেয়। ইতিহাসের তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে বরগিরা কখনও হুগলী নদী অতিক্রম করেনি। অথচ এখানে সিঙ্গের বেড পর্যন্ত গ্রাম ধুলিসাৎ করে দেবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাম ধুলিসাৎ সংবাদটি লোকশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন অপূর্বনাথ ঘোষ তার 'প্রাচীনের সন্ধানে' প্রবন্ধটিতে। তবে কোথাও কোথাও যে বরগিরা গঙ্গা পার হয়েছে তার একটি প্রমাণ আছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রচনায়। গেজেটিয়ারে গঙ্গা পার হবার কোনও উল্লেখ না থাকলেও শাস্ত্রীমশায় 'বাণেশ্বর বিদ্যালংকার' প্রবন্ধে লিখছেন, "এখন যেখানে হুগলীর পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে অতি সরু থাকায় পার হইয়া বর্গিরা একবার গরিফার হাতিবাগানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়া দক্ষিণ-মুখে আসিতেছিল। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজারা আতপুরে থাকিতেন, সেখানে তাহাদের গঙ্গাবাসের বাটি ছিল।"

১.৬ 'নীলগঞ্জ' নামটির মধ্যেও একটি ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবরের একটি সরকারি ঘোষণাপত্রে প্রথম জানা যায় যে চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে প্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয় বারাসাতের চার মাইল উত্তরে নীলগঞ্জে। সমগ্র জেলার মধ্যে সর্বপ্রথম নীলকুঠি এটি। জন প্রিন্সেপ এই কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে নীলচাষীদের উপর অত্যাচারের বিবরণ Hindu patriot পত্রিকায় পাই। তবে বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বারাসাত ছিল চব্বিশ পরগণার সদর) Ashely Eden সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন নীলচাষ বাধ্যতামূলক নয়। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর 'চব্বিশ পরগণায় নীলচাষ ও নীলবিদ্রোহ' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, "১৮৫৯, ২০ শে

ফেব্রুয়ারী, ইডেন সাহেব জানিয়ে দিলেন, 'নীলের জন্য চুক্তি করা বা না করা প্রজাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন'।[২]

১.৭ ভারতবাসী দুই দুইটি সিপাহী বিদ্রোহের জন্য গর্ব করতে পারে যেটা গড়ে উঠেছিল বারাকপুরেই. ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে-ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধের সময়। ৪৭ রেজিমেন্টের সৈন্যরা বর্মায় যুদ্ধ করতে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বহু ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়'। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা এবং বারাকপুরের সেনা-ছাউনি থেকে মঙ্গলপাণ্ডের আত্মোৎসর্গ সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আজ গর্বের বিষয়।

১.৮ সিপাহী বিদ্রোহের পর শাসনক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে পাকাপোক্ত হয়। একই সাথে শাসনক্ষমতা ও বাণিজ্যের বিস্তার ঘটতে থাকে। হুগলী নদীর তীরে জলপথ পরিবহনের সুযোগ ছিল। কাঁচরাপাড়ার বেগের খাল ও ইছাপুরের নোয়াই খালের মাধ্যমে গ্রামের অভ্যন্তরে যাবার সুবিধেটাও বিবেচনা করল তারা। বাংলাদেশে প্রথম রেলপথ চালু হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে প্রথম রেলগাড়ি চললেও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত লোকাল ট্রেন বলে অভিহিত হয়ে নিয়মিতভাবে ট্রেন চলতে শুরু করে।[৩] এখানকার সমস্ত জমিজমার খাজনা আদায় করার দায়িত্বভার গোস্বামী এস্টেটের। এঁদের বাড়ি শ্রীরামপুরে। জমিদারিতে তাঁদের আগ্রহ কম। জমি বিক্রি করে দিতে পারলেই হল। রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং সরকারের কাছে জমা দেওয়াই এঁদের প্রধান কাজ। এঁরা তাই জমিদারী করার চেয়ে জমি বিক্রি করাই সমীচীন বোধ করলেন। গঙ্গার ধারে ধারে কলকারখানার জন্য জমি বিক্রি হতে লাগল। টমাশ ডাফ কোম্পানি, জার্ডিন স্কিনার কোম্পানি, ব্যারি কোম্পানি এরা সব জমি কিনে কারখানা স্থাপন করতে লাগল।[৪] পলতাতে বায়ুসেনার জন্য এবং ইছাপুরে গান এ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরির জমি ছাড়া আর সব জমিতে কলকারখানা ও শ্রমিক উপনিবেশ গড়ে উঠতে লাগল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপও বেড়ে গেল এই এলাকায়। পূর্ব-পাকিস্থান ও অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা এসে এ জায়গায় বসত নেওয়ায় এখানকার জনবিন্যাসও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গেল।

দুই

২.১ সময়, ঘটনা ও ইতিহাসের পাত্রপাত্রী সমাহারে যে তথ্য উপস্থাপন করা গেল, তা এই এলাকার জন সাধারণের জীবন-চর্যা ও সমাজের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি নয়। এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধারণ করার প্রয়োজনে এই প্রয়াস। তবে এখানকার সমাজটি বুঝতে হলে জনবিন্যাসের আদলটি চোখে পড়া চাই. দ্বাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে মুসলমান আক্রমণের পর বর্ধিষ্ণু সপ্তগ্রাম বন্দর এলাকা থেকে স্বর্ণকার, তাঁতী, কুমোর, বেনে,

কাঁসারি প্রায় সব বৃত্তিরই লোক পশ্চিমপার থেকে পুবপারে চলে আসেন। বেশ কিছু বেনে বা বৈশ্যের সন্ধান মেলে যারা অনেকদিন থেকেই ইছাপুর পলতা প্রভৃতি স্থানে বসবাস করছেন। সাধুখাঁ, মোদক এদের বাসও দীর্ঘদিনের। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর চাষবাসের জন্য এই এলাকায় বেশ কিছু আদিবাসীও আসেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পরপর শিল্পায়নের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও এই অঞ্চল অনেক লোক বসতি গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত বেশ কিছু লোক এখানে যুক্ত। ইছাপুরের রাইফেল কারখানায় বিভিন্ন মানুষের আগমনে এ অঞ্চলটি অন্বিত। দেশভাগজনিত অসহায় উদ্বাস্তুদের আগমনে এ অঞ্চলটির জনজীবন সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। এই এলাকার জনবিন্যাসের এরকম বিভিন্ন স্তর আমাদের এখানকার সমাজকে বুঝতে সাহার্য্য করে।

তিন

৩.১ বারাকপুর-পলতা শিল্পাঞ্চল ঘিরে পুবদিকে রয়েছে এক বিস্তৃত কৃষি অঞ্চল। বর্তমানে সেই গ্রামগুলিও নগরজীবনে প্রবেশ করতে চলেছে। কৃষিভিত্তিক এই গ্রামীণ এলাকা ইংরেজদের লোভের কারণ ছিল, যার পরিণতি আমরা দেখতে পাই নীলচাষে। বর্তমান প্রশাসনের একক পঞ্চায়েত কাউগাছি এক নম্বর, কাউগাছি দুই নম্বর, এবং সংলগ্ন গ্রামগুলি যেমন, গড়-শ্যামনগর, কাউগাছি-হাসিয়া, বাসুদেবপুর, বালিয়াঘাটা, মথুরাপুর, কয়রাপাড়া রাহুতা প্রভৃতি এবং আশপাশের গ্রামগুলি যেমন, মোহনপুর, শিউলি, জাফরপুর, পাকুরিয়া সিঙ্গের বেড়, নীলগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয়ও এখানে আলোচ্য।

৩.২ নবাবগঞ্জ ও পলতার আশেপাশের এলাকায় বেশ কিছু পুরোনো নাথ পরিবার দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার বর্ণব্যবস্থায় ও সামাজিক স্তরে এঁদের যোগী বা যুগী বলে। এরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করেন এবং কেউ কেউ উপবীত ধারণ করেন। আসলে নাথ ধর্ম নামে আমরা একটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় ঐতিহ্যেরই সন্ধান পাই। প্রাক্ আর্য ও বৈদিক ঐতিহ্যের ধারাবাহী যোগ সাধনার সঙ্গে জৈন এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সহজযান ও ব্রজযান ধর্মের সংমিশ্রণ ঘটে। তার উপর বাংলার পার্বত্য তিব্বতী চীনীয় ও অষ্ট্রিক জাতির প্রভাবে সমন্বয়ধর্মী বাংলার বুকে এই নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছিল।[৫] মীননাথ, গোরখনাথ প্রভৃতি পূজাগুলির সঙ্গে এরা একসময় যুক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধ প্রভাবে অন্বিত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ শিব ও ধর্মঠাকুরের পূজার সঙ্গে পারিবারিক আচারে সম্পৃক্ত। তাই এই এলাকার প্রাচীন সংস্কৃতির জের এঁরাও কিছুটা বহন করে চলেছেন। বারাকপুর ও বারাসাতের মাঝে নীলগঞ্জের কাছে বরতি বিলের ধারে মাধবপুর গ্রামে পাওয়া গেছে পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তি, ভাঙ্গা কুঁজো ও আরো কিছু কিছু উপকরণ।[৬] এগুলি বৌদ্ধযুগের নির্দশন। বর্তমানেও ইছাপুরের মাণিকতলায়

৬০/৭০ ঘর বৌদ্ধ পরিবার আছেন যাঁরা দেশভাগের পরবর্তীসময়ে চট্টগ্রাম থেকে এখানে এসে থিতু হয়েছেন। এখানকার সমাজ গঠনে এরাও একটি শক্তি। পলতার বায়ুসেনা ছাউনির কাছে ছিল মুসলমানদের বসতি এলাকা। এখনও কিছু কিছু আছে। দু রকমের মুসলমান এ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়—কাজি, সৈয়দ, পদবীধারী উচ্চবংশেব আশরাফ মুসলমান এবং নিম্নবর্গের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত আতরাফ মুসলমান।

৩.৩ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পর পর এখানে যে শিল্পায়ন শুরু হল, তার অভিঘাতেই এখানকার কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় চলে টানাপোড়েন। এই এলাকায় কৃষির কাজে যুক্ত ছিলেন মূলত সদ্‌গোপরা। দাস, সুর, মণ্ডল, ঘোষ এই সব বিভিন্ন পদবীধারী (সমাজের নানা থাক্‌-উপথাক্‌) কৃষির কাজ ছেড়ে কলকারখানায় কাজ নিলেন। দেখা গেল, তাদের বংশগত জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে আবহমান চলে আসা নিজস্ব সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন। নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল কলকারখানার কাঁচা নগদ টাকার হাতছানি। অনেক সময় স্ব স্ব সংস্কৃতির সঙ্গে নাড়ির যোগ এতই তীব্র ছিল যে সংস্কৃতির আকর্ষণ অনুভব করলেই তাদের আবেগ হত উদ্বেল। মিল মালিকদের ক্ষমতা ছিল না তা অবরুদ্ধ করার। হাড়ি, ডোম, বাগদি, মেটে হিন্দুসমাজে এদের স্থান নিচে হলেও চড়ক পূজা ও গাজনের সময়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এরাই ছিলেন মূল হোতা। কাজেই যারা এ সময়ে কলে-কারখানায় কাজ করতেন গাজনে ঢাকের বোল বাজলেই তারা উন্মনা হয়ে বেরিয়ে যেতেন। টাইমবাবু তাদের সময় মতো হাজিরা দেওয়াতে পারতেন না। স্থানীয়ভাবে শ্রমিক সংগ্রহের সমস্যার জন্যই মিল মালিকরা আড়কাঠির সাহায্যে ভিন প্রদেশী শ্রমিকদের আনতে শুরু করে। যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে হলে যান্ত্রিক হতে হবে। নিজ বাসভূমির সঙ্গে, স্ব সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন থাকলে তাকে যান্ত্রিক করা যাবে না। অতএব উত্তরপ্রদেশ-বিহার-উড়িষ্যা থেকে স্ব স্ব সংস্কৃতি থেকে উৎখাত করে বিভিন্ন শ্রমিক আনা হল। তৈরি হল শ্রমিক উপনিবেশ। মিল মালিকদের আর মিল চালাতে অসুবিধে হল না। এখানকার গ্রামীণ সংস্কৃতির আদান-প্রদান চলতে লাগল। জনবিন্যাস যেমন পাল্টাতে থাকল, সাংস্কৃতিক বিন্যাসও পাল্টাতে থাকল ধীরে ধীরে। ছট পূজায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল বাঙালি অবাঙালি উভয়কে। লক্ষ্ণৌ এর সৈয়দ পরিবারের সত্যপীরের হাজোতে ব্রাহ্মণদেরও শিরণি নিতে দেখা গেল। এ রকম আরো উদাহরণ দেওয়া যায়।

৩.৪ গারুলিয়ার পুবদিকে গৌরীশঙ্কর জুট মিলের পেছন দিকে রামকৃষ্ণপল্লী, রাহুতো প্রভৃতি গ্রামে পুরোনো আদিবাসী কৌমের বসত দেখা যায়। এই সব পুরোনো বসত গড়ে ওঠে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে। প্রথমে এরা অস্থায়ীভাবে আসেন, একটি দুটি

ঘর থেকে যায়। ক্রমশঃ বড়ো হয় এদের শাখা এবং তাঁরা থেকে যান। আর একদল আদিবাসী আসেন যারা একেবারেই অস্থায়ী। ইটভাটার শ্রমিকরা হাজারিবাগ সিংভূম মানভূম প্রভৃতি স্থান থেকে এসে এখানে সাময়িকভাবে কাজ করে চলে যান। স্থায়ী আদিবাসীদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। সেজন্য এদের সংস্কৃতির আদল শ্লথগতিতে পরিবর্তিত।

৩.৫ হাওড়া থেকে আসা মাহিষ্যেরা এখানে উটকো মাহিষ্য বলে পরিচিত। অধিকাংশেরই পদবী দাস, জানা, মাইতি ইত্যাদি। এঁরা চাষের কাজই করে থাকেন, কেউ কেউ কলকারখানায়ও কাজ নিয়েছেন। নবাবগঞ্জের পাল ও মণ্ডলরা অনেকদিন ধরে এদেশে বাস করছেন। পালেরা রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে যারা সদগোপ তারা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অধিবাসী। পূর্ববঙ্গ থেকেও কিছু পাল ও মণ্ডল পদবীধারী মানুষ এই এলাকায় বসবাস করছেন। অবাঙালি ডোম ও বাঙালি ডোমদের বর্তমানে আলাদা করে চেনবার উপায় নেই। এখানকার স্থায়ী বাঙালি ডোমদের প্রাচীন-সংস্কৃতি ধর্মপূজা ও চড়ক এখন সর্বশ্রেণীর মান্য হয়েছে। বাঙালি ডোমরা অবাঙালি ডোমদের সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এমন কি ভাষাগতভাবেও বাঙালি ডোমরা অবাঙালি ডোমদের কাছে ঋণী। এদের তাই পৃথকভাবে চেনবার উপায় নেই।

৩.৬ ইছাপুরের নোয়াই খালের ধারে পুরোনো কুমোরপাড়া আছে। এ সব কুমোরদের বসতি দীর্ঘকালের। হালিশহরের কুমোরদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে এরকম দু-একটি পরিবারেও দেখা মেলে। তবে অধিকাংশ কুমোররা জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, কলকারখানায় কাজ নিয়ে নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে ভাঙন ডেকে এনেছেন। মৎস্যজীবীদের দেখতে পাওয়া যায় গ্রামের দিকে। হেলে, দুলে, নীলো, জেলে, দণ্ডমাঝি এদের শুধু পদবীটুকুই আছে। বংশ পরম্পরায় মাছ ধরার কাজ এদের উঠেই গেছে বলা চলে। বংশগত জীবিকা চলে গেলে নিজ সমাজে যে ভাঙন দেখা যাবে এতে আর আশ্চর্য কী। শিল্পায়নের আঘাত, জনসংখ্যার চাপ, পরিবেশ দূষণ—এসব কারণেই এদের জীবিকায় টান পড়েছে। বরতি বিলের উপর দিয়ে বড় রাস্তা তৈরি করায় এই এলাকার বাস্তুরীতিও ভেঙে যায়।

চার

৪.১ শিল্পায়নের অভিঘাতে এই এলাকার স্থায়ী পুরোনো অধিবাসীদের বিশেষতঃ সাধারণ নিম্নবর্গের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির বেশ টানাপোড়েন চলেছে. আবহমান কাল ধরে যে জীবিকার উপর নির্ভর করে তাদের জীবনচর্যা, সেই জীবিকার পরিবর্তনে তাদের চর্যারও পরিবর্তন ঘটে। জীবনচর্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়।

ভিন দেশী, ভিন্নভাষী মানুষের আগমনের ফলে নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সমাজ ও অন্য দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান গ্রহণ-বর্জন চলে। সেনানিবাসে, পলতার বায়ুসেনা বিভাগে, ইছাপুরের বন্দুক কারখানায় ভারতের প্রায় সব প্রদেশের মানুষ জীবিকার জন্য এই এলাকায় এসেছেন। এদের প্রভাবও অস্বীকার করার উপায় নেই। সংস্কৃতি সমন্বয়ের আর একটি সুযোগ ঘটে পূর্ব-পাকিস্থান ও বাংলাদেশ থেকে আগত বাংলাভাষী উদ্বাস্তু আগমনের ফলে। পুর্ববাংলার সংস্কৃতি, লোকাচার, বিবাহপ্রথা, খাদ্যাভ্যাস এ সবই এ বঙ্গের সংস্কৃতি থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তুরা এসে এদেশের এই এলাকায় থিতু হয়ে বসাতে ক্রমশঃ ঘটি-বাঙাল সংস্কৃতিরও সমন্বয় ঘটতে শুরু করে। সে প্রক্রিয়া কিন্তু এখনো অব্যাহত।

পাঁচ

৫.১ মাধবপুর গ্রামে যে বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, হালিশহরে বারুইপাড়ায় সোমদীঘিতে আর একটি মূর্তি[১] এসব থেকে এই এলাকার মানুষের প্রাচীনকালে যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগ ছিল তা কিছু কিছু প্রমাণ করে। শ্রী চৈতন্যদেব নীলাচলে যাবার সময় পানিহাটিতে রাঘবমন্দিরে বাস করতেন। সেখানে নিত্যানন্দ পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। শিবানন্দ সেন শ্রীচৈতন্যর ও সমস্ত ভক্তবৃন্দের নীলাচলে যাবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে বৌদ্ধধর্ম থেকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হবার যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, শ্রীচৈতন্যদেব ও তার পরিজনেরা বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ ও ব্যাপ্তি এমনভাবে ঘটিয়েছিলেন যে বৌদ্ধধর্মের থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান না হয়ে দলে দলে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হতে থাকেন এখানকার নিম্নবর্গের মানুষেরা। বৌদ্ধ প্রভাবও এতে ক্ষুণ্ন হয়। কিন্তু আমরা এখনো মানিকতলায় কিছু কিছু বৌদ্ধ পরিবারের খোঁজ পাচ্ছি যারা এখনও নিজ ধর্ম বিসর্জন দেন নি। অন্ততঃ কিছুটা হলেও টিকিয়ে রেখেছেন। শ্যামনগরেও কিছু বৌদ্ধ পরিবার আছে। সনাতন হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপ সাধারণ মানুষ ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন নি। মানুষের মধ্যে তাই চৈতন্য প্রভাব ছিল স্পষ্ট। শাস্ত্রীয় পূজা-পার্বণ ছাড়াও চড়ক-বাণপূজা, মাকাল, ঘেঁটু, পঞ্চানন্দ এবং ঘোষপাড়ায় সতীমার মেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ইসলাম হিন্দুধর্মের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা যায় সত্যপীর, মাণিকপীর ও অন্যান্য পীরের দরগাগুলিতে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অনেক সময় সত্যপীরের দরগায় মানতও করেন।

৫.২ 'বারাকপুর-পলতা-ইছাপুর-গারুলিয়া' সন্নিহিত অঞ্চলের ইতিহাস চর্চায় একটি সত্য উপলব্ধি হয় যে, এখানে বিভিন্ন সময়ে জনবৃত্তের ধারা-উপধারা এ অঞ্চলে মিশেছে এবং তাদের নিজস্ব আচার-আচরণ ধর্মবোধ এ সব নিয়ে পরস্পর পরস্পরকে

প্রভাবিত করে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও সমাজ গড়ে তুলেছে। কৃষি প্রধান পুরোনো সমাজের ভাঙন এবং আধুনিক সমাজে রূপান্তরের বাস্তবতাও এ অঞ্চলে প্রতিফলিত।

সূত্র ঃ

(১) অপূর্বনাথ ঘোষ, প্রাচীনের সন্ধানে, স্মারক পুস্তিকা, পল্লীমঙ্গল সমিতি, ১৩৯৯

(২) অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, চব্বিশ পরগণার নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ, দেশকাল, ১৩৯৩, পৃষ্ঠা ২৫

(৩) (a) Report on the Administration of the Bengál Presidency 1860-1871.

(b) "The line originally belonged to a private company and was taken over by the Government in 1884. The line came under the Imperial control in 1892 and included the eastern section from sealdah to the northern boundary of 24 Parganas, etc. ... Necessary works to quadruple the line up to Naihati were in progress. The North-West part of 24 Paragans lying within Thanas Dum-Dum, Barrackpore, Nawabganj, Khardaha and Naihati had been served by the eastern section"–Prajnananda Banerjee, Calcutta and its Hinteriland Progressive Publishers, Calcutta, 1975, page 104-105.

(৪) Prajnananda Banerjee, Calcutta and its Hinterlands, progressive Publishers, Calcutta, 1975, page 173-174.

(৫) আশা দাস, বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলকাতা, ১৩৭৫, পৃষ্ঠা-৩৯

(৬) যুগান্তর পত্রিকা, ১৪.১২.১৯৮৪

(৭) যুগান্তর পত্রিকা, ২৭.৬.১৯৫৩

(৮) প্রবন্ধটি পূর্বে 'এখন-সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সংক্ষিপ্ত আকারে। বর্তমান প্রবন্ধটি লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত।

লেখক পরিচিতি : ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সদস্য। সমাজতত্ত্ব ও লৌকিক ধর্মবিষয়ে গবেষণারত

নাট্যচর্চার জোয়ারে একালের বারাকপুর

কানাইপদ রায়

"বঙ্গদেশে আজকাল বড় ধূমধাম।/যেথা সেথা শুনা যায় অভিনয় নাম।।
বঙ্গদেশে বঙ্গবিদ্যা হোতেছে প্রকাশ।/সকলে উৎসাহ করে এই মম আশ।।
নাটক লইয়া সবে রঙ্গরসে থাক।/কালিদাস হোয়ে সবে কালীনাম ডাক।।"

প্রায় দেড়শ বছর আগেই বাংলাদেশে নাটক নিয়ে যে ধূমধাম শুরু হয়েছিল আজও যে তাতে ভাটা পড়েনি তা বলাই বাহুল্য। তবে বারাকপুরের নাট্যচর্চার প্রাচীন ইতিহাস ততটা গৌরবের না হলেও একালের নাট্যচর্চায় এসেছে সাফল্যের জোয়ার।

সেকালের নাট্যচর্চা

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দি দমদম থিয়েটার' গঠিত হয়েছিল। সেখানে ইংরেজ কর্মচারীরাই অভিনয় করত। এর প্রভাব ছিল সীমিত। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর (১৬ই পৌষ ১২৭৩) তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একখানি পত্রে **'আগরপাড়ার নাট্যশালা'**-র কথা জানতে পারি।

"আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফঃস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। .... ৮ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় "বিদ্যাসুন্দরে"র অভিনয় হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াশাঁকোর সঙ্গত দল উপস্থিত ছিলেন। এই দলটি নূতন হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সঙ্গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ পর্যন্ত সচরাচর ঢোলক, তবলা, তানপূরা, বেহালা ও মন্দিরা আমাদিগের সঙ্গীতযন্ত্র মাত্র ছিল, কিন্তু নূতন দলে ইংরাজি ফুলুট (বাঁশি) ফ্লাজেলট, পিকলু (ছোট বাঁশি) ও বাম (বড় বেহালা) ইংরেজি যন্ত্র সকল লওয়া হইয়াছে। আমাদিকের প্রাচীন বীণা ও করতাল গ্রহণ করা হইয়াছে। .... শ্রোতা মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষত বাবু নীলমাধব ঘোষের ফুল্টুবাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্ব্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্মকারের ঢোলক বাদ্য বিশেষ মনোহর হইয়াছিল। ... আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয় ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। অভিনয়ের পূর্বে সেই সেকেলে আকড়াই

বাজনা ও বেহালায় গত, তৎপরে ধুর পদে শ্যামাবিষয়ের গীত শ্রুত হয়। ...আগড়পাড়ার নাটকে দৃশ্যের মধ্যে কিছুই ছিল না। তবে আসরের উত্তরাংশে একটি কাগজের পথ ছিল এবং একটি বকুলের শাখা তাহার সম্মুখে বসাইয়া দেওয়া হয়। সুন্দর প্রথমতঃ আসিয়া তথায় উপবেশন কবিয়াছিলেন এবং দক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর হইতে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দর দর্শন করাইয়াছিলেন। এটি বাটীর গঠনে হইয়াছিল এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ সুবিধা থাকিবে না। নাট্যোক্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রঘটিতে অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র ঘোমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যে রূপে বক্ষঃস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যারাও এই প্রকাশে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না।"...

■ 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত চিঠি

১ বৈশাখ ১২৮১ (২১ সংখ্যা)

মহাশয়! চতুর্দ্দিকেই নাটকাভিনয়ের ধূম পড়িয়াছে। ... প্রাচীন পিতামহ সম্প্রদায় খেঁউর গাইয়া ও কবির লড়াই করিয়া আসর হইতে অপসৃত হইলে যুবক সম্প্রদায় বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা সখের যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। ... এঁড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে স্থানে আকড়া আরম্ভ হইল ও যুবক সম্প্রদায় একাগ্রচিত্তে তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল।"

■ 'সংবাদপ্রভাকর'

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদপ্রভাকর'-এ শকুন্তলা অভিনয়ের আয়োজন সম্পর্কে লেখা হয়, "আমরা শ্রুত হইলাম। বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনস্থ জ্ঞানপ্রদায়িনী সভার সভ্য হইলে শ্রীযুক্ত নন্দকুমার রায়ের কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের অনুরূপ দর্শাইবার নিমিত্ত শিক্ষা করিতেছেন, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে উত্তম বটে, বহু দিবস আমাদিগের কলিকাতায় বাঙ্গালা নাটকের অনুরূপ হয় নাই...।"

■ 'হিন্দু পেট্রিয়ট'

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে 'শকুন্তলা'র প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয় সম্বন্ধে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লেখা হয়, "... বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। নাট্যশালা বলিয়া আমাদের যে একটা জিনিস ছিল, তাহাও আমরা ভুলিয়া গেলাম। এমন সময় একটি নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া আমরা জানিতে পারিলাম যে, পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্যশালার ভস্মাবশেষের উপর ফিনিক্স-পক্ষীর ন্যায় আরেকটি বঙ্গীয় নাট্যশালা আবির্ভূত হইয়াছে। এই নিমন্ত্রণের মধ্যে আরও উৎসাহের বিষয়—যে নাটকটির অভিনয় হইবে, উহা একটি সত্যকার বাংলা

নাটক—কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 'শকুন্তলা'র বঙ্গানুবাদ।

■ 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার'

বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কিশোরের অভিনয় প্রসঙ্গে—১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ অক্টোবর বাবু নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দর নাটকের অভিনয় হয়। ২২ অক্টোবর 'হিন্দু পাইয়োয়িার'-এ লেখা হয়, "এই নাটকে সুন্দরের ভূমিকা বরানগরের শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি কিশোর যুবক কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে। প্রশংসার্হ উদ্যম সত্ত্বেও সে এই ভূমিকায় সমুচিত উৎকর্ষ দেখাইতে পারে নাই"।

এই অঞ্চলের নাট্যসম্পর্কিত কিছু কথা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেও পাই—"রবীন্দ্রনাথের খড়দহ বাসের কোনও এক পর্বে খড়দার ননীলাল মুখার্জির ও নিতাই সেনগুপ্তের সঙ্গে বারাকপুরের এক যুবকও কবি সন্দর্শনে আসেন। যুবকটি সেদিন একটি স্বরচিত নাটক কবিকে পড়ে শোনালেন। নাটকটি শোনার পর কবি বললেন 'নাটকটা মনে হচ্ছে ভালই হয়েছে। আমার চেয়ে শিশির ভাদুড়ী মশায় এ ব্যাপারে ভাল বোঝেন। তাঁকে আমার নাম করে নাটকটি দেখিও, তবে লেখাটি অন্য কারুর হাতে দিও না। .... রবীন্দ্রনাথ খড়দহে যে বাড়িটিতে থাকতেন—ঠিক তার সামনেই কলকাতার বড়াল পরিবারের অন্নপূর্ণা মন্দিরসহ বাগানবাড়ি। কলকাতা থেকে গোকুলচাঁদ বড়াল তাঁর নাতি-নাতিনীদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে খড়দাব বাগান বাড়িতে আসতেন এবং মাঝে মধ্যেই কবির সঙ্গে দেখাও করতেন। গোকুল চাঁদের অনুরোধেই উদ্যানপ্রেমী কবি কখনো-কখনো বড়াল বাগানে পায়চারি করতেন, বিভিন্ন গাছ দেখতেন এবং সেখানে থিয়েটার করার পাকা স্টেজ দেখে কৌতুহল প্রকাশ করতেন ও অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন।"

বারাকপুর অঞ্চলে একসময় নাট্যকার হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন খড়দহের ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং নিমতার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

একালের নাট্যচর্চা

একালের বারাকপুরে নাটকচর্চার জোয়ার আসে গত শতাব্দীর চারের দশক থেকে। বিভিন্ন ধারায় প্রচুর নাটক লেখা হতে থাকে—একাংক, পূর্ণাঙ্গ, পথ নাটক, শ্রুতি নাটক ইত্যাদি। এসব নাটক শৌখিন মঞ্চ ছাড়াও পেশাদার মঞ্চে সাফল্য অর্জন করেছে। এ অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর সফল নাট্যকার, অভিনেতা এবং নির্দেশক। শৌখিন ও পেশাদারী দল ছাড়াও রয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ—ভাগনাস-এর বিভিন্ন শাখা সংগঠন। বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এই সংগঠন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বেআইনী ঘোষিত হবার পর

বারাকপুর মহকুমার আড়িয়াদহ, দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটি, খড়দহ প্রভৃতি স্থানে শাখা সংগঠন করে নাট্যচর্চা চালাতে থাকে। একালের নাট্যচর্চায় যেমন রয়েছে মনোরঞ্জনের দিক, সেরকম রয়েছে দায়বদ্ধতা।

নাট্যব্যক্তিত্ব

[আলোচ্য শিরোনামে যেসব নাট্যব্যক্তিত্বের রচনা, অভিনয়, নির্দেশনা এবং সংগঠনী শক্তিতে বারাকপুরের নাট্যভূমি সমৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মূল্যায়ণ নয়, শুধুমাত্র খোঁজ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের বিভিন্নই নাট্যসংস্থা/নাট্যপ্রযোজক সংস্থা, নাট্যমঞ্চ, নাট্যপত্রিকা, এসবের একটা তালিকা দেওয়া হল। এদের মধ্যেই বেশ কিছুর অস্তিত্ব এখন নেই, তবু একসময় সেগুলি এ অঞ্চলের নাট্যচর্চায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই তালিকার বাইরেও নাট্যসংক্রান্ত কোন বিষয় কেউ অবগত করালে পরবর্তীকালে তা যুক্ত করা হবে।]

(সংকেত ঃ বাসিন্দা =□)

সেকালের নাট্যব্যক্তিত্ব

নন্দকুমার রায়—□ গরিফা। নাট্যকার। "লেবেডেফের অনুদিত নাট্যগ্রন্থ এবং 'বিদ্যাসুন্দরে'র কথা ছাড়িয়া দিলে, যতদূর জানা গিয়াছে, গৌরীভা* গ্রামের বৈদ্য নন্দকুমার রায় কর্তৃক রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'ই প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১২৬২) ইহা প্রকাশিত ও ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি সিমলার আশুতোষ দে বা সতুবাবুর বাড়িতে অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও কয়েকটি বাংলা নাটক-আখ্যাত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলি কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।"

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ—□ ভাটপাড়া। জন্ম ১৮৯৩ খ্রীঃ ২৬ জানুয়ারি। সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। "শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের জীবিতকালেই তাঁর রচিত সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের উপর পি এইচ ডি লাভ করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী গুলশন কুমারী। কানপুরের শ্রী নীলম খান্নার পি এইচ ডি থিসিসের বিষয় ছিল ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের নাট্যসাহিত্য।" শঙ্করাচার্য বৈভবম্, বিবাহ বিড়ম্বনম্, বনভোজনম্, মহাকবি কালিদাসম্, নিগমানন্দ চরিতম্, বিবেকানন্দ চরিতম্ এরকম প্রচুর সংস্কৃত নাটক লিখেছেন। তাছাড়া 'সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে প্রহসন' নামে বাংলা নিবন্ধও লিখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—□ নৈহাটি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ তাঁর

* গৌরীভা = বর্তমান গরিফা

জীবিতাবস্থা থেকেই সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়ে আসলেও তিনি একটিও নাটক লেখেননি। ১৮৭৩ খ্রীঃ ২০ ডিসেম্বর বেঙ্গল থিয়েটারে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া 'কপালকুণ্ডলা', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত', 'সুবর্ণগোলক' প্রভৃতি কাহিনীর নাট্যরূপ ন্যাশনাল থিয়েটার, মির্নাভা থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, স্টার থিয়েটার এবং আরো অনেক মঞ্চে অভিনীত হত। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কাহিনীর নাট্যরূপ ইংরেজ সরকার ভাল চোখে দেখেনি। স্টারে অভিনীত 'চন্দ্রশেখর' নাটকটির অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিছু পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত করাও হয়েছিল। সেকালের মত একালেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ সার্থকভাবে মঞ্চস্থ হয়ে চলেছে। বেলেঘাটার জমিদা বংশের বিধুভূষণ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাস অবলম্বনে 'রাজসিংহ' নাটক লিখেছিলেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—□ খড়দহ। জন্ম ১৮৬৩ খ্রীঃ ১২ এপ্রিল। মৃত্যু ৪ জুলাই ১৯২৭ খ্রীঃ। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা 'ফুলশয্যা' কাব্য নাটকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বারাকপুর গভর্ণমেন্ট স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করার পর রসায়নে এম এ পাশ করে জেনারেল এসেমব্লীজ কলেজে (বর্তমান স্কটিজ চার্চ কলেজ) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ২০ নভেম্বর ক্লাসিক থিয়েটারে 'আলিবাবা' মঞ্চস্থ হবার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পরে। শিক্ষকতা ছেড়ে পুরোপুরি নাটকে আত্মনিয়োগ করেন। 'ফুলশয্যা', 'বঙ্গের রাঠোর', 'সাবিত্রী' প্রভৃতি বহু নাটক লিখেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—□ নিমতা। জন্ম ১৮৮২ খ্রীঃ ১২ ফেব্রুয়ারি। মূলত কবি হলেও সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি নাটক রচনা করেছেন। তাঁর লেখা একাংক নাটকগুলি বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে হলেও তাঁর হাতে সার্থক মাত্রা লাভ করেছে। প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকাতে তাঁর লেখা নাটক প্রকাশ পেয়েছে। 'তেহাই', 'দৃষ্টিহারা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটক।

একালের নাট্য ব্যক্তিত্ব

হর ভট্টাচার্য—নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। জন্ম বারাণসীতে হলেও ভাটপাড়ার রূপ-কথা নাট্যসংস্থার জনপ্রিয় অভিনেতা। তাঁর লেখা 'নষ্ট অসীম' সুন্দরম্ পুরস্কার লাভ করে (১৯৯০ খ্রীঃ)।

শুভাশিষ গঙ্গোপাধ্যায়—□ ভাটপাড়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। ১৯৮৭ খ্রীঃ তিনি আন্তঃকলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যপ্রতিযোগিতায় 'একাবোকা' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের শিরোপা পান। আরও বহু সম্মান লাভ করেছেন। নান্দীকারের সঙ্গে যুক্ত।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—□ ভাটপাড়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। 'কর্ণার্জুন' এই

উল্লেখযোগ্য নাটক ছাড়াও আরও নাটক এবং নাটক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন।

অনুপ রায়—□ শ্যামনগর। নাট্যকার-অভিনেতা। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'গোর্কীর মায়েরা', 'কালের রাখাল' প্রভৃতি নাটক দর্শকের চিত্ত আলোড়িত করেছে।

তমাল দাস—□ শ্যামনগর। নাট্যকার। 'সাদা অন্ধকার', 'হৃদয়' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক।

অমলেন্দু চক্রবর্তী—□ আতপুর। নাট্যকার। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'গরমিল', 'গবাক্ষ', 'চেতনার ঐক্য' উল্লেখযোগ্য নাটক।

নেপাল মুখোপাধ্যায়—□ শ্যামনগর। নাট্যকার। 'মনসুরি মসনদ' উল্লেখযোগ্য নাটক। নাটকের পাশাপাশি লিখেছেন যাত্রাপালাও।

বাসুদেব চক্রবর্তী—□ শ্যামনগর। নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য নাটক 'কালাতীত', 'যমদ্বারে', 'মহাঘোরে' প্রভৃতি।

সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য—□ ভাটপাড়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। নৈহাটির যাত্রীক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বহু একাঙ্ক নাটক ছাড়াও লিখেছেন পূর্ণাঙ্ক নাটক।

সত্যেন ভদ্র—□ শ্যামনগর। নাট্যকার-অভিনেতা। তাঁর প্রথম নাটক 'কালভার্ট'। সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র পাওয়া যায় তাঁর নাটকে।

অনুপম চৌধুরী—□ শ্যামনগর। নাট্যকার। একাংক নাটক রচনায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। 'বাজি', '১৮ বছরের যৌবন' প্রভৃতি নাটক বহু সংস্থা সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছেন।

সিধু ভট্টাচার্য—□ ভাটপাড়া। অভিনেতা-নির্দেশক। বিশ্বরূপা, মিনার্ভা প্রভৃতি পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করা ছাড়াও গ্রুপ থিয়েটারে অভিনয় করেছেন। অনেক নাটকে নির্দেশনাও দিয়েছেন।

তাপস ভট্টাচার্য—□ আতপুর। অভিনেতা-নির্দেশক। নাট্য পরিচালনার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

বিদ্যুৎ গোস্বামী—□ ভাটপাড়া। অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্যকার। বিশ্বরূপা, স্টার প্রভৃতি পেশাদারী মঞ্চে অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। 'এইদিন এই রাত' তার রচিত পূর্ণাঙ্গ নাটক।

গৌতম হালদার—□ ভাটপাড়া। অভিনেতা-নির্দেশক। অভিনয় সূত্রে বিদেশ সফর করেছেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের বৃত্তি এবং জুনিয়র ফেলোশিপ পেয়েছেন।

শেখর সমাদ্দার—□ হালিশহর। অধ্যাপক-নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-নাট্য নিবন্ধকার-নাট্য সমালোচক।

নিখিলরঞ্জন দাস—□ হালিশহর। নাট্যকার-অভিনেতা-নাট্যসাংবাদিক। ১৯৯৪ খ্রীঃ

শ্রেষ্ঠ একাংক নাট্যকার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে পুরস্কার লাভ করেন। গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার প্রকাশ কাল থেকেই তিনি উল্লেখযোগ্য সম্পাদক।

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—□ হালিশহর। অভিনেতা-নির্দেশক। 'অমর ভিয়েতনাম', 'টিপু সুলতান' প্রভৃতি নাটকে অভিনয়ের মুন্সীয়ান দেখিয়েছেন।

অনিমেষ ভট্টাচার্য—□ হালিশহর। অভিনেতা-নির্দেশক। ইউনিটি মালঞ্চ নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। 'গদ্দার', 'নহবত' প্রভৃতি নাটকের সার্থক অভিনেতা।

শান্তনু মজুমদার—□ কাঁচরাপাড়া। নাট্যকার-অভিনেতা। উল্লেখযোগ্য নাটক 'চেনামানুষ'। এছাড়া বহু নাটক রচনা করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পথ নাটক।

অঞ্জনকুমার গাঙ্গুলী—□ কাঁচরাপাড়া। অভিনেতা-নির্দেশক। হালিশহর প্রহরী নাট্যসংস্থার নির্দেশক রূপে যুক্ত। পেশাদারী মঞ্চেও অভিনয় করেছেন।

মন্দিরা মৈত্র—□ কাঁচরাপাড়া। অভিনেত্রী। 'চরণদাস চোর' নাটকে অভিনয় খ্যাতি এনে দেয়। অল্পবয়স থেকেই অভিনয় শুরু করেছেন। নাটক নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন।

অহীন্দ্র ভৌমিক—□ নিমতা। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। গণনাট্য আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'উত্তর ২৪পরগণার নাট্যচর্চা' তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ। লিখেছেন প্রচুর একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'যোজনার অন্তরালে' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর অভিনীত ও প্রযোজিত 'জিয়নকাঠি' নাটকটি একসময়ে সাড়া ফেলেছিল। ১৯৫৭ খ্রীঃ নাগাদ ২৪ পঃ একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা চালু করেন। 'যোজনার অন্তরালে' তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক। তাঁর অভিনীত ও প্রযোজিত 'জীয়নকাঠি' নাটকটি একসময় সাড়া ফেলেছিল। ১৯৫৭ খ্রীঃ নাগাদ ২৪পঃ একাংক নাটক প্রতিযোগিতা চালু করেন।

নীহারকান্তি গুণ—□ নিমতা। নাট্যকার। 'অহেতুক' একাংক নাটকটি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়—□ নিমতা। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। উল্লেখযোগ্য একাংক নাটক 'প্রতিশোধ' ছাড়াও আরও নাটক লিখেছেন।

বাদল ধর—□ নিমতা। নাট্যকার। 'সেই সমুদ্রের অপেক্ষায়' উল্লেখযোগ্য নাটক। এছাড়াও অনেক একাংক নাটক লিখেছেন।

মনোতোষ চক্রবর্তী—□ নিমতা। নাট্যকার-অভিনেতা। অনূদিত নাটক ছাড়াও মৌলিক, একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন। টেলিফিল্মের চিত্রনাট্যও তিনি রচনা করেছেন।

নীলাদ্রি ভৌমিক—□ নিমতা। নাট্যকার-অভিনেতা। 'ভারতবর্ষ ৮৯' একাংক নাটকটি তাঁকে জনপ্রিয় করে। লিখেছেন কাব্যনাট্য ও শ্রুতিনাটক।

দুলেন্দ্র ভৌমিক—□ খড়দহ। জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশে ময়মনসিংহে। কথাসাহিত্যিক-নাট্যকার-সাংবাদিক-সংগঠক। ১৯৫৯ খ্রীঃ তরুণ বয়সে প্রথম নাটক 'কেন'। তারপর বিভিন্ন স্বাদের নাটক লিখেছেন। তিনি 'শৈলুষিক' নাট্যগোষ্ঠী গড়ে

তোলেন। একসময় খড়দহ গণনাট্য সংঘের সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য নাটক 'গুপ্তবিদ্যা', 'গিরগিটি' প্রভৃতি।

দেবাশিস চৌধুরি—□ খড়দহ। অভিনেতা। মঞ্চ পরিকল্পনায় শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ব্লাইন্ড অপেরার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

নভেন্দু সেন—□ সোদপুর। নাট্যকার-নির্দেশক। ক্রান্তিকাল (সোদপুর) নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাটক নিয়ে উচ্চস্তরের ভাবনাচিন্তা করেছেন। 'প্যানডোমাইম' সমবেত 'সওয়াল জবাব' প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত একাংক নাটক। বেশকিছু পূর্ণাঙ্গ নাটকও তিনি রচনা করেছেন।

সুব্রত কাঞ্জিলাল—□ সোদপুর। নাট্যকার। পানিহাটির সাযুধ নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। লিখেছেন পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক। 'দুধারা', 'রসিক মারা গেছে' উল্লেখযোগ্য নাটক।

নিখিলরঞ্জন গুহ—□ আগরপাড়া। নাট্যকার-নির্দেশক-সংগঠক। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। পাঞ্চজন্য নাট্যসংস্থা তাঁর অনেক নাটক সার্থকভাবে মঞ্চস্থ করেছে।

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়—□ খড়দহ। নাট্যকার-অভিনেতা-সংগঠক-নির্দেশক-সুরকার-গীতিকার-গায়ক। গণনাট্য সংঘে যুক্ত। একাংক নাটক ছাড়াও লিখেছেন পথ নাটক।

সমর সমাদ্দার—□ আগরপাড়া।. নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। বীক্ষণ নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত। একাংক নাটক রচনাতে বেশি আগ্রহী।

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়—□ পানিহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। 'উজ্জ্বল একঝাঁক' উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়াও লিখেছেন একাংক নাটক। 'পদ্মপাতার কুঁড়ি' তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়— □ পানিহাটি। অভিনেতা-নির্দেশক। দূরদর্শন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, ছবি বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন।

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়—□ সুখচর। অভিনেতা। সিনেমায় অভিনয় করেছেন। নাট্যসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মশিবিরে যোগদান করেছেন।

ভাস্কর লাহিড়ি—□ সোদপুর। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। উল্লেখযোগ্য নাটক 'বোল'।

অসীমকুমার ত্রিবেদী—□ ইছাপুর। নাট্যকার। 'চিলি আমার নাম চিলি' — পূর্ণাঙ্গ নাটক, রূপক নাটক-'খেলা ভাঙার খেলা' এরকম বহু নাটক লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করা ছাড়াও গল্পও লিখে চলেছেন।

সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় —□ ইছাপুর। নাট্যকার। জন্ম ঃ ৯-১-১৮৮৪। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের পিতা। সাহিত্যে বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য। স্টার, রঙমহল প্রভৃতি থিয়েটারে তাঁর লেখা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

সুধাংশু মণ্ডল—□ নবাবগঞ্জ। অভিনেতা-নির্দেশক। পশ্চিমবঙ্গ নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীত

আকাডেমির শিল্পী ছিলেন।

পিলু মজুমদার —□ মণিরামপুর, যদিও জন্ম বরানগরে। অভিনেতা-নির্দেশক। এখনও তিনি বহু নাটকে নির্দেশনার কাজ করে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্র পরিচালক প্রভাত রায়, অজিত গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

বেলা সরকার—□ ইছাপুর। অভিনেত্রী। ১৯৭৭-এ পেশাদারী যাত্রায় যুক্ত হন। সুন্দরম নাট্যগোষ্ঠীতে কাজ করেছেন। গ্রুপ থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের সাক্ষর রেখেছেন।

তিনু বন্দ্যোপাধ্যায় — □ ইছাপুর। অভিনেতা-নির্দেশক। পেশাদারী যাত্রাপালায় যুক্ত হলেও নিবেদিত নাট্যপ্রাণ। ইছাপুর 'শিল্পায়ন' নাট্যগোষ্ঠীর রূপকার।

শান্তি মণ্ডল — □ ইছাপুর। অভিনেতা-নির্দেশক। ইছাপুর রবিবাসরীয় সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। 'মিলারেপা' নাটকে জোরালো অভিনয় তাঁর অভিনয়ক্ষমতার পরিচয় মেলে।

জীতেন অধিকারী — □ ইছাপুর। অভিনেতা-নির্দেশক। 'শিল্পায়ন' নাট্যগোষ্ঠীর (ইছাপুর) সঙ্গে যুক্ত। পেশাদার যাত্রাপালায় অভিনয় সুনাম অর্জন করেছেন।

স্বপন চক্রবর্তী — □ ইছাপুর। অভিনেতা-নির্দেশক। যাত্রাপালায় অভিনয়ের পাশাপাশি নাটকে অভিনয় এবং নির্দেশনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইছাপুরের 'শিল্পায়ন' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত।

আরতি ধর — □ ইছাপুর। অভিনেত্রী। গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের সাক্ষর রেখেছেন।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য — □ নৈহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা। ১০০র বেশি একাঙ্ক নাটক ছাড়া অনেক পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক, চারুকলা আকাদেমী থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের পুরস্কার ছাড়াও রাজ্য নাট্য আকাদেমী থেকেও পুরস্কার পেয়েছেন। রাজনৈতিক, কৌতুক, রূপকধর্মী, সবরকম নাটকই লিখেছেন। নৈহাটি পুরসভার পুরপ্রধান।

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত —□ নৈহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। স্বরচিত 'রক্তাক্ত রোডেশিয়া' নাটকে তাঁর নির্দেশনা ও উচ্চমার্গের অভিনয় খ্যাতি এনে দেয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — □ নৈহাটি। অভিনেতা। জন্ম ১৮৯৮ খ্রী। মৃত্যু ১৯৫৪খ্রী। নাট্যচার্য শিশিরকুমারের দলে অভিনয় করা ছাড়া মিনার্ভা থিয়েটারে বহুদিন অভিনয় করেছেন। স্বল্পপরিসরের পত্রিকা 'রঙ্‌মহল' প্রকাশ করতেন।

তাপসশংকর ব্রহ্মচারী — □ নৈহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা। শিশুদের নিয়ে নাটক করতে বেশি আগ্রহী। কয়েকটি ছড়া-নাটক লিখেছেন।

ভোলা দত্ত — □ নৈহাটি। নাট্যকার। একাঙ্ক নাটক 'কিউবা' লিখেই সাড়া ফেলে দেন।

প্রহ্লাদ দাস — □ নৈহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। প্রথম মৌলিক নাটক

'রক্তদান শিবির'। 'ছিন্নমূল', 'বনসাই' প্রভৃতি নাটক লিখেছেন।

সোমনাথ চৌধুরী — ◻ নৈহাটি। নাট্যকার-অভিনেতা। মণিরামপুর মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছাড়াও অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনুপ কুমারের নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত থেকে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছেন। বেতার, চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শনেও অভিনয় করেছেন।

সিধু গাঙ্গুলী — ◻ নৈহাটি। অভিনেতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন রঙমহল থিয়েটারে অভিনয়ের সময়। তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ — ◻ নৈহাটি। নাট্যকার। 'সত্তর দশক', 'শহীদ' এরকম অনেক একাংক নাটক লিখেছেন। তাছাড়া লিখেছেন পূর্ণাঙ্গ নাটক।

জগবন্ধু চক্রবর্তী — ◻ নৈহাটি। বহুনাটকে অভিনয় করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী।

যূথিকা বসু — অভিনেত্রী। বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করলেও নৈহাটি যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠীর এবং কাঁচরাপাড়া 'আর্ট থিয়েটার'-এ যোগদান করে অনেক নাটক করেছেন। যাত্রাপালাতেও অভিনয় করেছেন।

দেবজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় — ◻ বারাকপুর নোনাচন্দনপুকুর। 'শাস্তির শাসানি' (একাংক) 'নাচনমণি' (পূর্ণাঙ্গ) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য পাঠক। কিছু অনুবাদ নাটকও তিনি রচনা করেছেন।

অংশুপতি দাশগুপ্ত — ◻ বারাকপুর। বেতার নাট্যকার-অধ্যাপক। বিদেশি কাহিনী অবলম্বনে বেতার নাটক 'বেলা শেষের গান' রচনা করেছেন। 'সেদিন আদালতে' উল্লেখযোগ্য মঞ্চ নাটক।

পরেশ ঘোষ — অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। হুগলীতে জন্মগ্রহণ করলেও বারাকপুর তালপুকুর অঞ্চলে থেকে 'বহুরূপী'-তে যেতেন অভিনয় ও নাটক বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য।

স্বপ্না রায়চৌধুরী — ◻ বারাকপুর। অভিনেত্রী। 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'চতুর্থ সন্তান' এরকম বহু নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

স্বপ্না মুখোপাধ্যায় —◻ বারাকপুর। অভিনেত্রী। অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বহু নাটকে নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। রবীন্দ্রভারতী আয়োজিত নাট্যপ্রতিযোগিতায় কয়েকবার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর শিরোপা লাভ করেন।

শান্তি দাস — ◻ বারাকপুর। অভিনেতা। 'বহুরূপীতে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। শম্ভু মিত্র, মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আশিষকুমার গোস্বামী — ◻ বরানগর। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। পথ নাটক, অনুবাদ নাটক ছাড়াও 'সোপান নাট্যপত্র' সম্পাদনা করেন।

বিমল রায় — ◻ বরানগর। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। গ্রুপ থিয়েটারে

বহু নাটক পরিচালনা করেছেন। বেতার নাটক লিখেছেন। তাঁর নাটক 'অভিনয়' জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বেশ কয়েকবার পুরস্কৃত হন।

বৈদ্যনাথ হালদার — □ বরানগর। নাট্যকার। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'এক টুকরো মেঘ', 'অন্য নাটক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরিমল দত্ত —□ বরানগর। নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য নাটক 'ব্যান্ড মাস্টার'। শিল্পী জীবনের ব্যথা, সমাজ জীবনের অব্যবস্থা তাঁর নাটকে স্থান·পেয়েছে।

অমর মৈত্র — □ বরানগর। নাট্যকার ও নির্দেশক। একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেছেন। জনপ্রিয় নাটক 'দাহক'। তাঁর নাটক বেতারেও অভিনীত হয়েছে।

সৌগত মুখোপাধ্যায় — □ বরানগর। অভিনেতা-নির্দেশক। 'সাজানো বাগান', 'কিনু কাহারের থেটার' প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় করেছেন।

স্বাতী মুখোপাধ্যায় — □ বরানগর। অভিনেত্রী। 'রাজদর্শন', 'চাপভাঙা মধু' এরকম অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন।

সৌরিন মুখোপাধ্যায় — □ বরানগর। অভিনেতা-নির্দেশক। 'ডাউন ট্রেন', 'এক পেয়ালা কফি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন।

তমাল লাহিড়ী— □ বরানগর। অভিনেতা-নির্দেশক। পেশাদর মঞ্চে প্রচুর অভিনয় করেছেন। ১৯৬২ খৃঃ শিশির ভাদুড়ী পুরস্কার পান শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে।

শুক্লা ভট্টাচার্য — □ বরানগর। অভিনেত্রী। নাটকে অভিনয় করা ছাড়াও যাত্রাপালাতে অভিনয় করেছেন পেশাদারি মনোভাব নিয়ে।

নকুলেশ্বর চৌধুরী — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। 'ফেরার সংকেত', 'বেলা শেষে' এরকম পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়াও অনেক একাংক নাটক রচনা করেছেন।

পূর্ণেন্দু পাল —□ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা। প্রথম থেকেই গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলায় পথ নাটিকার পথপ্রদর্শক। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনেশচন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার পান।

চুনীলাল ভঞ্জ — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা। একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'শেষ সংবাদ', 'অন্তরালে' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাটক।

বোম্মানা বিশ্বনাথন্ — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নিদের্শক। ১৯৮৯ খৃঃ জীবনাবসান হয়। 'তুমি আমায় কমিউনিস্ট করেছ', 'ট্যাক্স মন্ত্রী' এরকম বহু একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক নাটক লিখেছেন।

সরোজ চক্রবর্তী — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার। 'জিয়ন কাঠি' নাটকটি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। অনেক একাংক নাটক রচনা করেছেন।

অমিতাভ ভট্টাচার্য —□ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নিদের্শক-নাট্য সমালোচক। পেশায় ডাক্তার। চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক ঘটনা তাঁর নাটকে উঠে এসেছে। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। বেতারের জন্যও নাটক লিখেছেন।

সুব্রত মুখোপাধ্যায় —□ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। উল্লেখযোগ্য নাটক 'সহানুভূতি'।

পূর্ণেন্দু হালদার —□ বেলঘরিয়া। নাট্যকার। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। 'চে গুয়েভারা' উল্লেখযোগ্য নাটক।

বলরাম দে চৌধুরী — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। লিখেছেন একাংক, পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং যাত্রাপালা। উল্লেখযোগ্য নাটক 'পিলসুজ'।

উমেশচন্দ্র মিত্র — □ বেলঘরিয়া। নাট্যকার। শোভাবাজারের নাট্যশালায় অভিনীত ১৮৫৬ খৃঃ লেখা 'বিধবা বিবাহ' নাটক তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

অমল রায় — □ দক্ষিণেশ্বর। নাট্যকার। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। কয়েকবার উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। 'কেননা মানুষ' তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়।

মুরারী মুখোপাধ্যায় —□ দক্ষিণেশ্বর। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। উল্লেখযোগ্য একাংক নাটক রচনার পাশাপাশি নাটকে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পেয়েছেন।

চিররঞ্জন দাস —□ দমদম। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। রাজ্য সরকার ১৯৮৪ খৃঃ 'বীরঙ্গনা' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার প্রদান করেন।

বাবলু মুখার্জি (গৌতম মুখার্জি) — □ দক্ষিণেশ্বর। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। 'আমার লেনিন', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি ছাড়াও অনেক একাংক নাটক লিখেছিলেন।

সমীর মজুমদার — □ দক্ষিণেশ্বর। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক-সংগঠক। যাত্রাপালাও লিখেছেন। পি এল টি তে অভিনয় করেছেন।

সৌমিত্র কুমার চ্যাটার্জি —□ দক্ষিণেশ্বর। নাট্যকার-অভিনেতা। উল্লেখযোগ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক 'বিশ বসন্ত'। এছাড়া লিখেছেন একাংক নাটক।

সরোজ ঘোষ — □ দমদম। নাট্যকার। অনূদিত ও মৌলিক একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন।

মানবব্রত মুখোপাধ্যায় — □ দমদম। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। দমদম নটপীঠ নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। 'বিনিময়ে কিছু' নাটকটি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়।

দিলীপ ঘোষাল — □ আড়িয়াদহ। নাট্যকার। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। উল্লেখযোগ্য নাটক 'নখদন্ত'।

নিরূপ মিত্র — □ দমদম। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। লিখেছেন একাংক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক। উল্লেখযোগ্য নাটক 'শিউলির দিন'।

দেবাশীস মজুমদার — □ দমদম। নাট্যকার। তাঁর লেখা অনেক নাটক ভারতীয় কয়েকটা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নাটক 'দানসাগর'।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—□ দমদম। নাট্যকার। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের

নেহেরু পুরস্কার (১৯৭৭), গিরিশ পুরস্কার প্রভৃতি লাভ করেছেন। 'কসম', 'দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি নাটক লিখেছেন।

বিমলেন্দু দত্ত—□ দমদম। নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক। সঙ্গীতও রচনা করেছেন। গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত পূর্ণাঙ্গ, একাংক ছাড়াও পথনাটক লিখেছেন।

বারাকপুরের নাট্যমঞ্চ

(১) নজরুল মঞ্চ — কামারহাটি। (২) পানিহাটি লোকসংস্কৃতি ভবন— । (৩) প্রেমচন্দ শতবার্ষিকী হল — ভাটপাড়া। (৪) রবীন্দ্রভবন — টিটাগর। (৫) সুকান্ত সদন — বারাকপুর। (৬) হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবন — হালিশহর। (৭) বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট্ — হালিশহর। (৮) ক্ষুদিরাম বসু রঙ্গমঞ্চ — কাঁচরাপাড়া। (৯) হাইগুমার্স রঙ্গমঞ্চ — কাঁচরাপাড়া। (১০) সমরেশ বসু মঞ্চ — নৈহাটি। (১১) সত্যপ্রসন্ন মুক্ত মঞ্চ — আতপুর। (১২) পল্লীসেবক সংঘ মঞ্চ — মণিরামপুর। (১৩) পলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চ — মণিরামপুর। (১৪) চন্দ্রমোহন সা মুক্তমঞ্চ — মণিরামপুর সদর বাজার (এখানে একসময় জমজমাট যাত্রাপালা হত, কোনরকমে ধারাটি টিকে আছে)। (১৫) চিত্রবাণী — মণিরামপুর। (১৬) সংগঠনী — নিমতা। (১৭) রবীন্দ্রভবন — বরানগর। (১৮) ইছাপুর অনুশীলনী মঞ্চ — ইছাপুর। (১৯) নর্থল্যান্ড পুজামণ্ডপ মঞ্চ — ইছাপুর। (যাত্রাপালা অভিনেতা স্বপন কুমার এবং অভিনেত্রী বেলা সরকার এই মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন)। (২০) ইছাপুর ভ্রাতৃসংঘ মঞ্চ — ইছাপুর। (২১) এফ. টি. এস এবং ও. টি. এস মঞ্চ — ইছাপুর (রাইফেল ও মেটাল কারখানার কর্মীদের নাট্যসংস্থা হলেও বাইরের দলও ওখানে নাট্য মঞ্চস্থ করে থাকেন)। (২২) পার্ক মঞ্চ — ইছাপুর। (২৩) নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার লাগোয়া মুক্তমঞ্চ। (২৪) শিশুমঞ্চ, উত্তর প্রসাদ নগর, হালিশহর। (২৫) সাধক রামপ্রসাদমঞ্চ—হালিশহর।

নাট্যপত্রিকা

(সংকেত : প্রকাশের স্থান = ০)

(১) **বারাকপুর সাপ্তাহিক** —০ বারাকপুর নোনাচন্দনপুকুর। যদিও এটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, তবুও প্রতি সংখ্যাতেই নাটক বিষয়ে মননশীল লেখা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—প্রতীক রায়। (২) **নাট্যবীক্ষণ** —০ বেলঘরিয়া। সম্পাদনা—কুনাল সেনগুপ্ত। (৩) **শতাব্দীর সংলাপ** — সম্পাদক সত্যেন সাহা। (প্রথমে নাম ছিল সংলাপ, সম্পাদক অহীন্দ্র ভৌমিক)। ০ নিমতা। (৪) **সোপান নাট্যপত্র** — সম্পাদক আশীষ গোস্বামী। ০ দমদম। (৫) **শারদ সংলাপ** — সম্পাদক দেবাশীস সরকার। ০ হালিশহর। (৬) **নাট্যালাপ** — সম্পাদক প্রদীপ রায়। ০ নিমতা। (৭) **অভিনয়**

পত্রিকা— সম্পাদক অমল রায়। ০ আড়িয়াদহ। (৮) নাট্যকথা—০ আড়িয়াদহ। সম্পাদনা সৌমিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বারাকপুরের উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থা/নাট্য প্রযোজক সংস্থা

বারাকপুরের গণনাট্যসংঘের শাখা	সদস্য
সাম্প্রতিক — দমদম	২০
দুর্বার — শ্যামনগর	২৫
সাগ্নিক — বরানগর	১৭
খড়দহ — খড়দহ	১৮
কিন্নর — মনিরামপুর	২২
তালপুকুর সাংস্কৃতিক — তালপুকুর	৩৫
পানিহাটি — পানিহাটি	১৯
উত্তর বারাকপুর — ইছাপুর	১২
আড়িয়াদহ-দক্ষিণেশ্বর	২৬

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত)

নাট্যসংস্থাগুলির কিছু মৃত। যদিও মাঝে মাঝে অনেক সংস্থা আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে নাটক চর্চা শুরু করেছে, সেকারণে সেগুলিকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। তাছাড়া কোন একসময় তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায়না।

■ **হালিশহর অঞ্চল :** ইউনিটি মালঞ্চ, প্রহরী নাট্য সংস্থা, সংলাপ, হালিশহর সাংস্কৃতিক সংস্থা, স্টুডেন্টস্ থিয়েটার গ্রুপ, অঙ্গীকার, মাটি, মহুয়া, সুকান্ত সংঘ, প্রভাত নাট্য সংস্থা, রামপ্রসাদ নাট্য সমাজ, নমামি।

■ **কাঁচরাপাড়া অঞ্চল :** মঞ্চসেনা, পথসেনা, আর্ট থিয়েটার, চরিত্রায়ণ, কাঁচরাপাড়া সাংস্কৃতিক চক্র, সন্ধানী, হংসমিথুন।, ফিনিক, নাট্যকল্লোল, সংঘমিত্রা, নাট্যশ্রী, অঙ্গীকার থিয়েটার ইউনিট, আনন।

■ **খড়দহ অঞ্চল :** অ্যাজিট প্রপ, রক্তকরবী, প্রগতি নাট্য সংঘ, শৈলুষিক, রহড়া ক্লাব, রহড়া মন্দির, বন্দীপুর মিলনী, উদয়ন, লিভিং থিয়েটার, খারিজ নাট্যসংস্থা, রহড়া নান্দিক।

■ **ইছাপুর-নবাবগঞ্জ অঞ্চল :** নবাবগঞ্জ কালচারাল ফোরাম, রবিবাসরীয় নাট্য সংস্থা, সমকালীন, অঙ্গণ, আলেয়া, শিল্পায়ন, ভাবরূপ, ঠিকানা, অনুশীলনী, নির্ভিক সংঘ, ইছাপুর যুব নাট্যগোষ্ঠী।

■ **মণিরামপুর অঞ্চল :** পল্লীসেবক সংঘ, পলতা রিক্রিয়েশন ক্লাব, কূটাভাস, কুশাঙ্ক।

■ **বারাকপুর—টিটাগড় অঞ্চল :** (বারাকপুর) সাগ্নিক, ত্রৌযাত্রিক, নীহারিকা — আনন্দপুরী, স্ফুরণ নাট্যসংস্থা — মোহনপুর, চাণক্য নাট্য সংঘ, ময়ুখ নাট্যসংস্থা, অঙ্কুশ—পাতুলিয়া, অঙ্গীকার—নোনা চন্দনপুকুর, পিপলস্ আর্ট থিয়েটার।

■ **নৈহাটি-গরিফা অঞ্চল :** যাত্রিক, নৈহাটি পঞ্চবেদ, আঙ্গিক, সময়, বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ, বঙ্কিম অ্যাথলেটিক ক্লাব, রূপান্তর, রঙ্গরূপা, জাগরণ, মিলন সংঘ, যুগছন্দ, নিউ গরিফা সেন্ট্রাল ক্লাব, ভ্রাতৃসংঘ, চেনামহল।

■ **ভাটপাড়া—গারুলিয়া অঞ্চল :** ক্রান্তিকার, শিল্পীলোক—ভাটপাড়া, সুভাষপুর বলাকা নাট্যসংস্থা—কাঁকিনাড়া, রূপকথা—ভাটপাড়া, শিল্পীচক্র—কাঁকিনাড়া, জাগৃতি—আতপুর, নবীনসংঘ—আতপুর, নিন্দুক—শ্যামনগর, ঐকিক—শ্যামনগর, শ্যামনগর নাট্যসংঘ, পথিকৃৎ—জগদ্দল।

■ **পানিহাটি-সোদপুর-আগরপাড়া অঞ্চল :** সায়ুধ, লুব্ধক, সাগ্নিক (ঘোলা), ক্রান্তিকাল, মঞ্চদূত—আগরপাড়া, পাঞ্চজন্য, অনুভব নাট্যগোষ্ঠী, তরঙ্গ—সোদপুর, প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক সংস্থা, মঞ্চপথিক, সংহতি সাংস্কৃতিক চক্র, সুখচর গ্রুপ, পানিহাটি অভিযাত্রী, পানিহাটি ক্লাব, সুখচর পঞ্চম রেপার্টরি থিয়েটার, মঞ্চসেনা, ইঙ্গিত, দৃশ্যায়ন, মৃগাঙ্ক নাট্যসংস্থা, সোদপুর ক্লাব, সোদপুর সাংস্কৃতিকচক্র, পানিহাটি অভিযাত্রী।

■ **কামারহাটি-বেলঘরিয়া অঞ্চল :** শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র—দক্ষিণেশ্বর, বেলঘরিয়া ইউথ সেন্টার, কোমলগান্ধার, সম্মিলনী—যতীন দাস নগর, বৈশাখী নাট্যসংস্থা, অনুকৃতি, বিজন নাট্য সংস্থা, অভ্যুদয়, শিল্পাঙ্গন, অবেক্ষণ, রম্বস, অনামী নাট্য গোষ্ঠী, অগ্রগামী নাট্য সংস্থা, থিয়েটার প্রাকটিস, অগ্রদূত।

■ **বরানগর অঞ্চল :** অভ্যুদয়, লোকায়ত, ক্যানভাস, প্রতিভা নাট্য সংস্থা, আবর্ত, সমন্বয় নাট্য সংস্থা, মনন নাট্য সংস্থা, মুখোশ, নাট্যব্রতী।

■ **দমদম, দঃ দমদম, উঃ দমদম অঞ্চল :** তরঙ্গ—দঃ ক্যান্টন, মঞ্চসারথী, নটপীঠ—নাগের বাজার, কথাকলি—দঃ ক্যান্টন, লাইমলাইট—জপুর, থিয়েটার ক্যাম্প, ক্যালকাটা পুনশ্চ, নটতীর্থম, প্রয়াগ নাট্যসংস্থা, সংগঠনী—নিমতা, গণকণ্ঠ—উঃ দমদম, গাণ্ডীব নাট্যসংস্থা—নিমতা, মঞ্চমিতা—নিমতা, নানাকথা—নিমতা, রূপক থিয়েটার—রবীন্দ্রপল্লী, উত্তর দমদম সাংস্কৃতিক সংস্থা, থিয়েটার নবরূপা—উঃ দমদম, চন্দ্রমুখ নাট্যগোষ্ঠী—উঃ দমদম, চিরাগ নাট্যসংস্থা—উঃ দমদম, অভিব্যক্তি—উঃ দমদম, জাগরণ—নিমতা, থিয়েটার, ফোরাম—উঃ দমদম, সোপান, সংলাপ, সাম্প্রতিক।

তথ্যসূত্র : (১) বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান—সাহিত্য সংসদ, (৩) উত্তর ২৪ পরগণার নাট্যচর্চা—অহীন্দ্র ভৌমিক, (৪)

সুদক্ষিণা—সুব্রত ভট্টাচার্য, (৫) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পত্রিকা—একাদশ রাজ্য সম্মেলন সংখ্যা ১৯৯৯, (৬) বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—আশুতোষ ভট্টাচার্য, (৭) পানিহাটি পরিক্রমা—কৃশাণু ভট্টাচার্য, (৮) গাঙ্গেয় বার্তা, (৯) সরাসরি যোগাযোগ, (১০) শতবর্ষে নাট্যশালা—সম্পাদনা : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং ড. অজিতকুমার ঘোষ, (১১) নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর—সুনীল দত্ত।
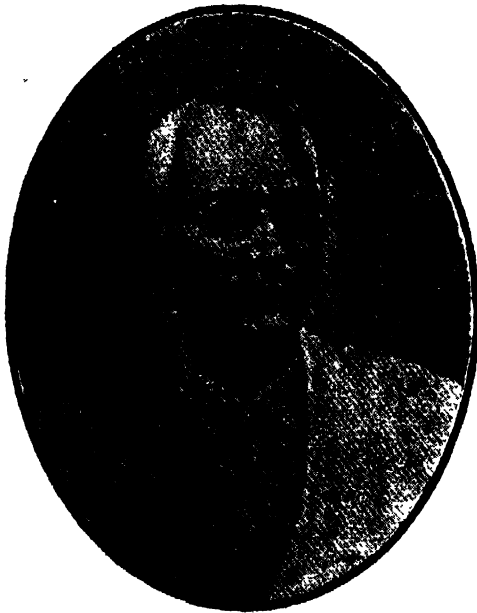
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

সৌজন্য : বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)

লেখক পরিচিতি ঃ অধ্যাপক

বারাকপুরের সেই সব নারী

রানী রাসমণি ও শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

—————————————— আনন্দপ্রসাদ রায়

■ রানী রাসমণি

১৮৪৭ সাল। রানী রাসমণি কাশী যাবেন বলে ঠিক করেছেন। সাথে মেয়ে-জামাইরা ছাড়াও আরো অনেকে যাবেন। পঁচিশখানা বজরা ঠিক করা হয়েছে। খাদ্যসামগ্রী, বিছানা-পত্র প্রভৃতি অঢেল জিনিস চলল। দেশে এসময় দারুণ দুর্ভিক্ষ। রানীর মন বিচলিত। স্বপ্নে দেখলেন মা অন্নপূর্ণা যেন বলছেন : "বারাণসী যাওয়ার দরকার নেই। ভাগীরথী তীরে শিবশক্তির পাথরের মূর্তি বসিয়ে রোজ রোজ পুজো ও ভোগের ব্যবস্থা কর। আমি রোজ তোর পুজো নেব এবং আমার গরিব ছেলেরা প্রসাদ পেয়ে বাঁচবে।" প্রাতেই মথুরবাবুকে ঘটনাটা জ্ঞাত করালে, তিনি বজরার সমস্ত জিনিস গরিবদের বিলিয়ে দিলেন।

কলকাতা থেকে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে জমি মিলল মন্দির প্রতিষ্ঠার। জমির কিছুটা ছিল ইংরেজ এটর্নি হেস্টি সাহেবের, আর বাকিটা কবরস্থান ও হাজিসাহেবের পীর। জায়গাটা দেখতে কচ্ছপের পিঠের মত। ১৮৪৭ সালের ৬সেপ্টেম্বর ৫৫ হাজার টাকায় ৬০ বিঘা জমি কেনা হল। মন্দির নির্মাণের জন্য ১০ বছর সময় লাগল—ব্যয় হল ৯ লক্ষ টাকার মত। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০জন কর্মীকে নিয়োগ করা হলো। মন্দিরের খরচ নির্বাহের জন্য তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে দিনাজপুর জেলার শালবাড়ি পরগণা কিনে দেব সেবার জন্য দানপত্র করে যান।

রানী রাসমণির বয়স তখন বাষট্টি হবে। ১৮৫৫ সালের ৩১ মে দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। ভবিষ্যতের অবতারবরিষ্ঠ শ্রী রামকৃষ্ণ যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৯ বছর। ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণে, স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধকরণে নীরবে একটা সামগ্রিক বিস্ফোরণ ঘটানোয় বা বিপ্লব সংগঠনে এই দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের ভূমিকা অনন্য তথা নজিরবিহীন। স্বামী

গম্ভীরানন্দ বলেন : "রানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন। ইহাই তাঁহাকে বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া করিয়াছে।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, পৃঃ-৪২২)।

স্বামী গম্ভীরানন্দজি আরও বলেন : "বিধির বিধানে তিনি ও তাঁহার জামাতা সর্বতোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাঁহার সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ-সৃজনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণপূর্বক যুগপ্রবর্তক কার্যের সহায়করূপে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।" (শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২য়ভাগ, ১৩৮০, পৃঃ ৪১২)। 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণ—রানী রাসমণি—এই ত্রিবেণী সংযোগ যেন কে অপ্রতিরোধ্য ও অবিভাজ্য আলোক শিখা'। ভগিনী নিবেদিতা রানী রাসমণিকে 'একজন বীর হৃদয়া রমণী' বলে উল্লেখ করে বলে গেছেন : 'মানবিক দৃষ্টিতে দেখলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির না হলে, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পেতাম না, শ্রীরামকৃষ্ণ না থাকলে স্বামী বিবেকানন্দও আসতেন না এবং স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত পাশ্চাত্যদেশে কোন প্রচারকার্যও হতো না।"

সাময়িকপত্র 'সোমপ্রকাশ' ৪-৬-১৮৫৫ তারিখে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠায় রাসমণির অবদানের কথা এইভাবে উল্লেখ করেছে—

> "জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসি তিথি যোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্যকর্ম্ম উপলক্ষে রানী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থাপনে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ পট্টবস্ত্র, নগদ টাকা দিয়াছেন। ..... নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমনীয় রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়। বরানগর অবধি নাটমন্দির পর্যন্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে বান্ধা রোসনাই হয়। .... কাঙালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা, কেহ অর্দ্ধমুদ্রা, কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রানী রাসমণি তাঁহাদিগকে সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্যে রানী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই।"

কলকাতার জানবাজারের প্রীতিরাম দাসের (মাড়ের) নাম কে না জানতেন? হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র—প্রীতিরামের দুই ছেলে। জ্যেষ্ঠপুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

কণিষ্ঠপুত্র রাজচন্দ্রের পরপর দু'টি স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। হুলিশহরের কাছে কোনা গ্রামে হরেকৃষ্ণ দাসের সুশ্রী সুলক্ষণা একটি মেয়ের সন্ধান পেয়ে লোক পাঠান। দৌত্য সার্থক। মাহিষ্য পরিবারের মেয়ের বিয়ে হলো মাড় ঘরে। চাষী তথা ঘরামির মেয়ে রাসু (রানী রাসমণির ডাক নাম—তাঁর মা তাঁকে ডাকতেন 'রানী' বলে) ১১ বছর বয়সে বাংলার ১২১১ সালের ৮ বৈশাখ সোনায় মোড়া হয়ে কুঁড়ে ঘর থেকে প্রাসাদোপম জমিদার গৃহে রাজচন্দ্রের স্ত্রী হয়ে এলেন।

রাজচন্দ্র শিক্ষিত ছিলেন ও তৎকালীন সমাজে উচ্চাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। সে সময়কার উল্লেখযোগ্য পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বড়লাট অকল্যান্ড থেকে শুরু করে শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ, পাথুরেঘাটার ঠাকুর বংশ, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব, অক্রুর দত্ত প্রভৃতির সাথে তাঁর ওঠাবসা। অধ্যবসায় ও প্রতিভা, বুদ্ধিবল ও চরিত্রগুণে তিনি বাংলার একজন হয়ে উঠেছিলেন এই নিরলস জমিদার রাজচন্দ্র। তাঁর উপার্জনের একটা উদাহরণ দেয়া যাক—এক্সচেঞ্জ অফিসের নীলাম ডেকে এক দিনেই ৫০,০০০ টাকা আয় করেছিলেন। যোগ্য স্বামীর যোগ্য স্ত্রী ছিলেন রাসমণি। নববধূ রাসমণির জীবনধারার এক অপূর্ব বর্ণনা পাই শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী মশায়ের 'রানী রাসমণি' পুস্তিকায়—"রানী শ্বশুরবাড়ি এসে নিজগুণে শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী এমনকি অন্য গুরুজন ও আত্মীয় সকলকেই মুগ্ধ করতে পেয়েছিলেন। যেমনি বুদ্ধি, তেমনি সহ্যগুণ, যেমনি ধর্ম্মভাব, তেমনি সংসার চালাবার শক্তি দেখে সকলে আশ্চর্য হয়েছিল। কি গৃহস্থালীর কাজে, কি দেবসেবায়, কি লোকজনের যত্নে সকল কাজেই তাঁর গৃহিণীপনা দেখা যেত। .... রানী প্রতিদিন শ্বশুর-শাশুড়ীর পায়ের ধূলা না নিয়ে জল খেতেন না। সকালে উঠেই সংসারের কাজে লেগে যেতেন। আর রাত দুপুর পর্যন্ত সে কাজ শেষ হতো না। সারাদিন একটুও অবসর মিলত না। ফুল তোলা, মন্দির পরিস্কার প্রভৃতি ঠাকুর পুজোয় কাজ হতে রান্না ঘরে রান্নার কাজ পর্যন্ত সকল কাজেই তাকে দেখা যেত। অত বড়লোকের বাড়ি, রান্নার লোকের অভাব ছিল না, তবুও রানী নিজে রান্না করতেন। এ বিষয়ে শাশুড়ী কত বারণ করতেন, কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ীর জন্য কিছু না কিছু রান্না করতেন। এত কাজের মধ্যেও রানী রোজ পূজা জপ না করে আহার করতেন না। ..." রাসমণির জীবধারার সাথে যেন শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনধারার এক অপূর্ব মিল পাওয়া যায়। যা হোক, বাল্যকালে পিতৃগৃহে যে ধর্মীয়ভাব ও শিক্ষা পেয়েছিলেন—নিঃসন্দেহে বলা যায়—জমিদার পরিবারে এসেও তিনি সে ধর্মীয় জীবন অটুট ও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

রাজচন্দ্র তাঁর গুণবতী সহধর্মিনীর পরামর্শ নিয়ে সব কাজে হাত দিতেন, সফলও হয়েছেন। নিমতলায় শ্মশান ঘাটে একটা ঘর, একজন চিকিৎসক, একজন দারোয়ান ও দু'জন চাকরের ব্যবস্থা করে। আহিরীটোলায় গঙ্গার ঘাটের নির্মাণ করেন তাঁর

(রাজচন্দ্রের) মায়ের স্মৃতিতে। বেলেঘাটা খাল খননের জন্য জমি দান করেন, চাণকের তালপুকুরটির সংস্কার করেন। মেটকাফ হলে গভর্ণমেন্ট লাইব্রেরির উন্নতির জন্য ১০ হাজার টাকা দান করেন (বর্তমানের জাতীয় গ্রন্থাগার) বাবুরোড ও ছত্রিশটি থাম এবং চাঁদনী সমেত বাবুঘাট তৈরি করে দেন।

রাজচন্দ্র-রাসমণির চারটি কন্যাসন্তান জাত হয়—পদ্মমণি, কুমারী, করুণা ও জগদম্বা। এদের বিয়ে দেন যথাক্রমে সিঁথির রামচন্দ্র দাস, খুলনার প্যারীমোহন চৌধুরী ও বসিরহাটের মথুরানাথ বিশ্বাসের (করুণা মারা গেলে পরে জগদম্বার) সাথে। এই উদারহৃদয় দানবীর কথা কর্মবীর রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয় বাংলার ১২৪৩ সালে।

স্বামীর মৃত্যুর পর ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ও ব্যবসার দায়িত্ব বর্তায় রাসমণিতে। তিনি শুচিতার সাথে বৈধব্য জীবন যাপন করতেন। 'প্রতিদিন খুব ভোরে উঠে নিজের সব কাজ শেষ করে পাট-কাপড় পরে আগে রঘুনাথ জীউকে প্রণাম করতেন ও সেইখানে মালা নিয়ে জপে বসতেন। গলায় মোটা তুলসীর মালা থাকত। তারপর জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে মতামত দিতেন।

হুকুমনামায় সহি করতেন, হিসাব দেখতেন এবং কর্মচারী নিযুক্ত করতেন। জামাই মথুরামোহনই সব দেখাশুনা করতেন, রানী কিন্তু পরামর্শ দিতেন ও কাগজপত্র সহি করতেন।' ('রানী রাসমণি'—শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, পৃঃ১৫)। নিয়মিত ধর্মপুস্তক পাঠ করতেন ও শাস্ত্রালোচনা শুনতেন।

এসময় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বেচ্ছায় রাণীর স্টেটের ম্যানেজারের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব পাড়লে, রানী সুকৌশলে উত্তর দেন, "আমি বিধবা, বিষয় কি এমন বেশি! আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আমার কাজ করতে বলা ধৃষ্টতা মাত্র। ছেলের মত আমার জামাইরাই দেখাশুনা করবেন।" এতে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি প্রজা মঙ্গলে সদা সচেতন ছিলেন। প্রজাদের চাষের সুবিধার জন্য লাখ খানেক টাকা ব্যয় করে টোনার খাল সংস্কার করিয়ে মধুমতীর সাথে নবগঙ্গা নদী মিশিয়ে দেন। মকিমপুর পরগণায় নীলকর সাহেবরা উৎপাত ও উপদ্রব শুরু করলে তিনি ৫০জন দারোয়ান পাঠিয়ে নায়েবকে দিয়ে ডোনাল্ড সাহেবকে উত্তম-মধ্যম দেবার ব্যবস্থা করেন। জেলেদের উপর চাপানো জলকর রহিত করান। দূরদর্শী বিষয়বুদ্ধির নমুনা মেলে তাঁর তাৎক্ষণিক অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতায়। সিপাহী বিদ্রোহ চলছে। হিতৈষীদের ধারণা কোম্পানী থাকবে না— তাই রানীর উচিত কোম্পানীর কাগজ বেচে দেওয়া। রানী কিন্তু বিপরীতটি করলেন। তিনি আরও কাগজ কম দামে কিনে রাখলেন। পরে বিদ্রোহের আগুন প্রশমিত হলে সেই কাগজ বেচে বহু অর্থ মুনাফা করেন। তীর্থে তীর্থে অজস্র দান, দাসদাসীর প্রতি মাতৃসমা দরদ প্রদর্শন, সাহিত্যসেবীদের প্রতি উদার সাহায্যের হাত বাড়ানো, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের কন্যা উদ্ধারে

সর্বতোভাবে সাহায্য দান--কি না করেছেন! অনেকে তাঁর কাছে আশ্রয়-অন্ন-বসন পেয়ে তরে গেছে। এমন কি কত ছেলে পড়াশুনা করে মানুষ হবারও সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

রানীদের জগন্নাথপুরে তালুক ছিল। সেখানে লড়াইলের জমিদার রামরতন রায় নানারকম উপদ্রব চালাচ্ছিলেন। সে খবর পেয়ে রানী সাথে সাথে শক্তহাতে সে উপদ্রবের মোকাবিলা করেন। একবার রানী নৌকাযোগে ত্রিবেণী হতে ফিরছেন। ডাকাত তাঁদের পিছু নিয়েছে। সন্ধ্যা হয়েছে, চন্দননগরের কাছাকাছি গরুটীর জঙ্গল অবস্থিত। সেখান থেকে ডাকাতরা তাঁর নৌকায় চড়াও হয়। ডাকাত আর রানীর দারোয়ানে লাঠালাঠি-গোলাগুলি চলল। রানীর পক্ষে বন্দুকের গুলি গিয়ে বিঁধল এক ডাকাতের গায়ে। ডাকাতরা রানীকে চিনতে পেয়ে বলল, "রানী মা! আমরা টাকার জন্য এসেছি। খুনোখুনি করা বা আপনার অপমান করার ইচ্ছা নাই; এখন আপনি যা ভাল হয় করুন।" ডাকাতের দলে লোকজন বেশিই ছিল। অকারণ প্রাণহানি ঘটুক তিনি চান না। তিনি জবাবে জানালেন, "আমি আজ ফিরছি, টাকাকড়ি বিশেষ সঙ্গে নাই, তোমরা ফিরে যাও, কাল এইসময় তোমাদের জন্য যথেষ্ট টাকা পাঠিয়ে দেব।" তারা রানীর কথায় নিরস্ত হল। কেন না জানত দয়াবতী রানীর কথার কখনো অন্যথা হয় না। পরের দিন সত্যি সত্যিই ডাকাতরা কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিল।

রানীর যে কি বন্ধুপ্রীতি ও উদার স্বভাব ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একবারের ঘটনায়।বিয়ের তিন দশক বাদে রাসমণি বাপের বাড়ির গাঁয়ে এসেছেন। তাঁকে দেখতে গাঁ কে গাঁ ভেঙ্গে পড়ল। তিনিও তাদেরকে বহু দান-ধ্যান করলেন। লক্ষ্য করলেন তার পুরানো বন্ধুদের মধ্যে ছেলেবেলার সখী—খেলার সাথী তরুবালা তো আসেনি। খোঁজ করে জানলেন তরু বাপের বাড়িতেই আছে। তাকে খবর পাঠালেন সে যদি না আসতে পারে, তবে তিনিই যাবেন তার বাড়িতে। তরু সাথে সাথেই এল রানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে। দুজনে কত কথাই না হলো! এবার রানী জানতে চাইলেন, "ভাই, তুমি তো আমার আসার কথা জানতে, তবে এলে না কেন?" অনেক পীড়াপীড়িতে বললে, "তোমায় আমায় একদিন খেলা সেরে ঘরে ফিরতে একটু রাত হয়। তাতে তোমার পিসিমা বলেছিলেন—'তুমি আর রানীর সাথে বেড়াতে বা খেলেতে এসো না।' তারপর তোমার বিয়ে হলো, তুমি দেশ ছেড়ে চলে গেলে।" রানী হেসে বললেন, "তবে আজ যে এলে?" "থাকতে পারলাম না তাই, আমার একটু অভিমানও হয়েছিল যে রানী না ডাকলে যাব না।" এরপর রানী আবার তরুর বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের সাথে দেখা করে, প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়ে এলেন। ওদের বেশ কিছু দামসামগ্রীও দিলেন। আসার আগে ওখানকার গঙ্গায় স্নানের জন্য একটি ঘাট তৈরির জন্য ২৫/৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করে এলেন—সেই ঘাটের নাম রাখা হলো তাঁর মায়ের নামেই 'রামপ্রিয়া ঘাট'। হুগলীতেও একটা ঘাট করে দেন সেখানকার লোকেদের সুবিধার্থে। রানী

রাসমণির ঘাট বাবুগঞ্জেও আছে।

এতদিন যাবৎ জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে— কোন প্রকার খাজনার ব্যাপার ছিল না। কিন্তু জলপুলিশ জলকর বসালে শেষমেশ জেলেরা এর প্রতিবিধানকল্পে রানীর শরণাপন্ন হয়। রানীর দৃঢ়তার, বুদ্ধির কৌশলে ও মামলার কাছে গভর্ণমেন্ট হার মানতে বাধ্য হয়। তখন চারপাশে রানীর নামে জয়ধ্বনি। এই গানটি তখন প্রজাদের মুখে মুখে ফিরছে—

"ধন্য রানী রাসমণি রমণীর মণি,
বাঙ্গলায় ভাল যশ রাখিলে আপনি।
দীনের দুঃখ দেখে কাঁদিলে জননী,
দিয়ে ঘরের টাকা পরের জন্য বাঁচালে পরানী।
যে যশ রাখিলে তুমি হইয়ে রমণী
ঘরে ঘরে তোমার নাম গাইল দিবস রজনী।"

কলকাতা দুর্গাপুজোর আনন্দে মেতেছে। নবপত্রিকা বা কলা বৌ গঙ্গায় স্নান করান হবে। জানবাজারের রাস্তায় ঢাকের বাদ্যি বেজে উঠল। গঙ্গার পাশ দিয়ে বাবুঘাট পর্যন্ত রাস্তায় যেন বাজনাদারের ঢল নেমেছে। ঐ রাস্তার এক মস্ত বাড়িতে এক পদস্থ সাহেব থাকতেন—তিনি এই বাজনার আওয়াজে অতিষ্ঠ হয়ে ঢাক বাজানোকে বেআইনী ঘোষণা করে আদালতে মামলা ঠুকলেন রানীরাসমণির বিরুদ্ধে। রাসমণিও নিজের অধিকারের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। রানীর বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার কাছে সাহেবকে নত হতে হল। সরকারের সাথে সমস্যাটির এইভাবে রফা হলো—'ঐ রাস্তায় পূজা-পার্বণে ঢাক বাজবে, মিছিল বের হবে, তবে সরকার কোম্পানির কাছ হতে একটা অনুমতি (পাশ) নিতে হবে।' এই ঘটনাকে নিয়ে ছেলে বুড়োর দল ছড়া বাঁধল—

'আট ঘোড়ায় গাড়ি দৌড়ায় রানী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ করতে পারলে না তাই কোম্পানি।'

একসময় কলকাতায় ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে একজন অধিনায়কের অধীনে দু'শ থেকে আড়াইশ'র মতো গোরা পল্টন থাকত। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল—পাড় মাতাল-উচ্ছৃঙ্খল-ছিনতাইকারী-অত্যাচারী। পাশেই 'রানী রাসমণি কুঠী'। সেদিন সন্ধ্যায় ঐ রাস্তায় একজন পথিককে ধরে তিন-চারজন মাতাল গোরা তার উপর নির্যাতন চালাচ্ছিল। জামাইরা ছাদ থেকে ব্যাপারটা দেশে সহ্য করতে পারলেন না। দারোয়ানদের পাঠালেন গোরাদের ঠেঙ্গাতে। সে রক্তারক্তি, খুনোখুনি কাণ্ড। গোরারা আরও সাঙ্গ পাঙ্গ জুটিয়ে সদলবলে রানীর অন্দরমহলে ঢুকে পড়ল। বাড়ির মেয়ে-জামাই-বাচ্চারা সব পিছনের দরজা দিয়ে মান্নাবাবুদের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। রানী কিন্তু ভৈরবী মূর্তিতে হাতে খড়গ নিয়ে কোমর বেঁধে ঠাকুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। গুণ্ডারা রানীকে এই ভীষণা ও ভয়ঙ্করী রণমূর্তিতে দেখে রণে ক্ষান্ত দিল। মথুরবাবু অবশ্য তখন বাড়িতে

ছিলেন না। তিনি এলে তাঁর হস্তক্ষেপে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। রানী সরকারের কাছ থেকে তাঁর বাড়ির ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়েছিলেন। তাই তো বীরাঙ্গণায় ও তেজস্বিতায় রানী ছিলেন অনন্যা।

১৮৬১ সালের কথা। রানী রাসমণির বয়স তখন আটষট্টি হবে। এ সময় একদিন হঠাৎ পড়ে গিয়ে জ্বরে পড়লেন। সাথে পেটের অসুখ দেখা দিল। রানী শয্যাশায়ী হলেন। ডাক্তার-কবিরাজরা প্রায় জবাব দিয়েদিয়েছেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি। রাত ৮টা। তাঁর সামনে অনেক আলো দেখে হঠাৎ বলে উঠলেন, "সরিয়ে নে, সরিয়ে নে, ওসব রোসনাই আর ভাল লাগছে না। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিতে চারদিক আলো হয়ে উঠেছে।" নিমেষেই যেন জগন্মাতা কালীর কোলে সমাহিত হলেন। একটি দীপশিখা নির্বাপিত হলো। রানী রাসমণির মত এমন দুর্লভ তেজস্বিতা, গভীর জাতীয়তাবোধ, বীরোত্তমা, বৈষয়িক বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সত্যে অটলতা, অনমনীয় দৃঢ়তা ও করুণাময়ী এক মাতৃরূপ রানী ভবানী, শ্রীশ্রী মা সারদা দেবী, রানী স্বর্ণময়ী ব্যতিরেকে আর কোন বঙ্গ রমনীর মধ্যে পাই? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার জানিয়েছেন, "রানীর গুণের কথা না যায় বাখানি।" সত্যিই এমন রানীর গুণের কথা মহিমার কথা ব্যাখ্যাতীত। 'রানী মা' তো 'মায়ের অষ্ট সখীর এক সখী' ছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করে গেছেন, "ঠাকুর বলতেন, 'রানী রাসমণি শ্রীশ্রী জগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন। ধরাধামে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।' জমিদারীর দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার যে শীল মোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল—কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী। রানীর প্রতি কার্যেই ঐরূপে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।" (১ম ভাগ, পৃঃ ১৫৯)। রানীর ধর্মে অটল বিশ্বাস, দেবদেবীতে অচলা ভক্তি, মানুষে অসীম দয়া, মনে অসাধারণ মহত্ব, শরীরে অদম্য তেজ ও সাহসের কথা দেশবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে ও ভক্তিভরে অনন্তকাল স্মরণে রাখবে।

রানী রাসমণি বা তাঁর সৃষ্ট দক্ষিণেশ্বর না থাকলে আমরা রামকৃষ্ণকে পেতাম না। আর রামকৃষ্ণকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। একথা অনস্বীকার্য—এসবেরই ভিত্তিভূমি নির্মাতা 'রাজেশ্বরী রাসমণি'। রানী রাসমণি যখন চল্লিশ অতিক্রান্তা, সে সময় শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। এ যেন মাতা-পুত্রের সম্পর্কে এ মর্ত মঞ্চে দোহের আগমন। কিন্তু "বিস্ময় জাগে, যখন দেখি, ভাবি এ কোন রূপক, রামকৃষ্ণ চড় মেরেছেন রাসমণিকে—'এখানেও বিষয়ের চিন্তা?' মন্দিরে আশ্রিত, বেতনভুক কর্মচারীর হাতের প্রহারে রাজসিক প্রাচী প্রাকারে ফাটল ধরল। অহংবোধের বেড়াটা ভেঙ্গে গেল। আর তখনই নতুন করে জেগে উঠলেন যেন আর এক রাসমণি, আর এক সত্তা নিয়ে। সৎ, চিদ্ আনন্দের উপাসিকা, সাত্ত্বিক, তাপসী এক রমণী। যিনি ত্যাগে-প্রেমে-বৈয়াগ্যে চির ভাস্বর।" (রাজেশ্বরী রাসমণি—গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ)। নিজের শক্তিতে তিনি নারী সমাজে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন।

■ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

স্বামীজি বলতেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষকে চিনতে হয়। তিনি আরও বলেন যে তাঁর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যে তিনি বেশি বেশি করে মানুষের মহত্ত্বের অনুসন্ধান করতেন। তিনি এও জানতে চাইতেন একজন মহান মানুষ কি বেশভূষা পরেন, কি খান ও চাকর-বাকরদের সাথে কিরকম আচরণ করে থাকেন। শ্রীশ্রীমায়ের আচরণও ছোট ছোট খুঁটিনাটি কাজে আদর্শস্থানীয় ছিল।

একবার জ্ঞানানন্দ জয়রামবাটিতে গোয়ালার কাছে খাঁটি দুধ চেয়ে বলেছিলেন, 'টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই।' পরে মা ব্যাপারটি জানতে পেরে তাঁকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'ওকি জ্ঞান, এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরীবে খেতে পায়। আর তুমি অমনি করে দর বাড়াচ্ছো! গোয়ালা— সে তো জল দেবেই। দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশি পাবে বলে আরও জল মেশাতে চাইবে।' এ মা আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীশ্রী মা সারদা। এখানে তাঁর সমাজতান্ত্রিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমজাদ নামে এক মুসলমান তুঁতে ডাকাতকে মায়ের ঘরের বারান্দায় খেতে দেয়া হয়েছে। মায়ের ভাইঝি নলিনী উঠানে দাঁড়িয়ে দূরত্ব বাঁচিয়ে চেলে চেলে পরিবেশন করছে দেখে মা বলে ওঠেন, "অমন করে দিলে কি খেয়ে সুখ পায় মানুষ?" নলিনীকে সরিয়ে মা আন্তরিকভাবে তাকে খাওয়ালেন। নিজ হাতে জায়গাটা পরিষ্কার করলেন। নলিনী জাত যাবার প্রশ্ন তুলতেই মা ধমক দিয়ে বলে ওঠেন, "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।" —এ মা আর কেউ নয়, স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা। সত্যিই জগন্মাতার কাছে সব সন্তানই সমান।

মা ম্যালেরিয়ায় ভুগে সবে কলকাতায় এসেছেন। ভক্তরা পর্যন্ত মায়ের দর্শনের সুযোগে বঞ্চিত। এমন সময় বোম্বে হতে এক পার্শী যুবক এসে কোনক্রমে শরৎ মহারাজের অনুমতি পেয়ে মাকে প্রণাম করে বলে, " মাঈজি, কুছ মূলমন্ত্র দিজেয়ে, জিসসে খোদা পহচান যায়।' অসুস্থ শরীরে মা কিন্তু নিজেই উপচার গুছিয়ে 'পার্শী-চেলা'র মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিলেন। —এ মা আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা। কত বড় সন্তাননিষ্ঠ প্রাণ!

জয়রামবাটিতে মা ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া-থাকার ব্যবস্থা নিজেই যত্নসহকারে করতেন। কোন ভক্তের সেখানে খাওয়ার কথা থাকলে, সে না আসা পর্যন্ত মা অভুক্ত থাকতেন। ভক্ত ফিরে এলে মা বলতেন, "বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কি প্রকারে খাই?" এখানে ভক্তেরা মায়ের সান্নিধ্য লাভ করতেন অবাধে।—এ মা আর কেউ নন, স্বয়ং শ্রীশ্রীমা সারদা। এ জাতীয় ত্যাগের ব্যবহার কদাচিৎ গর্ভধারিনীতে দৃষ্ট হয়।

মানুষ দু-চার দিন নিজ পছন্দমতো কাজ প্রীতির সাথে করে থাকে, কিন্তু মা জীবনব্যাপী দৈনিক কাজগুলি প্রীতির সাথে করে গেছেন। "...... জয়রামবাটিতে সকাল

বেলা সেই ঘণ্টা দুই ধরিয়া শাক তরকারি কুটা, রান্নার জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, পূজার সব যোগাড় করিয়া নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষা দান, প্রসাদ ও জলখাবার বাটিয়া দেওয়া, অন্তত একশত খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ির লোকদিগকে খাওয়ান, বৈকালে নিজহাতে লুচি, রুটি, তরকারি প্রভৃতি করা, দুধ জ্বাল দেওয়া, লণ্ঠন পরিষ্কার করা—সবই যেন নিত্য নূতন প্রীতির সহিত করিয়া যাইতেছে।" (শ্রীশ্রী মায়ের জীবনকথা"—স্বামী অরূপানন্দ)

"তিনি রাত্রিপ্রায় তিনটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন। ... তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুর তুলিতেন এবং পরে জপে বসিতেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার সময় শেষ রাত্রি উঠিয়া শৌচস্নানাদি শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকিতেন, সেই অভ্যাস তাঁহার আজীবন ছিল। শরীর খারাপ থামিলেও যথাসময়ে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া বরং পরে আবার একটু শুইতেন।" সংসারের প্রতিটি মা-বোনেরা যদি নিজেদের জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের রোজনামচার সামান্য অংশও অনুসরণ করতে পারেন বা করেন, তবে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সংসার প্রকৃত শান্তির নীড় হয়ে উঠতে পারে। বঙ্গের ঘরে ঘরে এ জাতীয় জীবনযাত্রার বড় অভাব প্রতীয়মান হচ্ছে। এই মা সারদা দেবীর আবির্ভাব বাঁকুড়ার জয়রামবাটিতে ১২৬০ বঙ্গাব্দের ৮ই পৌষ (২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৩)। পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাতা শ্যামাদেবী দীন-দরিদ্রের মতো মাকে মানুষ করেছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীঃ স্বামী যোগানন্দ লোকান্তরিত হলে স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সেবাধিকার পান। তাঁর সেবায় তুষ্ট হয়ে মা-সারদা একদিন বলেছিলেন, "শরৎ যে কয়দিন আছে, সে কয়দিন আমার ওখানে (কলকাতায়) থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কাউকে দেখি না। .... শরৎ সর্বপ্রকারে পারে শরৎ হচ্ছে আমার ভারী।" শেষপর্যন্ত স্বামী সারদানন্দই মায়ের সেবক ও দ্বাররক্ষক হয়ে গেলেন। পরের দিকে মায়ের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকতো। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ। মা জয়রামবাটিতে আছেন। জ্বরে আক্রান্ত হলেন। শরৎ মহারাজ এ সংবাদ অবগত হয়ে মাকে চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আনলেন। যা হোক, শেষ রক্ষা হলো না।

৪ঠা শ্রাবণ, রাত দেড়টায় মা লোকান্তরিক হলেন (২৩শে জুলাই, ১৯২০)। মরবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সজ্ঞান উক্তি স্মর্তব্য ঃ "যদি শান্তি চাও, মা (জনৈকা ভক্তকে), কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ; কেউ পর নয়, মা , জগৎ তোমার।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কোমল স্বভাবের কথা অনেকেরই জানা। তবে একবারের এক ঘটনায় জানা যায় যে এই কুসুম-কোমল হৃদয়ও বজ্র কঠিন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের এক গৃহস্থ ভক্ত হরিশের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দেয়। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমা রয়েছেন। আচমকা হরিশ মাকে আক্রমণ করতে ছুটে আসে।

শ্রীশ্রীমা তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ধানমাঠের মরাইয়ের চারদিকে দৌড়াতে থাকেন। মরাইটি সাতবার পরিক্রমা করবার পর তিনি হঠাৎ করে পাগলা হরিশকে ধরে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর হাঁটু চেপে তাকে বেদম প্রহার করেছিলেন।

শ্রীশ্রী মায়ের কণিষ্ঠভ্রাতা অভয়চরণ অসময়ে অপরিণত বয়সে গত হন। মৃত্যুশয্যায় অভয়চরণ তার দিদিকে অনুরোধ জানায়, তার স্ত্রী ও ভাবী সন্তানের দেখভালের জন্যে। শ্রীশ্রীমা অবশ্যই অনুরোধে সম্মতি জানান। ভ্রাতৃবধূ সুরবালা গর্ভবতী অবস্থান পাগল হয়ে যান। এরপর তার এক কন্যাসন্তান জাত হয়। সেই নবজাত কন্যার নাম রাখা হয় রাধারাণী। ডাক নাম রাধু। এই মেয়েটির জন্যই শ্রীশ্রীমাকে দীর্ঘ কুড়ি বছর যাবৎ তার ও তার পাগলী মায়ের উৎকট পাগলামি ও অকথ্য অপমান, অত্যাচার, নির্যাতন অসীম ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হয়েছে। তিনিই এই রাধুর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯১৯ সালের মে মাসে রাধু একটা পুত্রসন্তান প্রসব করে। এসময় রাধুর শরীর এত খারাপ হয় যে শিশুটির জন্মের ছয়মাস পরেও রাধু উঠে দাঁড়াতে পর্যন্ত অসমর্থ ছিল। তার মধ্যেও তার মায়ের মত পাগলামি ভাব দেখা দেয়। আবার আফিং খাওয়ার বদ অভ্যাসেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শ্রীশ্রীমা এ বিষয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাকে সংশোধন করবার মানসে শ্রীশ্রীমা একটু কঠোরভাবে বলেন, "তোর সেবা যত্ন করা পক্ষে আর সম্ভব নয়। ..... তোর জন্য এত খরচই বা যোগাই কোথা তেকে, বলতো?" রাধুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল—সে একটা বড় বেগুন দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পিঠে সজোরে নিক্ষেপ করল। যন্ত্রণায় তিনি পিঠ বাঁকাতে লাগলেন। অথচ শ্রীশ্রীমায়ের কি অপার ক্ষমার ক্ষমতা। কি অদ্ভুত আচরণ। শ্রীশ্রী ঠাকুরের ছবির পানে করুণ চোখ রেখে করজোড়ে বললেন, "ঠাকুর, ও অবোধ, ওর দোষ নিও না।" পরক্ষণে সখেদে রাধুকে আদর করে বললেন, "রাধি, এ শরীরটায় আঘাত লাগে এমন একটি কথা পর্যন্ত ঠাকুর কখনও বলেননি; আর তুই কিনা তাকে এত কষ্ট দিলি? এ স্থান কত উঁচুতে তা তুই কি বুঝবি? তোদের সবার সঙ্গে রয়েছি বলে তোরা আমায় গ্রাহ্যই করিস না।" মাকে সাথে সাথে ক্ষমাশীল দেখেন ও তাঁর এই কথা শুনে বেচারি রাধু যেন স্বজ্ঞানে ফিরে এল, এবং সে হাউ হাউ করে কেদে উঠল।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ শিষ্যসন্তানেরাও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি সম্ভ্রম বিনয়াবনত ব্যবহার করতেন। তাই মনে হয় শ্রীশ্রীমা যেন বিশ্বজননীত্বের নিদর্শনস্বরূপ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ মা সারদার কাছে খাবার সময় কাঁপতে থাকতেন। মাতৃদর্শনের কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে তাঁকে ঘর্মাক্ত দেখাতো। স্বামী প্রেমানন্দও মায়ের কাছে এলে বালকের মতো হয়ে পড়তেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকায় যে বিশ্বধর্ম মহাসম্মিলন হয়, সেখানে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবা হয়। কিন্তু স্বামীজি তখন বলেন, শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পেলে তবেই তিনি সম্মতি দেবেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সম্মতির জন্য পত্র লিখলেন এবং শ্রীশ্রীমাও তাঁকে সম্মতিসূচক আশীর্বাণী পাঠান। স্বামীজিও এবার পাশ্চাত্যে দিব্যবাণী

প্রচারে অবতীর্ণ হতে সমর্থ হলেন। ১৮৯৭ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্বামীজি শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি নিতে কলকাতা চলেছেন। তিনি মাতৃসমীপে যাবার প্রাক্কালে অতিশয় আশঙ্কিত হয়ে পড়লেন এই ভেবে যে বিদেশে থাকাকালীন তাঁর অজান্তে যদি কোন অপবিত্রতা তাঁর অপাপবিদ্ধ হৃদয় স্পর্শ করে থাকে৷ এই ভয়ে আশঙ্কিত পাপ (?) শোধনের জন্য গঙ্গাজল তুলে নিয়ে পান করতে থাকেন।

একবার এক সংসারী মহিলাভক্ত সন্তানের প্রতি মায়ের আচরণ কেমন হওয়া উচিত শ্রীশ্রীমায়ের কাছে জানতে চাইলে তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন, "সে কি গো, তোমরা মা হয়েছ, আর কিভাবে ছেলেমেয়েদের মনের খবর জানবে তা তোমাদের বলে দিতে হবে? শোন, ওদের সাথে খুব সহজ সরলভাবে মিশতে হয়। গল্প করতে হয়। ওদের বয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে দিতে হয়। ওদের বেশি বকা-ঝকা করতে নেই, মারতে নেই। ওদের বেশি বকা-ঝকা করলে, মারধোর করলে ওরা ভয়ে জবুথবু হয়ে যাবে, দূরে সরে যাবে। ওদের ভালবেসে বুঝিয়ে দিলে ওরা সহজে বুঝবে। ওদের প্রশ্নকে ধমক দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দিতে নেই। ধমক দিলে বা ভয় দেখালে ওরা কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবে। ওদের মনের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পাবে।"

শ্রীশ্রীমা একদিন দুঃখ করে বললেন, "এই সংসারে এতই পাপ জমে রয়েছে যে, তা মুক্ত করতে গিয়ে আমার সমস্ত দেহটাই যেন জ্বলে পুড়ে গেল।" যোগীনের মা ও গোপালের মা কথাটা শুনেই ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন,"—তা তুমি কেন মা, এই সব পাপীদের পাপগুলিকে নিজে নিয়ে, তাদেয় দীক্ষা দিতে যাচ্ছ? ঠাকুর যাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তাদের জন্য তোমার এত দরদ কেন মা?"

উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেন, "জান ত, বাপ ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করতে পারেন, ছেলের মুখ না দেখতে পারেন, কিম্বা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু যিনি সত্যিকারের মা, জন্মজন্মান্তরের মা,—তিনি ছেলেকে পাপী জেনেও তাড়িয়ে দিতে পারেন না। ছেলে যতই পাপ করুক, আর যতই পুণ্য অর্জন করুক না কেন,—মার কাছে সবই সমান।

যোগীনের মা ও গোপালের মা এ কথায় প্রতিবাদ করে বলে উঠলেন, "সে কি রকম কথা হল মা? ....দশমাস দশদিন গর্ভে ধরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেও ছেলের পাপকে কি মাকে নিতে হবে?" 'তা নিতে হয় বৈ কি!'— বলে শ্রীশ্রীমা বলে চললেন, "ছেলের সকল অপরাধ মা যদি ক্ষমা করতে না পারে, এবং ছেলেকে তার পাপাচারের হাত থেকে বাঁচাতে না পারে, কিংবা তাকে সৎ পথে চালিত করতে না পারে, তবে সে কিসের মা!" এরপর তিনি তাদের আরও নানা রকমভাবে বুঝিয়ে এইভাবে উপদেশ ও আশ্বাসবাণী দিলেন—অন্যায়কারী পাপাচারী ছেলেকে ক্ষমা কর। ক্ষমা করে দিয়ে তাকে মায়ের ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে অভিষিক্ত কর, তাহলে দেখতে পাবে, তোমার সেই অন্যায়কারী পাপাচারী ছেলে তার এই কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আকুলভাবে কাঁদছে, আর তার সেই চোখের জলে অন্যায় পাপগুলি মুছে গিয়ে, নির্মল হয়ে উঠেছে

তার মন আর চরিত্র।

এরপর বর্ষীয়সী মহলিা ভক্তেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হন আর আশীর্বাদ চান এই বলে, 'মাগো, যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে তোমার শ্রীচরণ দর্শন করতে পারি।"

শ্রীশ্রীমায়ের কালে জয়রামবাটির ব্রাহ্মণবাড়ির ছাঁচতলায় ঢোকার অধিকার নীচু জাতির লোকেদের ছিল না। দুলে, বাগদি, বারুই, ডোমেদের ছোঁয়া থেকে ব্রাহ্মণেরা শত হাত দূরে থাকতেন। কিন্তু শ্রীশ্রীমা ছিলেন স্বতন্ত্র। অসাধারণ। তিনি তাদেরকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তাদেরকে নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ার্তেন। এমন কি এদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করতেন। কলকাতা থেকে ভক্তরা হঠাৎ অধিক রাতে এসে উপস্থিত হলেও তিনি সেই গভীর রাতে দু/একজন কাজের মেয়েকে সঙ্গী করে জলদি বা অন্য কোথাও জিনিসপত্র, সব্‌জি কিনতে যেতেন। আবার ভক্তদের ঘুম ভাঙ্গার আগেই পায়ে হেঁটে ফিরে এসে তাদের খাবার আয়োজন করতেন।

রাখাল দীনু সকালে গরু চরাতে যেতো মাঠে। দুপুর এটা নাগাদ ফিরতো। দীণু বাড়ি ফিরলে তবে শ্রীশ্রীমা খেতেন। একদিন সে কোন কারণে বিকেল তিনটেয়. ফেরে। সকলের পীড়াপীড়ি ও অনুরোধে সবে তিনি খেতে বসেছেন, ঠিক সেই সময় দীনু এলে তিনি বললেন, "কি রে বাবা! এত দেরি করলি! দেখ্ না, ওরা জোর করে আমায় খেতে বসাল। আমি তোর খাবার বেড়ে রেখেছি। তুই চান করে ঢাকা তুলে খাবার নিয়ে নে।" দুজনেই এরপর পাশাপাশি খাচ্ছে। শ্রীশ্রীমা বললেন, "বাবা দীনু, আর দুটো নিবি?' দীনু চুপ করে থাকে। পাশে কাউকে না দেখে তিনি তার থালা থেকে কিছু ভাত দীনুকে তুলে দিলেন। দীনু মায়ের মহাপ্রসাদ খেয়ে ধন্য হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের গয়লা বৌদের সাথেও খুব প্রীতির ভাব ছিল।

ধান চাষের সময় বা ধান কাটার সময় পশ্চিম থেকে মেয়ে-মদ্দরা এসে শ্রমিকের কাজ করত। গ্রামের বাইরে চালা বেঁধে তারা থাকত। দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যে বেলায় সেই সব কুলি-মজুরেরা এসে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দেখা করতে আসতো। গাঁ ছেড়ে যাবার সময় অবশ্যই দেখা করে যেতো। তাদেরকে গুড়-মুড়ি খেতে দিতেন। এমন কি পুরনো জামা-কাপড়ও দিয়ে দিতেন। এ ভালবাসা ও সদয় ব্যবহার শুধু মানুষের প্রতি নয়—টিয়া পাখি, বিড়াল, গরু প্রভৃতি জীবজন্তুদের জন্যও তাঁর অকৃপণ স্নেহ-মমতা ছিল।

শ্রীশ্রীমা যাত্রাপালা, রামায়ণ গান, বাউল গান, তরজা প্রভৃতি শুনতে খুব ভালবাসতেন। একটা জলের ঘটি ও পানের ডিবা নিয়ে যাত্রার আসরে বসতেন। প্রায় সারারাত জেগে যাত্রা দেখেও অন্যদিনের মত ভোরে উঠে পুজো দিতেন ও সংসারের নিত্যকর্ম সারতেন।

সুরেশচন্দ্র চৌধুরি ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশের) কোটালী পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। স্বদেশি করতেন। কারাগারে বসে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের কথা ভাবতেন। দেড় বছর জেল খাটার পর ১৯১৫ সালের মে মাসে মুক্তি পান। শ্রীশ্রীমায়ের সন্ধানে বাগবাজার, শ্যামবাজার, কামারপুকুর কোথাও না পেয়ে শেষমেষ জয়রামবাটিতে আসেন। সেখানে পৌঁছালে, সকলে যখন জানলেন যে তিনি একজন 'সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত জেল ফেরত আসামী', তখন সকলে পুলিশের হাঙ্গামা হবে ভেবে তাঁকে সেই স্থান ত্যাগ করতে বললেন। এমন সময় একটা ছেলে এসে বললে, "কলকাতা থেকে যে ছেলেটি এক্ষুনি এসেছে, মা তাকে ভিতরে ডাকছেন।"

সুরেশবাবু বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখেন শ্রীশ্রীমা বারান্দায় বসে। শ্রীশ্রীমা বললেন, "যাও বাবা, হাতমুখ ধুয়ে নাও। তারপর মুখে কিছু দাও।" সুরেশবাবু বললেন, "কামারপুকুরে শিবু দাদার বাড়িতে ডালভাত খেয়েছি।" শ্রীশ্রীমা তখন বললেন, "শিবুর ওখানে ভাত খেয়েছ। এখন এই খাও বাবা, রাত্রে ভাল করে খাওয়াব।" খাওয়ার পর মা বললেন, "রাত্তিরটা কাছেই কষ্ট করে কাটাও। কাল সকালেই স্নান করে তৈরি হয়ে থেকো। আমি ডেকে নেব। ....." পরপ্রাতে মা তাকে মহামন্ত্র দান করলেন। কিভাবে জপ করতে হয় দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন বারান্দায় কিছুক্ষণ জপ কর।" কিছুক্ষণ পরে বললেন, "তোমার খাবার তৈরি আছে। তুমি বাবা খেয়েই এখনি এখান থেকে রওনা হয়ে যাও। এখানে পুলিশের খুব উৎপাত। ওরা প্রায় রোজ এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায়। নতুন কোন ছেলে এনে তাকে জেরা করে, কখনো কখনো থানাতে নিয়ে যায়। তোমাকে দেখলে ওরা থানায় ধরে নিয়ে যেতে পারে।" এরপর শ্রীশ্রীমা নিজে বসে থেকে খাওয়ালেন। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। চলে যাবার সময় পিছন ফিরে দেখেন শ্রীশ্রীমা সাশ্রু নেত্রে যতদূর দেখা যায় দেখছেন।

দীনেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঢাকা জেলার (অধুনা বাংলাদেশের) বিক্রমপুরের বাসিন্দা। ১৯০৫ সালে রাজবালা দেবীর সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর আট বছর অতিক্রান্ত হলেও তাদের গৃহে কোন সন্তান আসে না। রাজবালা দেবী স্বপ্নাদিষ্ট হন যে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিলে তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। যেহেতু শ্বশুরবাড়িতে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার রীতি, তাই রাজবালা দেবীর শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে দীক্ষা নেবার ব্যাপারে বাধা আসে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে দীনেশবাবু কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে নিয়ে যান। তাঁর কাছে রাজাবালা দেবী তার মনোবেদনার কথা ও দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা অকপটে প্রকাশ করলেন। শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসায় জানলেন যে তারা স্বামী-স্ত্রীতে তাদের কুলগুরুর কাছে তখনও দীক্ষা নেননি। তখন বললেন তা হলে তো কোন অসুবিধেই নেই। তাকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলেন। বললেন তার অবশ্যই ছেলেমেয়ে হবে। ১৯১৩ সালের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মতো দু'জনকেই গঙ্গা স্নানের পর দীক্ষা দিলেন। ১৯১৫ সালের জুন মাসের শেষ দিকে তারা পুত্রসন্তান

লাভ করলেন। ছেলের বয়স যখন চার কি পাঁচ বছর, তখন তার কলেরা হয়। সাথে দীনেশবাবুর দু'ভ্রাতুষ্পুত্রও কলেরায় আক্রান্ত হয়। দীনেশবাবুর পুত্র সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের উপর মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে আসে। পরবর্তীতে রাজাবালাদেবীর আরও দুটি ছেলে ও তিনটি মেয়ের জন্ম হয়। শ্রীশ্রীমায়ের আশিসে তাদের শুধু সন্তান-বাসনাই যে পূর্ণ হয় তা নয়—তাদের জীবনে সব দিক থেকেই পূর্ণতা আসে। ১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা থেকে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী সম্পর্কে কোন এক গুরুভ্রাতাকে লেখেন, "মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারেনি; এখনও কেহই পারে নাই; ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা ঠাকরুণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন। তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।" সারদা দেবীর জীবনে যে সব আধ্যাত্মিক ভাবধারা মূর্ত হয়ে উঠেছে, যথাকালে ভারতীয় নারীজাতির জীবনেও উহারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল করে তুলবে, তার চিত্র স্বামীজির এই প্রাণস্পর্শী ভবিষ্যৎবাণীতে ফুটে উঠেছে। ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামাসুন্দরী দেবীর ঘর আলো করে সারদার আবির্ভাব। আর ৬৭ বছর বয়সে ১৯২০ সালের ২০ জুলাই রাত দেড়টায় সময় শ্রীশ্রীমা স্থূল দেহ ত্যাগ করে অবিনাশী চিন্ময় দেহ ধারণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সারদা বয়স্কদের মতো দেবীমূর্তি পুজো-অর্চনা করতে পছন্দ করতেন। খেলাঘরে খেলতে খেলতে তিনি আত্মস্থ হয়ে যেতেন। বালিকা সারদা রান্না করেছেন। আকণ্ঠ জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছেন। ঘাস কাটতে কাটতে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরই মত একটি মেয়ে তাঁর কাজে সাহায্য করছে। একাকী পুকুরে স্নানে যেতে দ্বিধান্বিত হলে, দেখতেন তাঁর সমবয়সী আটটি বালিকা তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্তদের খিচুড়ি বিলি করেছেন অপার আদরে ও আনন্দে।

বিবাহের এক বছর পর সারদার বয়স তখন সাত। গদাধর জয়রামবাটিতে শ্বশুরবাড়ি এলে সারদা জল এনে স্বামীর পা ধুয়ে দিয়েছেন। পাখার বাতাস করেছেন।

১৮৭২ সালের মার্চ মাস। গঙ্গাস্নান মানসে সারদা যাত্রীদের সাথে পদব্রজে কলকাতায় চলেছেন। ২/৩দিন পর পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। এক সরাইখানায় পিতার সাথে উঠেছেন। শুয়ে শুয়ে সারদা দেখলেন তাঁর পাশে একটা কালো কুচকুচে মেয়ে মাথায় হাত বোলাচ্ছে। শরীরে রোগমুক্তির আঁচ পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে এলে মা?"

উ ঃ 'দক্ষিণেশ্বর থেকে।'

সারদা ঃ স্বামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমি সেখানে যাচ্ছিলাম, কিন্তু জ্বরের জন্য তা বুঝি আর হলো না।

উ ঃ সেরে উঠে স্বামীর কাছে যাবে বৈকি! তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আগলে রেখেছি।

সারদা ঃ কিন্তু তুমি আমাদের কে হও গো?

উ ঃ আমি তোমার বোন হই।

এরপর শান্তিতে তৃপ্তিতে সারদা চোখ বুঝে ভাবতে লাগলেন ইনি কি তবে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী!

সারদার মনে সন্দেহের দোলা। চার বছর অতিবাহিত হয়েছে স্বামী তো সারদার সন্ধান করেননি। তবে কি তাঁর সারদা-বিস্মৃতি ঘটেছে। দুর্ভাবনার অন্ধকারে চকিতে সম্ভাবনায় আলোকের ঝলকানি। রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসিলেন, "এত দেরি করে এলে? এখন কি আর আমার মথুরবাবু আছে যে ভক্তিভরে তোমায় আদর-যত্ন করবে?" সারদা রামকৃষ্ণের স্নেহজড়ানো অভিব্যক্তিতে অভিভূত হলেন।

একবার রামকৃষ্ণ তাঁর উনিশবর্ষীয়া স্ত্রীকে শুধালেন, "তুমি কি আমাকে সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?" সারদার তাৎক্ষণিক উত্তর, "না, আমি তোমাকে টেনে নামাতে আসিনি, আমি তোমার ইষ্ট পথে সাহায্য করতে এসেছি, তোমার সেবা করতে এসেছি।" পরে একদিন রামকৃষ্ণ তাঁর জনৈক ভক্তকে বলেন, "ও যদি অন্য প্রকৃতির হতো এবং আত্মবিস্মৃত হয়ে আমাকে আক্রমণ করতো, তা হলে আমি ভেসে যেতাম কিনা, কে জানে?"

রামকৃষ্ণের সন্ন্যাস গুরু তোতাপুরী বলেছিলেন, "তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে দেশের বাড়িতে রেখে এখানে বনবাসে থেকে কামজয়ের কথা বলা সোজা। স্ত্রীকে কাছে রেখে বলতে পারো তবে বুঝি।" এবার সে পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। একদিন সারদা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। রামকৃষ্ণ পাশে শুয়ে নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করছেন, "মন, এরই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে—এবং ভোগ করার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত। কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দ-ঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। .... সত্য বল, একে গ্রহণ করতে চাও—না ভগবানকে চাও? যদি স্ত্রী-শরীর গ্রহণ করতে চাও তো এই তোমার সামনে রয়েছে, গ্রহণ কর।" এই আত্ম জিজ্ঞাসার পর স্ত্রীর দিকে হাত বাড়াতেই, তাঁর মন সমাধিপথে একাকার হয়ে যায়। তাইতো বলা হয়ে থাকে সারদাদেবী যদি শুচি-শুভ্র পবিত্র না হতেন তাহলে কি রামকৃষ্ণ—'রামকৃষ্ণ পরমহংস' হতে পারতেন! সারদাদেবী, যিনি সার দান করেন—যিনি 'বিশ্বমাতৃত্ব বিকাশের জন্য জগতে এসেছিলেন তাঁকে পাই আদর্শস্থানীয়া পত্নীরূপে, রামকৃষ্ণকে আদর্শস্বামী রূপে। একথা বোধকরি জোরের সাথেই বলা যায়—সারদার সহজাত দেবত্ব রামকৃষ্ণের সাথে মিলনের উপযুক্ত সেতুর কাজ করেছিল। পূর্ণযৌবনা সারদা রামকৃষ্ণের সাথে আট মাস কাল সহবাস করেছেন। সারদাও সে সময় প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর স্বামীর ভাব ও দর্শনজনিত পবিত্র মন নিরন্তর অধ্যাত্মরাজ্যে বিরাজ করতে ও সমাধিস্থ হতে। এ অবস্থা প্রথম দিন দেখে

সারদা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ভাগ্নে হৃদয়কে ডাকতে থাকেন। সে এসে রামকৃষ্ণের কানে মন্ত্রোচ্চারণ করে সম্বিৎ ফিরিয়ে আনে। তা দেখে সারদা যেমন বিস্মিত, তেমনি আনন্দে আত্মহারা।

অন্য একদিন সারদা স্বামীরপা টিপে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমাকে কিভাবে দেখ? রামকৃষ্ণ মুহূর্তেই উত্তর দেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই জননীরূপে এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও ইদানিং নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ী বলিয়া তোমাকে সর্বদাই দেখিয়া থাকি।" ভাগ্নে হৃদয় সারদাকে কটাক্ষ করে বলেন, "তুমি মামাকে বাবা বলিয়া ডাক না কেন?" সারদার উত্তর ঃ "শুধু বাবা বলছ কেন? তিনি আমার বাপ, মা, বন্ধু, আত্মীয়, সবই—তিনি আমার জীবন সর্বস্ব।" রামকৃষ্ণই তো এক অমাবস্যার রাতে সারদাতে বেদিতে বসিয়ে তন্ত্রোক্ত ষোড়শী পুজোয় বিধিমতে পুজো করেছিলেন। পুজোর শুরুতে সারদা বাহ্যজ্ঞান শূণ্য হলেন এবং পুজো অন্তে উভয়েই গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। প্রণামমন্ত্র জপে দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাণ করে রামকৃষ্ণ সেদিন পুজো সাঙ্গ করেছিলেন।

১৮৭৫ সালের কথা। দক্ষিণেশ্বরে সারদা অমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। চিকিৎসায় রোগ নিরাময় না হওয়ায় জয়রামবাটিতে ফিরে গেলেন। এবার কিন্তু রোগটি প্রবলভাবে আক্রমণ করল। উপায়ন্তর না দেখে দৈবের উপর নির্ভর করে গ্রাম্যদেবী সিংহবাহিনীর সামনে হত্যে দিয়ে অনাহারে পড়ে রইলেন। সারদা অবশেষে ঘরে ফিরে যেতে আদিষ্ট হলেন। দৈবনির্দেশিত ওষুধে অচিরেই সুস্থ হলেন।

রামকৃষ্ণের শরীর তুলোর মতো নরম—তাতে ভাবসমাধি তো লেগেই থাকতো। সেময় কোন সেবক কাছে না থাকলে খুব অসুবিধা হতো। ১৮৮১ সাল নাগাদ কোন অপরাধে হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে চলে যেতে হয়। রামকৃষ্ণ প্রায় একা আছেন, এ সংবাদ লোক মারফৎ পেয়ে সারদা স্বামী সেবায় তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন।

এবার সারদার জীবনের এক রোমাঞ্চকর ঘটনা—

প্রতিবেশিদের সাথে পদব্রজে দাক্ষিণেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে সঙ্গীদের সাথে তাল রেখে চলতে পারছেন না। সামনের প্রান্তরে এক নৃশংস ডাকাতের ডেরা। সন্ধ্যে হয় হয়। সঙ্গীদের ডাকাতদের কবলে পড়ার আশঙ্কার কথা ভেবে তাদের দ্রুতপথে চলে যেতে বললেন। আর সারদাদেবী নিজের বিপদকে অগ্রাহ্য করে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলেন। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এক বিরাটকার মানুষের আগমন অনুভব করে ডাকাত ভেবে মনকে দৃঢ় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ হুঙ্কার : "এ সময়ে এখানে কেন?" সারদার সানুনয় জবাব, "বাবা, সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, বোধ হয় রাস্তাও হারিয়েছি। তাদের কাছে আমায় পৌঁছে দেবে? তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছিলাম। আমায় নিয়ে যদি সেখান পর্যন্ত যাও—তিনি খুব বেশি হয়ে তোমাদের আদর-আপ্যায়ণ করবেন।"

পশ্চাতেই ডাকাত-গিন্নি ছিল। তাকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে বললেন, "মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা। দল থেকে ছিটকে পড়েছি। একা এই তেপান্তরের মাঠে রাত হয়ে যাওয়ায় খুব ভয় পেয়েছিলেন। ভাগ্যিস তুমি আর বাবা এসে পড়েছে, নইলে এ বিপদে কি যে হত মা, জানি না।" সারদা মায়ের কথায় ডাকাতদের কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হলো। তারা সারদাকে নিয়ে নিকটবর্তী গ্রামে গিয়ে উঠল। একটা দোকান ঘরে শোবার ব্যবস্থা করল। আর রাতের খাবার জন্য মুড়ি-মুড়কি যোগাড় করে আনল। পরদিন তারা সারদাকে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সম্মুখবর্তী হল। সারদা সেদিন ডাকাত হৃদয়েও মুহূর্তে আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটিয়ে ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ এই বিশ্বজননীর মধ্যে তাঁর মাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমাও সকলকে বলেছেন, "আমি সত্যিকারের মা; গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়, সত্যি জননী।" এই সত্যিকারের জননীটি যেন ত্রিলোক দুর্লভ স্বীয় স্নিগ্ধ মহিমা ও দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল একটি পবিত্র কুসুম। ইহার শুচিশুভ্র দিব্য সুষমা নন্দনের পারিজাতকেও নিঃসন্দেহে ম্লান করে। সর্বসাধারণ, বিশেষ করে নারী সমাজ যদি এই সত্যিকারের জননীর আদর্শে ও কর্মে উদ্দীপিত হতে পারে, তবে সমাজ তথা রাষ্ট্রের কল্যাণ। দেশের ঐক্যকে অটুট রাখতে গেলে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনধারাই আজকের চলার দিশা হতে পারে। এক অজ পাড়াগাঁয়ের শিক্ষাহীন অতি সাধারণ ব্রাহ্মণী সারদা মায়ের মধ্যে কর্মনিষ্ঠা, যুক্তিনিষ্ঠা, তীক্ষ্ম মননশীলতা, সর্বধর্মসমন্বয়সত্তা, অপার মাতৃত্ব, অবহেলিতের প্রতি তীব্র ভালবাসা, পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খলের বেড়ি মোচনে স্বাধীনতা-সংগ্রামী সন্তানদের উৎসাহ-প্রেরণা সঞ্চার প্রভৃতি শতরূপ গুণে গুণান্বিতা সত্যিকারের জননীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত "শতরূপে সারদা" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি টানব : "ভারতবর্ষে মাতৃ সাধনার ইতিহাস সুপ্রাচীন হলেও জাগতিক মাতার স্নেহমূর্তির সঙ্গে জগদীশ্বরীর মানস-কল্পনাকে মিলিয়ে নেওয়ার কোথায় ছিল একটু অস্বাচ্ছন্দ্য। অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্ত সাধকের গানে আদ্যাশক্তির সহজ বর্ণনা প্রকাশ পেলেও, দেবী কল্পনার দেবীই থেকে গিয়েছিলেন, হয়ে ওঠেননি মর্ত্যের ধূলিধুসরিতা জননী। ভারতবর্ষ তথা জগতের ইতিহাসে সেই অভাব প্রথম পূর্ণ হয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিনী সারদাদেবীর আবির্ভাবে।"

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

সন্তোষ কুমারী গুপ্তা, বনলতা দেবী ও লেডি শার্লোটি ক্যানিং

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

■ সন্তোষ কুমারী গুপ্তা

ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কে কর্ম প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকেই গড়ে উঠেছিল। কারণ কলকাতা তখন ভারতের রাজধানী। আর গঙ্গার দুপাশে অনেক কলকারখানাও গড়ে ওঠে। বড় বড় ব্যবসা ও কলকারখানার মালিক ছিলেন ঔপনিবেশের ইংরেজরা। আর কলকাতা বন্দর তখন খুবই কর্মব্যস্ত। শ্রমিকদের মজুরী অত্যন্ত কম। কলকাতা বন্দর দিয়ে চা, পাট, চামড়া এবং বিলিতি কাপড়ে মাড় দেবার জন্যে চাউল রপ্তানি হতো। সারা ভারতের প্রধান বন্দর হিসেবে তখন কলকাতার খ্যাতি ছিল তুঙ্গে।

বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা উদাসীন ছিলেন না। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন এবং শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের নিয়ে রীতিমত ভাবতেন। চা শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচারে এঁরা জীবন বিপন্ন করে তথ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাপিয়ে ছিলেন। নানারকম পুস্তিকা লিখে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনীতি ও ধর্ম নিয়ে যে রকম আন্দোলন হতে থাকে শ্রমিকদের সম্বন্ধে তখনো কোনো বড় আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে কলকারখানার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সৈনিকদের সরবরাহের জন্যে নানারকম ফ্যাক্টরি ও কাচশিল্প ও ঔষধের কারখানা গড়ে ওঠে। ১৮৭৫ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিশু শ্রমিকদের কল্যাণ ও ভারত সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মধ্যে শ্রমিক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃত আরম্ভকাল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ধরা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেশব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার আসে। ভারতব্যাপী ধর্মঘট ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের হিড়িক পড়ে যায় এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮-২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক বিক্ষোভের অনেকগুলি সঙ্গত কারণ ছিল। এই ক্ষুদ্র পরিসরে সে সবের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' গড়ে ওঠে। ভারত সরকারও এ আই টি ইউ সি-র সঙ্গে পরামর্শ করে জেনিভার 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অরগানাইজেশন-এ প্রতিনিধি পাঠাতে থাকেন।

অবিভক্ত বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল ছিল। কংগ্রেস কর্মী ও দেশকর্মী নামের আড়ালে অনেকে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই শ্রমিক নেতৃত্বে অনেক বাঙালি মহিলারাও যোগ দিয়েছিলেন।

এর মধ্যে বিখ্যাত শ্রমিকনেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্তার নাম সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আজকের অনেক মানুষ এই বিদুষী ও শ্রমিক দরদী নেত্রীর নাম জানেন না। আরো গর্ব ও আনন্দের বিষয় সন্তোষকুমারী গুপ্তার জন্ম হয় বারাকপুর মহকুমার নৈহাটিতে। তিনি পুরুষ সহকর্মীর সমকক্ষ হিসেবে ১৯২৭-১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক আন্দোলন (বিশেষ করে চটকল শ্রমিকদের মধ্যে) পরিচালনা করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছায়।

সন্তোষকুমারী গুপ্তা অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দিতে অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহেও যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলন যাতে জনসাধারণ জানতে পারেন সেজন্যে তিনি 'শ্রমিক' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কথিত আছে একজন জুট মিলের অত্যাচারী ইংরেজ ম্যানেজারকে তিনি বারাকপুর পুলিশ কোর্ট প্রাঙ্গণে নিজের হাতে চাবুক মেরে কারাবরণ করেছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে—পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে। মহাত্মা গান্ধী সহ তখনকার সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারা মঞ্চে উপবিষ্ট। সে সময় বাঙালি শ্রমিক নেতাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস মঞ্চ শ্রমিকরা দখল করেন। যাঁরা এই ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তাঁদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্তা অন্যতমা। তিনি বারাকপুর মহকুমা থেকে কয়েক লক্ষ শ্রমিক নিয়ে যান।

পরবর্তীকালে তিনি রাজনৈতিক ও শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে আসেন।

■ কবি বনলতা দেবী

সুকবি বনলতা দেবী স্বনামধন্য সমাজ সংস্কারক ও শ্রমিক দরদী নেতা কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মুষ্ঠিমেয় মহিলা সমাজ সংস্কার ও মহিলাদের উন্নয়নের জন্যে কাজ করে গিয়েছেন তিনি তাঁদের অন্যতমা। বনলতা দেবীর জন্ম ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর বারাকপুর মহকুমার বরাহনগরে। বনলতার স্বামী ছিলেন সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত ও 'জীবনীকোষ'-এর সম্পাদক শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার। পিতা শশিপদ বাড়িতে তাঁকে যত্ন করে ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত অধ্যয়নের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি 'সুমতি সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিতা শশিপদের 'বিধবা আশ্রম' ও 'বালিকা বিদ্যালয়'-এর

পরিচালনা করতেন।

বনলতা দেবী বিবাহের পরে স্বামীর সঙ্গে সমাজ সংস্কার, স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার, মহিলাদের মধ্য থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রভৃতি মহৎকর্মে ব্রতী হন।

অল্প বয়স থেকে বনলতা দেবী কবিতা লিখতে পারতেন। গদ্যে ও পদ্যে তাঁর সমান অধিকার ছিল। তিনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্তঃপুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 'অন্তঃপুর' পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা বনলতা নিজেই করতেন। মাসিক পত্রটিতে শুধু মহিলাদের রচনাই প্রকাশিত হত। বনলতার লেখা চার লাইন কবিতা প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। বনলতাদেবীর কবিতা গ্রন্থের নাম 'বনজ'। তিনি দীর্ঘ জীবন পাননি। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন।

■ লেডি শার্লোটি ক্যানিং

লর্ড ক্যানিং সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। পর বৎসর তিনি লর্ড সভার সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী জন ক্যানিং-এর পুত্র ছিলেন।

লর্ড ক্যানিংয়ের বিদুষী, শিক্ষিতা, সুন্দরী পত্নী লেডি শার্লোটি ক্যানিং (Lady Charlotte Canning) মহারানী ভিক্টোরিয়ার (Queen Victoria) বান্ধবী ও সখী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা ও উচ্চ অভিজাত ঘরের মেয়ে ছিলেন তিনি আবার মহারানীর Bed-in-Chamber ছিলেন। তাঁকে বেশিরভাগ সময় মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হতো। তিনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার Lady-in-Waiting পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারফলে বিবাহ পরবর্তী জীবনেও লেডি শার্লোটি ক্যানিং-কে মহারানীর সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের রাজভবন-এ বাস করতে হতো।

অনেকে বলেন — লর্ড ক্যানিং ভারতের বড়লাট হয়েছিলেন লেডি ক্যানিং-এর দৌলতে। সিপাহী যুদ্ধের কালে কলকাতা হলো ভারতের রাজধানী। কলকাতার বড়লাট ভবন ছাড়া বারাকপুরে ছিল বড়লাটের পল্লীভবন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাপ্তাহান্তিক (weekend) ছুটিতে বারাকপুরের রাজভবনে আসতেন।

লেডি ক্যানিং প্রায়ই বারাকপুরের লাটভবনে আসতেন। তিনি বারাকপুরের শান্ত নদীতীরে ও ভূ-প্রকৃতিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে লেডি ক্যানিং লাটবাগানকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন — নানারকম বৃক্ষ ও লতাপাতা ও নানাবর্ণের ঝোপঝাড় দিয়ে। মাঝে মাঝে 'সারপেনটাইন লেক (Serpentine Lake)

কাটিয়েছিলেন বাগানটিকে সুন্দর করে তুলবার জন্য। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের মেয়ে — প্রকৃতির সৌন্দর্য ও গাছপালা ভালবাসতেন। বারাকপুরের Government House বা রাজভবনটিও খুব সুন্দর করে সাজান।

সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি অনেক সময় একাকী বারাকপুরে থাকতেন। লর্ড ক্যানিং সিপাহী যুদ্ধ দমনের জন্য অনেক সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাটাতেন। যে সময় লেডি শার্লোটি ক্যানিং বারাকপুরের অনেক আশপাশের ছবি এঁকেছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্রিটিশ মহিলা চিত্রকর।

ছবি আঁকা ছাড়াও সদ্য আবিষ্কৃত ক্যামেরায় ছবি তোলা তিনি ইংল্যান্ড থেকে শিখে এসেছিলেন। তিনি বারাকপুরের রাজভবন বা পল্লীভবনে থাকাকালীন অনেক ছবি নতুন আবিষ্কৃত ক্যামেরায় তুলেছিলেন। লেডি ক্যানিং প্লেট-এ ছবি তুলে সে ছবি সেকালের পদ্ধতিতে wash ইত্যাদি করে বিলেতে মহারানী ভিক্টোরিয়া ও তাঁর আত্মীয়দের কাছে পাঠাতেন। এখনও লেডি ক্যানিং-এর তোলা ছবি ইংল্যান্ডে আছে।

শুনলে অনেকেই মজা বোধ করবেন — বালক রাজপুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (পরবর্তীকালে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড)-এর কৌতূহল মেটানোর জন্য তিনি নানারকম প্রজাপতি ও কীটপতঙ্গের ছবি এঁকে ও তাদের মৃতাবস্থায় সংগ্রহ করে মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত মহারানীকে পত্র লিখতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় দু'জনেরই ঘনিষ্ঠ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে আহত সৈন্য সেবা করবার জন্য ভারতে নিয়ে আসার কথা করেছিলেন।

এই অসামান্যা মহিলা সিকিম-হিমালয়ের ছবি আঁকতে গিয়ে 'পূর্ণিয়া ফিভার' বা 'ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার' (Black Water Fever) নিয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসকদের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরু স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন। কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁকে চির বিশ্রাম নিতে হয়। কলকাতার বড়লাট ভবনে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রচণ্ড ঝড়ের দিন তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন সকালে কলকাতার বর্তমান রাজভবন থেকে তাঁকে বারাকপুর রাজভবনে সমাহিত করা হয়।

ভারতবাসী — বিশেষ করে বাঙালিরা তাঁকে আদরের ও ভালোবাসার পাত্রী বলে মনে করে তাঁদের এক প্রিয় মিষ্ট নাম দিয়েছিলেন 'লেডি কেনী'। 'লেডি কেনী' এখনও মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায়।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

এমলি ইডেন

(সংগৃহীত)

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ ইডেনের সঙ্গে কুমারী এমিলি ইডেন ভারতবর্ষে আসেন। জর্জ ইডেন লর্ড অকল্যান্ড নামেই সমধিক পরিচিত এবং ১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন। লর্ড অকল্যান্ড চিরকুমার ছিলেন বলিয়া কুমারী ইডেন বড়লাটের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করিতেন, কলিকাতা গভর্নমেন্ট হাউসে কুমারী ইডেনই ছিলেন "ফার্স্ট লেডি"। কিন্তু বড়লাট সহদোরা হইলেও লেডি ইডেন প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মরমী চিত্রশিল্পী এবং উচ্ছল জীবনরসিক। বারাকপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লেডি ইডেন প্রতিষ্ঠা করেন এবং খুব সম্ভবত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধানও ছিলেন তিনিই। তাঁহারই স্নেহে এবং আগ্রহে আদিযুগের কৃতী ছাত্ররা জীবনে সাফল্য লাভ করেন। তিনি ছয় বৎসর এদেশে ছিলেন। এবং ব্যারাকপুর হইতে সিমলা এবং সিমলা হইতে লাহোর ভ্রমণ করিয়া এদেশের রঙে রসে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য জমকালো পোষাক পরিহিত রাজপুত্র হইতে শুরু করিয়া সাধু সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী, ডাকাত, পথচারী, এমনকি রজক খানসামা খিদমতগার প্রভৃতির চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কন করিয়াছেন। সেই সমস্ত ছবি এবং সংশ্লিষ্ট পত্রাবলী 'আপ দি কান্ট্রি' নামে অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস ১৯১২ সালে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী চিত্রজগতের এক অমূল্য সম্পদ এবং ১৯ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার প্রামাণ্য দলিল। 'আপ দি কান্ট্রি' ছাড়াও শ্রীমতী ইডেন Portraits of the people and Princes India (1844) letters from India '2 Volumes 1872) দুইখানি উপন্যাস 'The semi-detached house (1859) এর the attached couples (1860) লন্ডনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং সুধী সমাজে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

স্নেহময়ী লেডী ইডেন বিলাতে গিয়াও তাহার ব্যারাকপুরের ছাত্রদের ভুলিতে পারেন নাই। 'মাই ডিয়ার লিট্‌ল ব্যারাকপুরিয়ান' এই স্নেহের সম্বোধনে ছাত্রদের পত্র লিখিয়াছেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে লেডি ইডেন লোকান্তরিত হন। তাহার অকৃত্রিম স্নেহ এবং স্বার্থগন্ধশূন্য মানবসেবার কথা স্মরণ করিয়া আজ শতবর্ষ পরেও আমরা এই মহিয়সী মহিলার পূণ্য স্মৃতির প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

(সৌজন্য : ব্যারাকপুরিয়ান ১৩৮৭, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রীয় উচ্চবিদ্যালয় পত্রিকা।) সংগ্রাহক : সম্পাদক নগর পেরিয়ে।

বারাকপুর মহকুমার পাঠাগার (প্রথম পর্যায়)

——————————————স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরীর মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে।"

বারাকপুর মহকুমা শিক্ষার দিক থেকে একটি অগ্রসর জনপদ। স্বভাবতই এই মহকুমায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য গ্রন্থাগার—এদের মধ্যে বেশকিছু প্রাচীনত্বের দাবিদার।

■ রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, উত্তর ২৪পরগণা জেলা গ্রন্থাগার

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমে একটি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমতিক্রমে গত ১৯৫৬ সালের ৪ জানুয়ারি এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শক নিখিলরঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে। প্রাথমিকভাবে এই আশ্রমেই পরিচালন সমিতি সবরকম সুযোগ সুবিধাযুক্ত একটি বাড়িতে এই গ্রন্থাগারের কাজকর্ম শুরু করেন। একই সঙ্গে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনটিতে স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের (মিশনের সাধারণ সম্পাদক) তত্ত্বাবধানে ও সরকারের বদান্যতায় গড়ে ওঠে। কিন্তু নানা কারণে এই কাজের গতি বিঘ্নিত হতে থাকে। এবং বাড়িটি একটি কেয়ার টেকারের ঘর সহ গড়ে তুলতে বছর গড়িয়ে যায়। এই ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯৫৭ সালের ২৭ জানুয়ারি আচার্য যদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সচিব ড. ডি এম সেন ছাড়াও বহু বিশিষ্ট জনের উপস্থিতি এবং তাঁদের মূল্যবান মতামত অত্যন্ত গুরুত্ব সরকারে শ্রুত হয়। এই ভবনটি পাঠকদের জন্য ১৭০০ বর্গ ফুট এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এবং এখানে১৬০০০ বই রাখার সুবন্দোবস্ত আছে। এছাড়া মহিলা ও শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক পড়ার ঘরের ব্যবস্থাও বিদ্যমান।

এই গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে এর জনপ্রিয়তা। এখানে মোট বই এর সংখ্যা ৪০,১০৩। এর মধ্যে ১৯০১৪টি বই গৃহপাঠ্য। এই পরিসংখ্যানে সংবাদপত্র, সাময়িকী ধরা হয়নি। সেগুলি পড়ার

ঘরেই রাখা থাকে। গ্রন্থাগার সুচারুরূপে পরিচালনা, বইগুলির সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বেশ কিছু সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। ৫২১৬টি ভল্যুম এর অসম্পূর্ণ সংগ্রহ একটি জলন্ত সমস্যা। ১৫৬৭টি ভল্যুম ভ্রাম্যমাণ বিভাগের জন্য আলাদা রাখা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের স্বল্প আয়ে পাঠকের চাহিদা পূরণ করা এক কথায় অসম্ভব। স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দু কি.মি এলাকা নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর সেবায় এটি নিয়োজিত। সরকারি হিসাবে উঃ ২৪ পরগনা জেলার প্রতি দশ হাজারে ২৭৩০ জন শিক্ষিত। এলাকায় শিক্ষিত মানুষের বাস প্রায় ১৪০০০। সাধারণভাবে শতকরা ১৫ জন মানুষ এই লাইব্রেরী ব্যবহার করেন এবং একজন পাঠককে চারখানা বই দেওয়া হয়—তাহলে মোট বই এর প্রয়োজন হবে দশ হাজারের মত। বর্তমানের পাঁচহাজার বই ছাড়াও যদিও মনে রাখা দরকার যে শুধুমাত্র পাঠককে বই পড়ানই গ্রন্থাগারের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় এটি তাঁদের বিকাশেরও সহায়ক। কিন্তু বই যদি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয় তাহলে পাঠকের এই বিপুল চাহিদা পূরণ এক কথায় অসম্ভব সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই লাইব্রেরীর ভ্রাম্যমান বিভাগ (মোবাইল সেকসন) টি চালু হয় ১৯৫৬ সালের ২ অক্টোবর। এর শুভ সূচনা করেন মন্মথনাথ রায় ডেপুটি চিফ ইন্সপেক্টর অব্ সোসাল এডুকেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই বিভাগের কাজের পরিধি বারাকপুর, বারাসাত, বনগাঁ এবং বসিরহাট মহকুমা। প্রায় ১৬৪০.৪ বর্গ মাইল এলাকায়। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এখানের লোকসংখ্যা ২১,৯৪,২৪১ জন এবং ইতোমধ্যে সেটি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ৪৩টি কেন্দ্র থেকে ৭৭১৩টি বই ২২৬০২ জন পাঠককে বিতরণ করা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কর্মীর অভাবে এবং পর্যাপ্ত বই-এর অভাবে এই কাজের পরিধি বাড়ানো কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। যদিও এই বিভাগটি পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নতুন গ্রন্থাগারটির বিদ্যুতের বিল, গাড়ির পেট্রোল ইত্যাদির ব্যয় মেটাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। ফলে কাটা ছেঁড়া বইগুলি নতুন করে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই যাচ্ছে। সরকারের কাছে অর্থনৈতিক সংকটের কথা জানিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই বেশির ভাগ খরচ 'কন্টিজেন্সি হেডে', যেগুলোকে কোনমতেই এড়ানো সম্ভব নয়, গ্রন্থাগার সুষ্ঠভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে। ১৯৫৭-৫৮ সালের বই এর অনুদান (গ্রান্ট) থেকেই এ জাতীয় খরচ করতে হয়েছে। অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মও ছাঁটাই করতে হয়েছে। এমনকি নতুন সভ্য সংগ্রহ (ব্যক্তিগত/

প্রতিষ্ঠানগত) ও বন্ধ রাখা হয়েছে। পুরনো দিনের এই সব কথাগুলি জানা গেল বর্তমান গ্রন্থাগারিক সমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে।

বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটি রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম রহড়া পরিচালন সমিতি পরিচালনা করেন। এবং প্রতিদিনের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে একটি উপসমিতিও আছে। গ্রন্থাগারটি খোলা রাখার সময় দুপুর ১২টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত। ইংরেজি মাসের প্রতি রবিবার এবং ২য় ও ৪র্থ শনিবার গ্রন্থাগারের সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসবাসকারী এই গ্রন্থাগারের রাখা গ্রন্থাদি সংগ্রহণ করতে পারেন। এজন্য তাঁকে দু টাকা মূল্যের নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করতে হয়। বার্ষিক চাঁদা প্রাপ্তবয়স্কদের (১৬ বছরের উর্ধে) ১৫ টাকা একটি বই-এর জন্য কিংবা ২০ টাকা দুটি বই-এর জন্য। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের (১৬ বছর/দশম শ্রেণী পর্যন্ত) জন্য একটি বই এর ১০ টাকা দেয়। জামিনস্বরূপ একটি বই এর জন্য সদস্যকে ১০০ টাকা দুটি বই এর জন্য ১৫০ টাকা জমা দিতে হয়। যদি বই এর মূল্য ১০০ টাকা, বা ১৫০ টাকার বেশি হয় তবে জামিনের অতিরিক্ত অর্থ সাময়িক জামিন বাবদ দিতে হয়। ছোটদের জন্য বরাদ্দ কমপক্ষে ৬০ টাকা। বই এর দাম ৬০ টাকার বেশি হলে অতিরিক্ত মূল্য জামিন স্বরূপ দিতে হয়। সংগ্রাহক পত্র ১২ মাসের জন্য বৈধ থাকে। এই জেলা গ্রন্থাগারের বেশ কিছু সুস্থ ও কঠোর নির্দেশিকা আছে।

এখানে পুরোনো পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' বসুমতী ইত্যাদি রাখা আছে। বিশ্বকোষ সমগ্র, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস, অজস্র রেফারেন্সের বইয়ে জেলা গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। ৩১/৩/২০০০ পর্যন্ত এখানের বই এর সংখ্যা ৪৮৯৮৩।

নতুন বইপত্র কেনা হয় সরকারি আনুকূল্যে। পাঠকের চাহিদার কথা মনে রেখে। তবে পাঠকের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কমে যাচ্ছে আজকের এই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার দাপটে। গ্রন্থাগারিক সমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে গ্রন্থাগারটিই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কিভাবে পাঠককে টানা যায় সে সব নিয়েও তিনি প্রতিনিয়তই চিন্তা ভাবনা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য যে সব বই এবং পত্র পত্রিকা প্রকাশ হয় সেগুলোকে এখানে নিয়মিত রাখা হয় ফলে আগ্রহীরা এখানে ভিড় করেন।

খড়দহ স্টেশন থেকে কয়েক মিনিটের পথ এই জেলা গ্রন্থাগারটির। এর ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগার, ডাক ঃ রহড়া, জেলা উঃ ২৪ পরগনা। পিন ৭৪৩১৮৬।

■ রামপ্রসাদ টাউন লাইব্রেরী

হালিশহর তখন গ্রাম। সময়টা ১৯১১ সাল। কতিপয় উৎসাহী যুবক সেখানে

একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম। সেই আকাংখা বাস্তবে রূপ পায় ২০ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে। স্থাপিত হয় রামপ্রসাদ টাউন লাইব্রেরী। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে গৌরচরণ চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র নন্দী, ভক্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাইচরণ চক্রবর্তী, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর মান্না ও প্রভাস কান্ত প্রধান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক পদে বৃত হন রাসবিহারী নন্দী। মাত্র শ'দেড়েক পুস্তককে সম্বল করে পথচলা শুরু। পরবর্তীকালে নানাজনের, নানা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় লালিত এই গ্রন্থাগার। প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দু'শত টাকা ও একটি আলমারী, যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের ও শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়ের যথাক্রমে একচল্লিশ টাকা ও দশ টাকা, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একটি টেবিল দান করেন। ইতোমধ্যে আশুতোষ চক্রবর্তীর একশ টাকায় বেশ কিছু বই কেনা হয়।

১৯২৪ সাল। এই সময়ে পরপর তিন বছর গ্রন্থাগারের বাৎসরিক অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন দীনেশচন্দ্র সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। এর পরে পৌরসভার সহযোগিতায় গ্রন্থাগারটি পুস্তক সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই সময়েই গ্রন্থাগারের নিজস্বভবন নির্মাণের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু হয়। গঠিত হয় একটি গ্রন্থাগার উন্নয়ন তহবিল। সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। নানা কারণে সে স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়নি, গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রথম দিক থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বর্হিবাটিতে বিনা ভাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গ্রন্থাগারে ভিত্তি স্থাপিত হল ১৯৫৪ সালের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে গুড উইল ফ্রেটারনিটির সম্পাদক যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারা ক্রেগ পাঠের দক্ষিণ অংশের ভূমিখণ্ডের উপরে, বর্তমানে সেখানেই গ্রন্থাগারের স্থায়ী ঠিকানা।

গ্রন্থাগারটি D. S. E. O Memo No. 848 dtd 12.9.61 দ্বারা স্বীকৃত এবং 152/TL 10 dt. 27.3.81 আদেশক্রমে শহর গ্রন্থাগারে উন্নীত হয়েছে। স্বভাবতই সরকারি নিয়মকানুন মেনেই এটি চলে।

এখানে মোট পুস্তকের সংখ্যা ১২৯২৬। সদস্য সংখ্যা (১) পুরুষ ১৩২১ জন (২) মহিলা ৫১১ জন, (৩) শিশু ৫৩ জন এবং (৪) নব স্বাক্ষর ১৮ জন। সাধারণ সদস্যদের গ্রন্থাগারে দেয় মাসিক চাঁদা দু'টাকা মাত্র। গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা চারজন। পুরানো পত্র পত্রিকার মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, অমৃত, বসুমতী, দেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে উপন্যাস, গল্প, ধর্ম, জীবনী, ভ্রমণ, ইতিহাস, পাঠ্যপুস্তক এবং আকর গ্রন্থ বিষয়ক পুস্তকের চাহিদা আছে।

গ্রন্থাগারটি হালিশহর উত্তর চব্বিশ পরগণায় একেবারে পুণ্য সলিলা গঙ্গার

ধারেই।

সূত্র ঃ (১) কুমার হট্ট-হালিশহর/গুডউইল ফ্রেটারনিটি
(২) নারায়ণচন্দ্র সরকার/সম্পাদক, রামপ্রসাদ টাউন লাইব্রেরী

■ গান্ধীস্মারক সংগ্রহালয় (পাঠাগার)

বারাকপুর ১৪ নং রিভার সাইড রোডেই গান্ধী মিউজিয়াম। গঙ্গার ধারেই মোট ৯ বিঘা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত। পোশাকী নাম গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়। ঢোকার মুখেই বিরাট প্রাঙ্গণ যেন সবুজের গালিচা পাতা। কতরকমের গাছ গাছালি। মনোরম পরিবেশ। প্রকাণ্ড বাড়ি। সে সব বৃটিশ আমলে তৈরি। ১৯৬৬ সালেই এটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। খোলা থাকে সংগ্রহালয়টি প্রতিদিন ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। কোন প্রবেশমূল্য লাগে না। তবে প্রতি বুধবার বন্ধ থাকে। এর দেখভাল করার জন্য আছে একটি ট্রাস্টি বোর্ড।

গান্ধীজির জীবন, চিন্তা ও কর্মধারার উপর গড়ে উঠা এই সংগ্রহালয়টি জীবনীমূলক। আলাদা করে এখানের পাঠাগারটির অস্তিত্ব নেই। এটি সংগ্রহালয়ের সঙ্গে সংপৃক্ত, জানালেন ডঃ সুপ্রিয় মুন্সী যিনি এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। গান্ধীজীকে বিশদভাবে জানতেই এই পাঠাগার। কেবল গান্ধীজিই নয়, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাধীনতা আন্দোলন, পরিসংখ্যান, জীবনীমূলক পুস্তকাদি, নৃতত্ব সাহিত্য ও শিল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপর সংগ্রহে এই পাঠাগার সমৃদ্ধ। উচ্চ গবেষণার জন্যও সমান উপযোগী।

বর্তমানে এই পাঠাগারের বই এর সংখ্যা প্রায় নয় হাজারের মত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা সংরক্ষিত হচ্ছে। এই পাঠাগারে 'Encyclopidia Britanica' (সর্বশেষ সংস্করণ ৩২টি খণ্ডে) রাখা আছে। পাঠক এখানে মনে করলে, বসে বই পড়তে পারেন। কোন বই, বাড়ির জন্য দেওয়া হয় না। যেহেতু এটি সাধারণ পাঠাগার থেকে ভিন্ন ধর্মী। সুতরাং মাসিক চাঁদা ইত্যাদির কোন প্রশ্ন নেই। গবেষণার কাজের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগার সংলগ্ন একটি আবাসস্থলও আছে। গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী সর্বানী চট্টোপাধ্যায় জানালেন প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ দীর্ঘদিন এখানে থেকেছেন। গান্ধীজীর জীবনী এবং তাঁর আদর্শকে জনমানসে তুলে ধরাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

■ চাণক পাঠাগার

বারাকপুর একটি প্রাচীন জনপদ। এর পূর্ব নাম ছিল চাণক। কবি দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে (১৮৭১ সাল) চাণক নামটির উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

'মুলাজোড় ইছাপুর সশস্ত্র চাণক/ বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়-রঞ্জক।' লক্ষণীয় ১৮৫৭ সালে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণেই বারাকপুরকে 'সশস্ত্র চাণক' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। চাণক পাঠাগারটির নামকরণ সম্ভবতঃ বারাকপুরের পূর্বনামানুসারে।

এই টাউন লাইব্রেরিটির প্রতিষ্ঠা ১৯৩৮ সালে (বাংলা ১৩৪৫সন)। বারাকপুরের তালপুকুরে বি টি রোড থেকে মিনিট দশেকের পথ এই গ্রন্থাগারটি, একেবারে রাসমণি ঘাটের কাছেই। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনটি দোতলা। একতলায় আছে চাণক উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়, মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে। দোতলায় গ্রন্থাগার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত হবার সুবাদে সরকারি নিয়মনীতি মেনেই এটি চলে। খোলা থাকে প্রত্যহ দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত। সরকারি ছুটি ছাড়াও মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং প্রতি রবিবার গ্রন্থাগারটি বন্ধ থাকে।

বর্তমানে গ্রন্থাগারটির সদস্য সংখ্যা ৩৩৫জন। আজীবন সদস্য আছেন তিনজন। এখানে ভর্তির জন্য ১০০টাকা Caution money (refundable) এবং অন্যান্য ৬ টাকা মোট ১০৬ টাকা দিতে হয়। এছাড়া মাসিক দেয় চাঁদার পরিমাণ দুটাকা। এই গ্রন্থাগারে মোট বই-এর সংখ্যা দশ হাজারের মতো। একটি পরিচালন সমিতি আছে এটাকে দেখ-ভাল করার জন্য। পত্র-পত্রিকার মধ্যে দেশ, আনন্দবাজার, স্টেটস্‌ম্যান, আনন্দমেলা, পড়াশুনা ইত্যাদি নিয়মিত এখানে রাখা হয়। পুরানো পত্র-পত্রিকা যেমন—ভারতবর্ষ, প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, পরিচয়, অমৃত, মাসিক বসুমতী, শিশুসাথী, চতুরঙ্গ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পঞ্জিকার ভাণ্ডারটিও বেশ সমৃদ্ধ। এখানে গল্প, উপন্যাসের চাহিদাই বেশি। তবে চাকুরীর খবর সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা, যেগুলি ইদানীংকালে নিয়মিত প্রকাশিত, সেগুলি রাখা হয় পাঠকের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে। বইগুলি সরকার নির্দেশিত নিয়মাবলী অনুযায়ী সাজানো আছে। তথ্যগুলি জানালেন, এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী অনিতা ভট্টাচার্য।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য গ্রন্থাগারের অবস্থানজনিত সমস্যার কথাও শোনালেন। বললেন এটির অবস্থান বারাকপুর শহরের প্রাণকেন্দ্রে হলে আশানুরূপ পাঠক পাওয়া যেত। তবে আশার কথা অতীন্দ্র সিনেমার পাশে গ্রন্থাগারের নিজস্ব একখণ্ড জমিতে নাকি গ্রন্থাগারটি শিফ্‌ট করার চিন্তা ভাবনা চলছে।

■ নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার

নবাবগঞ্জ (ইছাপুর) সাধারণ গ্রন্থাগারটি গঙ্গার ধারে মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ ফেরিঘাটের কাছেই অবস্থিত। এটি গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অনুমোদিত এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৩২ সালের ১ জুলাই।

গ্রন্থাগারের কর্মীসংখ্যা চারজন। এদের মধ্যে দু'জন গ্রন্থাগারিকা আছেন। এখানে সদস্য হতে গেলে ফরম কেনার জন্য দুটাকা এবং ভর্তির সময় ৩২ টাকা মোট ৩৪ টাকা দিতে হয়। এছাড়া মাসে মাসে দেয় চাঁদার পরিমাণ এক টাকা। শিশুদের জন্য আলাদা বিভাগ আছে। তবে শিশুদের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য কিছুই দিতে হয় না। গ্রন্থাগারটি খোলা থাকে দুপুর একটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত। সরকারি ছুটি ছাড়া মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার এবং প্রতি রবিবার গ্রন্থাগারের সব বিভাগ বন্ধ থাকে। এইসব তথ্যগুলি জানালেন এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতী সবিতা কুণ্ডু (মণ্ডল) এবং শ্রীমতী কেকা পাণ্ডে (ঘোষ)।

গ্রন্থাগারটি দেখাশোনা করার জন্য একটি পরিচালন সমিতি আছে। এখানে মোট বই-এর সংখ্যা ১০,৮৫৭ (৩-১০-২০০০ পর্যন্ত)। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ ছাড়াও রেফারেন্স বইও এখানে আছে। আর আছে পুরানো পত্র-পত্রিকার মধ্যে বঙ্গদর্শন (কয়েকখণ্ড), বিচিত্রা, উল্টোরথ ইত্যাদি। প্রায় সব কটি দৈনিক সংবাদপত্র, মাসিক পত্র-পত্রিকা এখানে নিয়মিত রাখা হয়। এসব বাবদ মাসে নাকি পাঁচশো টাকার মতো খরচ হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ৯১৬ জন, আজীবন সদস্য ২১জন, এবং শিশু সদস্য ১০৮ জন (১৬-১০-২০০০ পর্যন্ত)।

ফি বছরই এখানে লাইব্রেরির উদ্যোগে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম জয়ন্তী, ১ জুলাই লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা দিবস, গ্রন্থাগার দিবস (২০ ডিসেম্বর), সরস্বতী পূজা ইত্যাদি। এইসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে কবিতাপাঠ, অংকন প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আসর বসে। এখানে সরস্বতী পূজা অত্যন্ত ধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রন্থাগারটি গঙ্গার ফেরী ঘাটের কাছে অবস্থিত হবার সুবাদে এখানে পাঠকের ভীড় হয়। এমনকি গঙ্গার ওপারে চাঁপদানী থেকেও পাঠক আসেন বই সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সবরকম বই এর চাহিদার এখানে রয়েছে। তবে গবেষক পাঠক আসেন কদাচিৎ। গ্রন্থাগারটিকে আরও গণমুখী করার পরিকল্পনা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারছে না বললেন এই গ্রন্থাগারের অন্যতম গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি সবিতা কুণ্ডু (মণ্ডল)।

গ্রন্থাগারের ঠিকানা : পোঃ-ইছাপুর-নবাবগঞ্জ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা (৭৪৩১৪৪)।

লেখক পরিচিতি : প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক

বারাকপুরের মিউজিয়াম (প্রথম পর্যায়)

—শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

■ গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

Generations to come will scare believe that such a one as this in flesh and blood ever walked upon this earth-Albert Einstein.

বারাকপুর ১৪ রিভার সাইড রোডের উপর জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর জীবন, দর্শন, কর্মধারা এসব নিয়ে গড়ে উঠেছে পূর্বাঞ্চলের একমাত্র সংগ্রহালয়। এটি ১৯৬৬ সালের ৭ মে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। গান্ধী বিষয়ক গবেষণা এবং তাঁর কর্মধারাকে বুঝবার পক্ষে একটি অনন্য সংগ্রহালয় হল এই গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়। বর্তমানে এই সংগ্রহালয়ের নির্দেশক হলেন অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী।

গান্ধী বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য ছবির সংগ্রহালয় এটি। এখানে রয়েছে ১৯১৬ সালের একটি ছবি—যেখানে দেখা যায় গান্ধীজীকে সেন্ট পলস্ কলেজের তরফ থেকে সম্বর্ধনা জানান হচ্ছে। আর তাঁর সঙ্গে আছেন কস্তুরাবাঈ। ১৯২৪ সালে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সঙ্গে একসাথে চরকা কাটছেন, সেই ছবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাথে ২৫টির বেশি ছবি, ১৯৪৬/৪৭ সালে নোয়াখালির দাঙ্গার সময় যে শান্তি মিশনে গিয়েছিলেন সেখানকার ৩২৫টির মত ছবি, ১৯৩০ সালে উড়িষ্যার লবণ সত্যাগ্রহের সময় প্রায় ১৫টি Original glass negative আছে এই
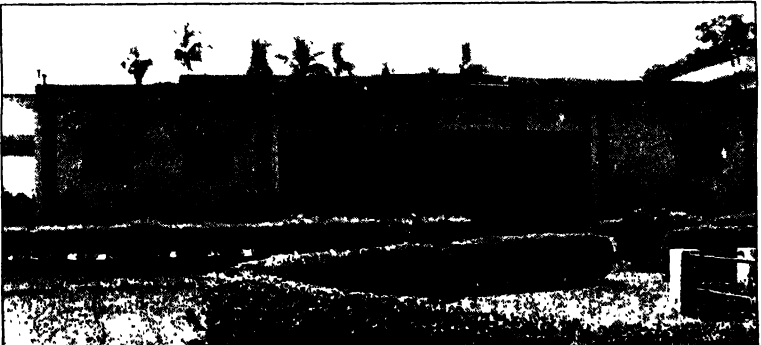
বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

সংগ্রহালয়ে।

গান্ধীজীর নিজের হাতের লেখা চিঠি এবং ২৮০০০ চিঠির ফটো কপি সংগ্রহালয়ে সঞ্চিত রয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার হল তিনি দুহাতেই সমানভাবে লিখতে পারতেন। প্রখ্যাত শিল্পী স্বর্গীয় সতীশ সিংহ্ মহাশয়ের আঁকা ছবি গান্ধীজীর তৈল চিত্র (পূর্ণাবয়ব), ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের নির্মিত ১০০ ফুটেরও বেশি দেওয়াল চিত্র স্বদেশী গানের বহু রেকর্ড এবং বিভিন্ন জাতীয় নেতার কণ্ঠস্বরের রেকর্ড এখানে আছে।

সংগ্রহালয়ে সর্বমোট ৫টি কক্ষ। এছাড়া আছে নিজস্ব একটি প্রেক্ষাগৃহ। এখানে গান্ধী বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা সেমিনার হয়ে থাকে। এই সংগ্রহালয়ের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গ্রন্থাগারটি। বহু গবেষণামূলক বই গ্রন্থাগারে আছে।

M.A এবং M.Sc তে Museology নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেন তাঁদের Practical class-এর ব্যবস্থা করা হয়।

বেলা ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সংগ্রহালয় খোলা থাকে। বুধবার বন্ধ।

■ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সংগ্রহশালা

গান্ধীজী যাঁকে বলেছেন 'বারাকপুরের ঋষি' এবং 'বাংলার সিংহ' সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ জীবনের বেশির ভাগ দিন কাটিয়েছেন বারাকপুর মহকুমার প্রাচীন জনপদ মণিরামপুরে। এখানেই তাঁর প্রাসাদোতম বাড়ি। মহাত্মা গান্ধীও এই বাড়ি সম্পর্কে চমৎকৃত হয়ে লিখেছেন 'All around there is great quite. One can understand what a great relief it must have been to him to be able every day to retire to this pleasant retreat after the daily toil in crowed Calcutta.'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান এই বাড়িটি স্থানীয় মহাদেবানন্দ মহাবিদ্যালয়কে ব্যবহারের জন্য দিয়েছে। কলেজের ক্লাস হওয়া ছাড়াও এখানে গড়ে উঠেছে নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। আর ছোট্ট একটি ঘরে তৈরি হয়েছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সংগ্রহালয়।

এই সংগ্রহালয়ে রয়েছে

১। রাষ্ট্রগুরুর ব্যবহৃত চেয়ার।

২। রিপন কলেজকে দান করা ১৯০৯ সালের ট্রাস্টদলিলের অনুলিপি।

৩। রাষ্ট্রগুরুর আবক্ষমূর্তি।

৪। 'A Nation in Making' গ্রন্থটি। এছাড়া আছে অতি সামান্য কিছু বই।

সংগ্রহালয় খোলা থাকে (শনি ও রবিবার বাদে) বেলা ৩টা থেকে ৫টা।

■ বঙ্কিমচন্দ্র সংগ্রহালয়

নৈহাটি জংশন স্টেশনের পূর্বে পাকা পথ ধরে ঋষি বঙ্কিম কলেজের সামনে দিয়ে দক্ষিণে খানিক এগিয়ে ডাইনে মোড় ঘুরলেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহশালা এবং পথের পাশে তাঁর বসতবাড়ি পথিকের চোখে পড়ে। ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রাহালয় ১৯৫২সালে প্রতিষ্ঠা হয়। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৩ আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৪৫, ইংরাজি ২৬ জুন ১৮৩৮। মৃত্যু ২৬ চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩০০, ইংরাজি ৮ এপ্রিল ১৮৯৪।

বর্তমান সংগ্রহশালা বাড়িটি অতীতের তাঁর বৈঠকখানা ঘর ছিল। সেখানে বসে তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনা করতেন।

প্রথমে ঘরের দেওয়াল আলমারীতে তাঁর ব্যবহৃত দুটি ইংরাজি অভিধান, 'বঙ্গ দর্শন' কয়েকখণ্ড, পাগড়ি, শাল, কেরোসিন ল্যাম্প, দাবা, কাঠের বাক্স আছে। এই ঘরের মাঝে কাঁচের শো কেসে রয়েছে তুলোট কাগজে লেখা মহাকবি কালিদাস রায়ের শকুন্তলা নাটক, বঙ্গদর্শন একখণ্ড। আলমারির পাশে দেয়ালে সংলগ্ন পাথরের স্ট্যান্ডের উপর লেখা আছে বঙ্কিমের গণ জাগরণ 'বন্দেমাতরম'। নীচে ভারত মায়ের সন্তানদের দলবদ্ধ মূর্তি। আছে মূল্যবান কিছু চিঠিপত্র। তাঁর ব্যবহৃত টেবিলটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে এবং চেয়ারটি এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।

সংগ্রহশালার ঘরদুটিতে যাঁদের ছবি রয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—তাঁর চার ছেলে জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ, মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র এবং কণিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র।

শ্যামাচরণের জ্যেষ্ঠ ছেলে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিম জীবনী গ্রন্থের লেখক)। সঞ্জীবচন্দ্রের ছেলে জ্যোতিষচন্দ্র ও সতঞ্জীব।

বঙ্কিমের তিন মেয়ে জ্যেষ্ঠা শরৎ কুমারী দেবী (স্বামী রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। শরৎকুমারীর দুই ছেলে। জ্যেষ্ঠ দিব্যেন্দুসুন্দর, কণিষ্ঠ পূর্ণেন্দুসুন্দর।

বঙ্কিমের দ্বিতীয়া কন্যা নীলব্জ কুমারী দেবী (স্বামী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। কণিষ্ঠা কন্যা উৎপলকুমারী দেবী (স্বামী সতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। উৎপল কুমারী নিঃসন্তান ছিলেন।

সংগ্রহশালার প্রথম ঘরে বঙ্কিমচন্দ্রের এক আবক্ষ মূর্তি আছে। তাঁর একশ পঞ্চাশতম জয়ন্তী উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেসময়ে সভাপতি ছিলেন ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়। আবরণ উন্মোচণ করেছিলেন মাননীয় বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী।

লেখক পরিচিতি : প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার

বারাকপুরের মঠ ও মিশন (প্রথম পর্যায়)

বিবেকানন্দ মিশন ও মঠ

কানাইপদ রায়

১৯৭৬ সালে অক্টোবর মাসে বারাকপুর ৭ নং রিভারসাইড রোডে স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন। ১৯৮০ সালে স্থাপন করেন বিবেকানন্দ মঠ।

উদ্দেশ্য

"১। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশিত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিষ্কাম সেবার মাধ্যমে পরমানন্দকে লাভ করা। ২। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শিক্ষার আলোকে সর্বধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় প্রচার করা। ৩। আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তির সামঞ্জস্য পূর্ণ বিকাশ করা যা সামাজিক ও জাতীয় সংহতির সাহায্য করবে। ৪। অনাথ-অনাথিনী ও পশ্চাদপদ জাতির (তপশীল আদিবাসী) উন্নতিকল্পে সামাজিক শিক্ষা ও চিকিৎসা বিষয় সাহায্য করা। "

বাংলার শষ্য ভাণ্ডার এবং চাঁদসীর চিকিৎসার জন্য একদা বিখ্যাত বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় ১৯৩৩ সালে ২৯ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম শ্রীকৃষ্ণকমল চক্রবর্তী। পিতা শ্রী হরিভূষণ চক্রবর্তী, মা শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী। ১৯৫৫ সালে দর্শনশাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। এর আগেই ১৯৪৬ সালে বেলুড় মঠের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর গুরু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। ১৯৫৬ সালে স্বামী নিত্যানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে ব্রহ্মচর্য সংস্কারের পর ১৯৬৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখনকার বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বিরেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে তিনি কর্মদক্ষতার নিদর্শন রেখেছেন। ১৯৬৩ সালে রহড়ায় বিবেকানন্দ কলেজ স্থাপিত হলে তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি বারাকপুরে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন ও মঠ স্থাপন করেন।

বারাকপুরের মিশনের কার্যাবলী

1) 7, Riverside Road, Barrackpore.

The Mission and the Math have their Head quarters here with the following units : i) Central Offices to control & guide all centres under the Mission and the Math. ii) A welfare Home for orphan and destitute boys. iii) A Hostel for boys. iv) Five Primary Schools for boys. v) A High School (for boys upto Class-VIII and co-education upto Class-X) vi) A residential Vocational Training Centres for boys. vii) A Charitable Dispensary (Allopathy), viii) A Hospital ix) A Public Library and x) A Dairy

2) 42, Middle Road, Barrackpore.

i) A Welfare Home for orphan and destitute girls. ii) A residential Vocational Training-Cum-Production Centres for girls with a Printing Press named Sri Ma Sarada Press, iii) An English Medium K.G. & Primary School for girls.

3) 53, Barrack Road, Barrackpore.

i) A Primary School for girls ii) A Jr. High School for girls, iii) A Welfare Home for orphan and destitute girls & iv) A Hostel for Girls.

4) 81, Middle Road, Barrackpore.

i) A Welfare Home for orphan and destitute infants. ii) A K.G. School and iii) A Primary School.

5) 57, Barrack Road, Barrackpore.

i) A Welfare Home for orphan and destitute boys. ii) An Old Aged People's Home.

6) 31, Riverside Road Barrackpore.

i) A Jr. High School for boys. ii) A residential Vocational Training-Cum-Production Centre for ladies-in-distress with a Tailoring unit.

8) 39, Park Road, Barrackpore,

i) A Welfare Home for infant girls. ii) A Hostel for girls.

9) Rahara

A residential Vocational Training-Cum-Production Centre for ladies-in-distress.

কেন্দ্র সরকার ১৯৮৪ এবং ১৯৯১ সালে মিশনের সেবাকার্যে খুশি হয়ে মিশনকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়া ১৯৯২ সালে বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার লাভ করে।

স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল — শুভ সংবাদ, শতংবদ, কুমারী পূজা কি এবং কেন, বালক নারায়ণ পূজা কি এবং কেন। বিবেকানন্দ মিশন ও মঠ থেকে তত্ত্বমসি ও প্রজ্ঞাজ্যোতি এই দুটি পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ পেয়ে আসছে।

মঠের মনোরম পরিবেশে গঙ্গার ধারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মন্দির। এই মন্দিরের ভিতর রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শ্বেতপাথরের মূর্তি। প্রত্যহ সন্ধ্যা পূজা, আরতি, ভোগ, স্তোত্রপাঠ হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রায় বিভিন্ন উৎসবে বহুলোকের সমাগমে মঠের বিশাল চত্বর হয়ে ওঠে মুখরিত। মিশন থেকে গঙ্গার ওপারে দেখা যায় প্রাচীন জনপদ শ্রীরামপুর। আর এপারে আশ্রমকে স্পর্শ করে বয়ে চলেছে গঙ্গার জলরাশি একান্ত সাধনায়।

Swami Nityananda Gen. Secretary of the Ramakrishna Vivekananda Mission Receiving "National Award" 2nd Time from the President of India Mr. R. Venkat Raman at New Delhi in the year 1992.

তথ্যসূত্র : ১। শ্রীমৎ স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজ ও বিবেকানন্দ মিশন—ডাঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার। ২। আশ্রম থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা

অরবিন্দ ভবন (আশ্রম)

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

বারাকপুর ১৩নং রিভার সাইড রোডে গঙ্গার ধারে অরবিন্দ ভবন (আশ্রম) অবস্থিত। আশ্রমের গায়েই একটি ফলক রয়েছে। তাতে লেখা—Opened by Sri Sankar Prasad Mitra, Hon'ble chief Justice on 12-10-1974.

আশ্রম ভবনে ঢুকতেই বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে গাছ-গাছালি। ভবনের গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে হুগলী নদী। মনোরম পরিবেশ। ভবনের ভিতরে ঢুকতেই সোজাসুজি রয়েছে শ্রীমা ও অরবিন্দের বাঁধানো ছবি। এখানকার ভারপ্রাপ্ত সেবিকা বছর পাঁচেক হল এসেছেন। এর পরিচালনায় রয়েছে একটি ট্রাস্টিবোর্ড।

ভবনের সঙ্গে লাইব্রেরি। খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০মিনিট। আবার ৩টে থেকে ৬-৩০মিনিট। বই সংগ্রহের জন্য কোন কার্ড ইস্যু করা হয় না। তবে লাইব্রেরিতে কিছু ম্যাগাজিন থাকে, যা সকলেই পড়তে পারে। মাঝে মাঝে কথামৃত ও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে পাঠ হয়। একটি ক্যারাটে ক্লাস হয়। মেয়েদের উল বোনার কাজ শেখানো হয়। গানের ক্লাসও হয়ে থাকে।

অরবিন্দ আশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে—

১ জানুয়ারি	নববর্ষ উৎসব
১৩ জানুয়ারি	নলিনীকান্ত গুপ্তের জন্মদিন
২১ ফেব্রুয়ারি	শ্রীমায়ের জন্মদিন
২৯ মার্চ	শ্রীমায়ের প্রথম পন্ডিচেরীতে আগমন
৪ এপ্রিল	শ্রী অরবিন্দের পন্ডিচেরীতে পদার্পণ-এর প্রথম দিন
১৫ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
২৪ এপ্রিল	শ্রীমায়ের চিরদিনের জন্য পন্ডিচেরীতে আগমন
১৫ অগস্ট	শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন
১৭ নভেম্বর	শ্রীমায়ের মহাপ্রয়াণ
২৪ নভেম্বর	শ্রী অরবিন্দের সাধনার সিদ্ধিদিবস
৫ ডিসেম্বর	শ্রী অরবিন্দের মহাপ্রয়াণ

এই আশ্রমের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তবে চেষ্টা চলছে এর আর্থিক উন্নতি ঘটিয়ে আশ্রমের উন্নতি বিধান করা। প্রত্যহ আশ্রমে 'ধ্যান'-এর ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের বাইরে থেকেও অনেকে এসে ধ্যানমগ্ন হন।

লেখক পরিচিতি : প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার

বারাকপুর মহকুমার বৌদ্ধ সম্প্রদায়

বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল

প্রকাশ বড়ুয়া

বারাকপুর মহকুমার জগদ্দল থানার অন্তর্গত শ্যামনগরে গৌরী শংকর জুট মিলে কর্মরত হয়ে বিংশ শতাব্দির তৃতীয় দশকে শ্রী দয়াল প্রসাদ বড়ুয়া প্রথম বারাকপুর মহকুমায় আসেন বলে জানা যায়। দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রাম জেলা তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় তিনি স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাসের তাগিদ অনুভব করেন এবং ঐ গৌরী শংকর জুট মিলের অনতিদূরে ইছাপুর মানিকতলাতে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও চট্টগ্রাম থেকে আগত ১১ জন বাঙালি মগ বৌদ্ধ একযোগে তাঁদের প্রয়োজনানুযায়ী জমি ক্রয় করেন। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ বিহার ও মন্দির নির্মাণ এর জন্য প্রয়োজনীয় জমি রেখে বাকি জমিতে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকেন। ঐ এগারজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে পাড়ার সৃষ্টি হয় তার নাম দেওয়া হয় "বৌদ্ধ পল্লী"। বুদ্ধ বিহার ও মন্দিরের নামকরণ করেন 'তথাগত বিহার' বারাকপুর মহকুমায় চট্টগ্রাম মগ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বাঙালি বৌদ্ধদের গোড়াপত্তন এই মানিকতলা ইছাপুর থেকেই। (পরবর্তী সময়ে আরো বৌদ্ধরা মানিকতলা বৌদ্ধপল্লী জমি ক্রয়ে গৃহাদি নির্মাণ করে ঐ পল্লীর বিস্তার ঘটায়।) বর্তমানে চল্লিশটি পরিবারের মতো বৌদ্ধরা ঐ বৌদ্ধপল্লীতে বসবাস করেন। "তথাগত বিহারের" প্রধান পুরোহিত তথা বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মদর্শী মহাস্থবির একজন সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত। তাঁর লেখা বহু ধর্মীয় গ্রন্থ বৌদ্ধদের ধর্ম অনুশীলনের সহায়ক।

ইছাপুর মানিকতলায় বাঙালি বৌদ্ধদের বৌদ্ধপল্লী পত্তনের সমসাময়িক কালেই পত্তন হয়, আতপুর বড়ুয়াপাড়া। চট্টগ্রামের মগ সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙালি বৌদ্ধদের বেশিরভাগ পদবী "বড়ুয়া"। এছাড়া "চৌধুরী", "তালুকদার", "সিংহ", "মুখার্জি" পদবীও আছে। ঐ আতপুর বড়ুয়া পাড়ার গোড়াপত্তন করেন স্বর্গীয় চিরঞ্জীব বড়ুয়া, প্রিয়নাথ চৌধুরী, কনক বড়ুয়া ও যতীন্দ্র লাল বড়ুয়া। স্বর্গীয় চিরঞ্জীব বড়ুয়া অত্যন্ত সমাজ হিতৈষী ছিলেন। আতপুর বড়ুয়া পাড়ার উন্নয়নের

ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

বর্তমানে আতপুর বড়ুয়া পাড়ায় দেড়শত বৌদ্ধ পরিবারের বাস। দুটি বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধ মন্দির আতপুর বড়ুয়া পাড়ায় অবস্থিত।

প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'জগদ্দল বিহার'। শ্যামনগর নেহেরু মার্কেট সংলগ্ন ঐ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা ও বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বুদ্ধ দত্ত মহাস্থবির। পরে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় "বোধি বিহার" নামে বুদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিহার সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বৌদ্ধদের নিকট সু-পরিচিত। এই বিহারের সৌন্দর্য ও শান্তগুরুগম্ভীর পরিবেশ এতই মনোমুগ্ধকর যে তীর্থযাত্রীরা এক অনাবিল মধুর পরশে আপ্লুত হয়।

আঁতপুর বৌদ্ধ সম্প্রদায় অধ্যুষিত গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে বিবেকনগর গৌতমপল্লী। এই গৌতম পল্লীতে একশত কুড়ির মত বৌদ্ধ পরিবারের বাস। এই গ্রামেও বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধ মন্দির আছে। এই বিহারের নাম "বিবেকনগর ত্রিরত্ন বিহার"। আম্রকুঞ্জের সুশীতল মনোরম শোভা বক্ষে ধারণ করে বিবেকনগর "ত্রিরত্ন বিহার" বুদ্ধের ধর্মধ্বজা উড্ডীন রেখে নিয়ত মহামানব বুদ্ধের পবিত্র ধর্ম ও বাণী প্রচার ও প্রসারে-রত বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বিবেকানন্দ মহাস্থবির বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ ত্রিপিটক বিশারদ আখ্যায় আখ্যায়িত।

ইছাপুর বৌদ্ধ পল্লীর নিকটস্থ ঘোষপাড়া রোডের পশ্চিমে কুড়িটির মত পরিবার নিয়ে বৌদ্ধ সংখ্যাধিক্য গ্রাম "বঙ্কিমনগর"। এই গ্রামে বুদ্ধ মন্দির আছে কিন্তু বৌদ্ধ বিহার নাই। ঐ মন্দিরে স্থায়ীভাবে কোন ভিক্ষু তথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অবস্থান করেন না। ঐ গ্রামের বৌদ্ধরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পার্শ্বস্থ গ্রামের বিহার থেকে ভিক্ষু আনায়ন করে সম্পন্ন করে থাকেন।

টিটাগড় থানার অন্তর্গত মোহনপুর গ্রাম। এই গ্রামে বৌদ্ধ পরিবারের সংখ্যা প্রায় পয়ত্রিশ। দক্ষিণে বারাসাত-বারাকপুর রোড ও পশ্চিমে কল্যাণী রোড বেষ্টন করে আছে এই মোহনপুর গ্রামকে। এখানে গড়ে উঠেছে (কল্যাণী রোড সংলগ্ন) "কুঞ্জবন বিহার"। এই বিহারে "ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার" প্রধান কার্যালয়। কুঞ্জবন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ রতন জ্যোতি মহাস্থবির স্বনামধন্য ধর্মীয় প্রবক্তা এবং ধর্মীয় মন্ত্র গাঁথা পরিবেশনে পারদর্শী। তাঁর মন্ত্র উচ্চারণ ও মন্ত্রের শব্দ প্রক্ষেপণ শ্রুতি মধুর। "ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার তিনি নির্বাচিত মহামন্তক, অর্থাৎ সাধারণ সম্পাদক। "কুঞ্জবন বিহার" এর নির্মাণ শৈলী ও স্থাপনা কৌশল এবং পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক শোভা নান্দনিক।

সোদপুরের একটি সুপরিচিত গ্রাম তীর্থভারতী। প্রায় একশত পঞ্চাশ বৌদ্ধ পরিবার নিয়ে এই বৌদ্ধ গ্রাম। তীর্থ ভারতীর বৌদ্ধদের জন্য এতদঞ্চলের বৌদ্ধরা

যে বুদ্ধ মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন সেই বিহার "ত্রিরত্নাঙ্কুর বিহার" নামে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধদের কাছে সুপরিচিত। (এই গ্রামে বৌদ্ধ বিহার বিংশ শতাব্দির সপ্তদশকে প্রতিষ্ঠিত হয়)। ঐ বিহারে বর্তমান প্রধান পুরোহিত শ্রীমৎ জিনপ্রিয় ভিক্ষু। তীর্থভারতী থেকে দুই কিলোমিটার-এর মধ্যে আর একটি বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল সোদপুর নাটাগড়। এই এলাকায় চল্লিশটির মত পরিবার বৌদ্ধ। এখানকার বুদ্ধ মন্দির ও বিহার'র নাম "নাটাগড়-ধর্মাধার বিহার"। ভারত সরকারের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বৌদ্ধ কুল গৌরব মহাপণ্ডিত, "সংঘনায়ক" পরম পূজ্য শ্রীমৎ ধর্মধার মহাস্থবির মহোদয়'র নামকরণে এই "নাটাগড় ধর্ম্মাধার বিহার"। এই বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ অতুলানন্দ ভিক্ষু। তিনি একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

বারাকপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ পরিবার বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পলতা, ইছাপুর, বাদামতলা, নবাবগঞ্জ, বারাকপুর সংলগ্ন আনন্দপুরী, মণিরামপুর, টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, নৈহাটি, বেলঘরিয়া, নারায়ণপুর, দমদম ও দমদম ক্যান্টনমেন্ট।

বাঙালি বৌদ্ধদের মন্দির ও বিহারকে কেন্দ্র করে অঞ্চলভিত্তিক সমিতি বা বিহার কমিটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এই সব সমিতি বা কমিটি মন্দির ও বিহার পরিচালনা করে। বিহারাধ্যক্ষ কেবলমাত্র ধর্মীয় পৌরহিত্য করেন। যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানাদি বা ধর্মীয় কার্যাদি বিহারে বিহারাধ্যক্ষের পরামর্শে ও আদেশক্রমে সমিতি বা কমিটি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২ নং কলাবাগান লেন জগদ্দল ও ভারতীয় অবাঙালি হিন্দি ভাষাভাষীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা সেখানে ডঃ আম্বেদকার বৌদ্ধ বিহার" নামকরণে মন্দির ও বিহার নির্মাণ করেছেন। এই অবাঙালি নববৌদ্ধরা জগদ্দলে ২৫/৩০ পরিবারের মত হবে। তাঁহারা প্রায়শঃ বাঙালি বৌদ্ধদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন।

* সম্পাদকের অনুরোধে লেখক লেখাটি পাঠিয়েছেন

হীনযান বৌদ্ধদের পোষাক

প্রলয় ভট্টাচার্য

এঁরা গেরুয়া আর পোড়ামাটির রঙের কাপড় ব্যবহার করেন। পুরো অঙ্গবস্ত্রকে বলা হয় 'চীবর'। গায়ে যেটা জড়ান থাকে তার নাম—'উত্তরাসঙ্গ'। কাঁধের ওপরে 'দোয়াজ্জিকা'। কোমরের নিচে—'অন্তর্বাস'। বেল্টের মত যা থাকে তাকে

বলে 'কটিবন্ধনী'।

সাধারণত সাত আট বছর বয়সেই বৌদ্ধদের দীক্ষাগ্রহণ হয়। প্রত্যেক বৌদ্ধেরই অবশ্য জীবনাচরণের মধ্যে পড়ে এই 'দীক্ষা'। দীক্ষা নেওয়ার পর হয় 'শ্রমণ'; 'প্রব্রজ্যা'-পর্ব শেষ হওয়ার পর গুরুর অধীনে থেকে হতে হয় 'ভিক্ষু'। 'দীক্ষা' আর এই পর্বগুলি কিন্তু পৃথক। সংসারের সম্মতি আর গুরুজনের ইচ্ছাতেই একজন বৌদ্ধ 'প্রব্রজ্যা' গ্রহণ করতে পারেন—এটাই অনুশাসন। জোর বা অনিচ্ছার কোন স্থান নেই। ২০ বছর 'ভিক্ষু' থাকবার পর গুরুদেবের আজ্ঞায় অন্যান্য সকলের সামনে ভিক্ষুকে 'মহাস্থবির' আখ্যা দেওয়া হয়।

ত্যাগ আর ঔদার্যের প্রতীক হল 'গেরুয়া'; ইন্দ্রিয় থেকে সমস্ত ভোগ ও লালসাকে হঠিয়ে, নিজের জীবন-মন-প্রাণকে কর্মের মধ্যে; ভগবান বুদ্ধের চরণে সঁপে দেন এঁরা।

'স্থবির'—একটা সংস্কৃত শব্দ। এই শব্দ থেকেই এসেছে একটা 'পালি' শব্দ, নাম তার 'থেরবাদ'। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের 'স্থবির' বা স্থিতপ্রজ্ঞদের মতবাদ। এঁদেরই অন্য নাম—'হীনযান'।

ইছাপুর, পূর্ব মানিকতলার 'তথাগত বিহার'র' যিনি প্রধান তাঁর নাম—ভদন্ত ধর্মদর্শী মহাথের।।

কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় এখান থেকে 'ফানুস' বানিয়ে আকাশে ছাড়া হয়।

লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট

বৌদ্ধ উৎসব

ভদন্ত ধর্মদর্শী মহাথের

বড়ুয়াদের সব চেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে কঠিন চীবর দানোৎসব। এ উৎসব একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার মধ্যে যে কোন দিন এ দানোৎসব করা যেতে পারে। যে বিহারের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ অবস্থান করেন এবং ত্রৈমাসিক ব্রত পালন করেন সে বিহারে উক্ত সময়ের মধ্যে বৎসরের মাত্র একবার করা যেতে পারে। ঐ দিন বিহারকে সাজানো হয়। দেশ বিদেশ থেকেও বৌদ্ধ ভিক্ষু বা গৃহীরা ঐ উৎসবে সামিল হন. অতিথি অভ্যাগতদের খাবার ব্যবস্থা করা হয়। বেলা তিনটারদিকে গৃহী বৌদ্ধেরা ভিক্ষুদের নতুন পরিধানবস্ত্র 'চীবর' মাথায় করে বিহারের সারিবদ্ধভাবে আসেন। সঙ্গে বিভিন্ন দানীয় বস্তুও থাকে। তারপর ত্রিসারণ মন্ত্র ও পঞ্চশীল গ্রহণ করে "ইমং কঠিন চীবরং ভিক্খু সঙঘস্‌স দেখ্‌, কঠিনং অত্থারিতুং" তিনবার এ মন্ত্র বলে ভিক্ষু সংঘকে বস্ত্র দান দিয়ে থাকেন। এরপর ধর্মসভায় বক্তাগণ মানুষের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ

ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। অনেকে ঐ উৎসবকে বৌদ্ধ শারদীয় উৎসবও বলে থাকেন। প্রত্যেক বিহারে এক একদিন করে এ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা, আষাঢ়ি পূর্ণিমা, ভাদ্র পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, মাঘি পূর্ণিমা তিথিতেও প্রত্যেক বিহারে ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়। বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, দরিদ্র ভোজন, গরীবদের বস্ত্র বিতরণ, গরীব ছাত্র-ছাত্রীকে এককালীন সাহায্য বা পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি কর্মসূচী পালন বাধ্যতামূলক। ভাদ্র পূর্ণিমায় মধু দান ও ঔষধপত্রাদি দান করা পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য, আশ্বিনী পূর্ণিমায় বড়দের প্রণাম করে ক্ষমা ভিক্ষা ও ছোটদের স্নেহ ভরে বক্ষে আলিঙ্গণ করে মঙ্গল কামনা করা হয়। মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপ বা ফানুস উত্তোলন এ পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য। বড়ুয়ারা বাঙালি হিসাবে বাংলা নববর্ষকে সাড়ম্বরে উৎসব হিসাবে পালন করে থাকেন। নারিকেলের নাড়ু বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া সামাজিক উৎসব হিসাবে বিবাহ কর্ম, অন্নপ্রাশন, নব গৃহে প্রবেশ ইত্যাদিতেও যথাশক্তিতে অনুষ্ঠানাদি করে থাকেন।

লেখক পরিচিতি : তথাগত বিহারের প্রধান

তথাগত বিহার, ইছাপুর। ছবি : প্রলয় ভট্টাচার্য

বারাকপুরের সাহিত্যভূমিকে যাঁরা উর্বর করেছেন

প্রথম খণ্ডে ১৯ জন ব্যক্তিত্বের (১৯০০ খ্রীঃ পূর্বে জন্ম) পরিচয় দেওয়া হয়েছে

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়

প্রলয় ভট্টাচার্য

বীরভূমের লাঘোষা গ্রামে রঙ্গলালের প্রচলিত নাম ছিল রংলাল ডাক্তার। তাঁকে বলা হত 'যমের যম রংলাল ডাক্তার'। সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে এই রংলাল ডাক্তারের কথাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। চিকিৎসাবিদ্যায় নিখুঁত সাফল্যে রঙ্গলালের পসার ভালই হয়েছিল। পালকি করে রোগীর বাড়ি যেতেন। গোপনে বেওয়ারিস লাশ জোগাড় করে 'মনা' নামে এক ডোম-কে সঙ্গী করে তিনি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে গভীর রাতে শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে নিভৃত এক ঘরে মানব শরীরের 'অ্যানাটমি' বিশ্লেষণ চলত।

এ ঘরেই ছিল তাঁর যোগ সাধনার পঞ্চমুণ্ডির আসন। চিকিৎসা বিদ্যায় সাফল্যে যে অর্থ জমা হয় তাতেই 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ ছাপাবার পরিকল্পনা করেন। প্রথমে কলকাতা, পরে নিজের গ্রাম ২৪ পরগণার রাহুতায় 'বিশ্বকোষ' ছাপা হয়। অসমাপ্ত বিশ্বকোষ গঠনের কাজ, নগেন্দ্রনাথ বসুর হাতে তুলে দিয়ে চলে আসেন আবার নিরিবিলি পল্লী লাঘোষায়। সমাধিস্থ হবার বাসনা রঙ্গলালের নিজেরই ছিল। তাই মৃত্যুর আগে 'মৃত্যুফলক' লিখে সমাধির স্থান নির্দেশ করে গেছিলেন। যা পৃথিবীতে আর হয়নি। তিনি সমাধিস্থই হয়েছেন। হিন্দু বিধিতে তাঁকে দাহ করা হয়নি। তাঁর সমাধি অনাদর অবহেলায় এখনও রয়েছে—তার গায়ে লাগান ফলক। লেখা—

"ওঁ তারা/দয়াসিন্ধু মহাযোগী 'বিশ্বকোষ' প্রবর্তকঃ।/জীয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিবাম্।।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়/আবির্ভাব ঃ গ্রাম রাহুতা জেলা ২৪ পরগণা/২৪শে আষাঢ় ১২৫০/তিরোভাব ঃ ১৭ই কার্তিক ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।।"

দূরদর্শী রঙ্গলাল হয়ত জানতেন 'বিশ্বকোষ' স্থাপনা এই মহৎ কীর্তি দেশবাসী বিস্মৃত হবেন; তাই মৃত্যুলিপি রচনা করে ভাবীকালের কোনও কৌতূহলীজনের নজর থেকে উঠে আসবেন তিনি স্বমহিমায়। হয়েছে তাই, প্রয়াস সম্পূর্ণ হয়নি আমাদের; তাঁকে খোঁজরার, বোঝাবার চেষ্টা চলছে।

কৃষ্ণরাম দাস, হরিনাথ দে, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু

কানাইপদ রায়

কৃষ্ণরাম দাস ঃ নিমতা। কবি কৃষ্ণরাম দাস ২০ বছর বয়সে (১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) 'কালিকামঙ্গল' রচনা করেন। এই কাব্যে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন,

'সেই গ্রামের মধ্যে বাস / নাম ভগবতী দাস/ কায়স্থ কুলেতে উৎপত্তি।/তাহার তনয় হই/নিজ পরিচয় কই/বয়ঃক্রোম বৎস বিংশতি।।'

কৃষ্ণরাম 'কালিকামঙ্গল' ছাড়াও রচনা করেন — রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলামঙ্গল। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে 'বিদ্যাসুন্দর' লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিল কৃষ্ণরামের 'কালিকামঙ্গল'।

হরিনাথ দে ঃ আড়িয়াদহ জন্ম ১২.৮.১৮৭৭ খ্রীঃ। বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে ইমপেরিয়াল এডুকেশন সার্ভিস-এর প্রথম ভারতীয় সদস্য। ২০টি ইউরোপীয় এবং ১৪টি ভারতীয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে ঢাকা সরকারি কলেজে অধ্যাপনার পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর হুগলী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করার পর ইমপিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগার) প্রথম ভারতীয় গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। চীনা ভাষা থেকে নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন, তিব্বতী ভাষায় রচিত ডুয়াঙের লজিক প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদ বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের প্রামাণিক নিদর্শন হিসেবে 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্' ও 'লঙ্কাবতারসূত্র' সম্পাদনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ আগরপাড়া। জন্ম ১.১০.১৮৯৭ খ্রীঃ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'ভারতীরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন। দোভাষী হিসেবে গান্ধীজীর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফর করেছিলেন ১৯২৫ খ্রীঃ। দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ হালিশহর। জন্ম নভেম্বর ১৮৮২ খ্রীঃ। ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন।

নন্দকুমার ন্যায়চঞ্চু ঃ নৈহাটি। ১৮৩৫খ্রীঃ জন্ম। পিতা রামকমল ন্যায়রত্ন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়েছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য 'ন্যায়চঞ্চু' উপাধি লাভ করেন। এছাড়া 'তর্করত্ন' উপাধিও পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হালিশহরের কথা
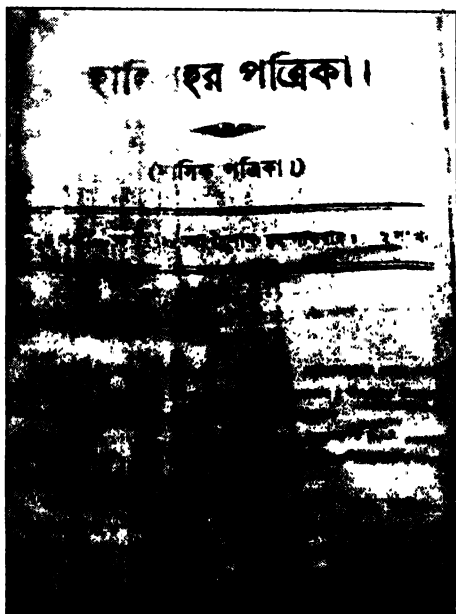
হালি হর পত্রিকা।

হালিসহর পত্রিকার প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যার, প্রথম পৃষ্ঠার লেখা (১২৭৮ বঙ্গাব্দ)

বিজ্ঞাপন

"হালিসহর পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পত্রিকা পাঠে কোন কোন পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন হালিসহর কোথায়? তাঁহাদের ঔৎসুক্য নিবারণ জন্য হালিসহর গ্রামের সংক্ষেপে বৃত্তান্ত লিখা হইল।

জিলা ২৪ পরগণার অধীন বারাসাত বিভাগের অন্তঃপাতি হুগলী নগরের পূর্ব্বপাড়ে ভাগীরথীর তীরে ঐ গণ্ডগ্রাম বিখ্যাত আছে। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে হালিশহর "কুমারহট্ট" নামে প্রসিদ্ধ। ...."

(সৌজন্য : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।)

হালিশহর-কুমারহট্ট

কানাইপদ রায়

সেকালের কুমারহট্ট একালের হালিশহর। বারাকপুর মহকুমার প্রাচীন জনপদগুলির অন্যতম কুমারহট্ট, একসময় ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বিপ্রদাস পিপিলাই'র 'মনসা বিজয়' কাব্যে (১৪১৭ শকাব্দ) চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা উপলক্ষে গঙ্গা তীরবর্তী যেসব জনপদের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে 'কুমারহট্ট'ও। এই কাব্যের রচনাকাল নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। বিপ্রদাস অবশ্য তাঁর পুথিতেই এই সময়কালের উল্লেখ করেছেন—

> ''সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
> নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান।।''

সিন্ধু = ৭ ইন্দু = ১ বেদ = ৪ মহী = ১

'অঙ্কস্য বামাগতি' এই নিয়মে গণনা করলে 'মনসা বিজয়' কাব্যের রচনাকাল ১৪১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ। আগে এরকম হেঁয়ালী করে সময়কাল লেখার প্রচলন ছিল। এই কাব্য লেখার সময় হুসেন শাহ ছিলেন গৌড়ের সুলতান।

কুমারহট্ট-হালিশহর যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে বেড়ে উঠেছে তা হ'ল 'হাবেলী শহর পরগণা'। ''রুকনুদ্দিন বরবক্ শাহের রাজত্বকালে (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) সপ্তগ্রামের অন্তর্গত লাউবলা নগরের প্রধান সেনাপতির সহকারী উলুগ আজমল খাঁ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। 'লাউবলা নগর' বর্তমানে সময়ে লাউপালা নামে পরিচিতি ও চব্বিশ পরগণা জেলার হাবিলি শহর পরগণায় অবস্থিত। এইভাবে আমরা সপ্তগ্রাম বন্দরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে হাবেলিশহর পরগণার সূত্রটি পেয়ে যাই। দিল্লীর আফগান সম্রাট ফরিদ্উদ্দিন শেরশাহ (১৪৭২-১৫৪৫ খ্রীষ্টাবদ) বাংলার খিজির খানকে পরাজিত করে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। পরে তিনি দিল্লী অধিকার করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সর্বপ্রথম জমি জরিপ করে সমস্ত বাংলাদেশকে ৪৭টি 'সরকারে' এবং সরকারকে 'পরগণায়' বিভক্ত করেন। এমন কি 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এখনো জমির দলিলে সম্পূর্ণ অঞ্চলটিকে হাবেলিশহর পরগণা বলেউ উল্লেখ করা হয়। আবুল ফজলের লেখা আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সপ্তগ্রাম সরকারের অধীন হাবেলিশহর মহল-এর উল্লেখ রয়েছে। প্রশাসনিক একক

হিসেবে পরগণা এবং মহল সমার্থক। সপ্তগ্রাম সরকার ৫০টি মহলে বিভক্ত ছিল। এদের মোট দাম ছিল কিঞ্চিদধিক চার লক্ষ সিক্কা টাকা। সদরমহালের সাতগাঁয়ের যে অংশটি গঙ্গানদীর স্রোত পরিবর্তনের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তাকে নিয়েও একটি পৃথক মহাল তৈরী হয়। নতুন মহালের নামকরণ হয় 'হাবিলিশহর মহাল'। পরবর্তী সময়ে জেলা, মহকুমা, চৌকি ইত্যাদি ভাগ করার সময় বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার উত্তর সীমান্তে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত মদনপুরের কাছে গঙ্গা থেকে নির্গত যমুনা নদীর খাড়ি থেকে পূর্ব রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনের দক্ষিণে নবাবগঞ্জের নোয়াই খাল পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তী গ্রামগুলি নিয়ে হাবেলিশহর পরগণা গড়ে ওঠে।" 'হাবেলি শহরের লৌকিক ধর্মে সংস্কৃতি ও সমাজ' — অলোক মৈত্র।

J. Grant ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে কর্ণওয়ালিসকে যে রিপোর্ট পাঠান তাতে ২৩টি পরগণার নাম করেন। এর মধ্যে ছিল হাবেলী পরগণা।

কুমারহট্ট-হালিশহরের পুরাবৃত্ত প্রসঙ্গে অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কুমারহট্ট-হালিসহর' গ্রন্থে লিখেছেন—"পালরাজত্বের শেষভাগে মহারাজ কুমারপাল এই স্থলে একটি পোতনির্মাণকেন্দ্র বা পোতাশ্রয় নির্মাণ করেন এবং তদবধি এতদঞ্চল তাঁহার নামানুসারে "কুমারহট্ট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কালক্রমে পালসাম্রাজ্যেও ভাঙন ধরিল। বঙ্গের বিভিন্ন অংশে সামন্তরাজগণ আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সুযোগ বুঝিয়া দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশাগত ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশজ সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পাল সাম্রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ স্বনামধন্য বিজয়সেন শূর বংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিশেষ বলশালী হইয়া উঠেন এবং ক্রমে গৌড়ের পালরাজকে পরাভূত করিয়া বাংলার একছত্র রাজরূপে প্রাধান্য লাভ করেন। এই সময়ে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম সন্নিহিত পোতাশ্রয় ও শ্রমিককেন্দ্র কুমারহাট্টের প্রসিদ্ধি প্রধানতঃ সামরিক প্রয়োজনেই আরও বিস্তার লাভ করে এবং নিম্নবঙ্গে প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ সামরিক তাৎপর্য্যপূর্ণ এই স্থানে মহারাজ বিজয়সেন তাঁহার বঙ্গদেশ অধিকারের প্রথমাবস্থায় অন্যতম রাজধানী বা নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নাম অনুসারে বৃহত্তর কুমারহট্ট "বিজয়পুর" নামে খ্যাতিলাভ করে।

বিজয়পুরের অবস্থান সম্পর্কে স্বভাবতই ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। কেহ কেহ ভুরশুট অথবা রাজসাহীর নিকটবর্তী "বিজয়নগরকে" বিজয়পুর বলিয়া নির্দেশ করেন; কিন্তু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রভৃতি প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ "বিজয়পুর" ত্রিবেণীর নিকটেই অবস্থিত ছিল বলিয়া দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ীর লিখিত কাব্য "পবনদূতের" উদ্ধৃতি অনুবাদ করিয়া রমেশচন্দ্র তাঁহার History of Bengal-এ লিখিয়াছেন ঃ—"The city of Bijoypur stood on the banks of the Ganges, in or near the world-sanctifying country,

where the Jamuna stand off from the Bhagarathi. This undoubtedly points to the region of Tribeni in the northern part of Hooghly District.''

উপরোক্ত প্রমাণ পরম্পরা ও ঐতিহাসিকগণের নির্দেশ অনুযায়ী ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীনকালে পূর্ববাহিনী যমুনার উপকূলস্থ ও ত্রিবেণীর সন্নিকটে হুগলীর উত্তরদিকে অবস্থিত বর্তমান কাঁচড়াপাড়া বিজাপুর ছিল প্রাচীন বিজয়পুর। বর্তমান বিজপুর নাম বিজয়পুরেই অপভ্রংশ। গঙ্গার উপকূলস্থ কুমারহট্ট-কাঞ্চনপল্লীর বহু প্রাচীন দলিল দস্তাবেজে এখনও ''বিজয়পুর মৌজার'' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হালিশহরের প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশধর ত্রিপুরা রাজ স্টেটের কর্মচারী সুসাহিত্যিক নীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী এইমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে বিজয়সেনের প্রতিষ্ঠিত বঙ্গের রাজধানী ''বিজয়পুরের'' পরিধি ছিল বর্তমান চক্রদহ হইতে এড়িয়াদহ পর্যন্ত এবং কুমারহট্ট, শিবদাসপুর, বিজনা, চেঁদো, মূলাজোড়, ইছাপুর প্রভৃতি ছিল ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন পল্লী বা উপনগর। এখনও এই বর্তমান কালেও নৈহাটীর অন্তর্গত দেলপাড়া, কাঁচরাপাড়া, সমগ্র হালিশহর, জেঠিয়া, বিজনা, শিবদাসপুর প্রভৃতি লইয়া Bijpur Constituency গঠিত এবং থানার নাম বিজপুর।

প্রাচীনকালে বিজয়পুরের অন্তর্গত কুমারহট্টের পরিধি কাঞ্চনপল্লী হইতে ইছাপুরের খাল পর্যন্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। প্রবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের পর এই অংশেরই নাম ''হাবেলীশহর পরগণা'' নামে খ্যাত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে সেনরাজত্বের পূর্বে এই অঞ্চল প্রধানতঃ বারুজীবী, নৌজীবী, কর্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার প্রভৃতি শ্রমিকগণের কর্মক্ষেত্রে বা উপনিবেশ ছিল। কুম্ভকারগণের শিল্প-প্রসিদ্ধির জন্য এই স্থানের নাম কুমারহট্ট এই প্রবাদ বহুদিবসাবধি প্রচলিত আছে। কিন্তু কুম্ভকারের অপভ্রংশ ''কুমার'' হইলে, ''হট্ট'' হাটা বা হাট হইত এবং ''কুমারহাটা'' হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ''কুমারহট্ট'' এই গুরুচণ্ডালী ভাষার মিশ্রিত নাম, অন্তত তখনকার দিনের সংস্কৃত ভাষাবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা রাখিতেন না। কাহারও কাহারও মতে পরবর্তীকালে শিক্ষাসংস্কৃতির সমৃদ্ধির সময়ে একস্থানে ব্যহু বহিরাগত বিদ্যার্থী কুমারগণের সমাবেশের জন্য ইহার নাম কুমারহট্ট। প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্যের গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এ স্থানে যে হাট বসিত, সেই নামানুসারে ''কুমারহট্ট'' নামের উৎপত্তি এই প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কুমারহট্টের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও, প্রথমোক্তটিই অধিকতর যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয়। পূর্বোক্ত ত্রিপুরা প্রবাসী নীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয় রাজকীয় পুঁথিশালার বিভিন্ন প্রাচীন ও দুর্লভ গ্রন্থাবলী হইতে কুমারহট্ট সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উক্ত গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তিনি এই মত পোষণ করেন যে পালরাজাগণের সময়ে এতদঞ্চল ছিল রাজা কুমার পালের নৌবিতান, জাহাজ নির্মাণের কারখানা ও পোতাশ্রয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যপর্তী স্থান এবং

শিল্পী ও নাবিক সম্প্রদায়ের উপনিবেশ বা বসতিকেন্দ্র এই উভয়বিধ কারণে এই স্থান নৌবিতান বা পোতাশ্রয়ের পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। কুমারপালের শ্রমিকহট্ট (Industrial area) বলিয়াই নাকি ইহার নাম হইয়াছিল "কুমারহট্ট"। .....

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 'কুমারহট্ট' নাম প্রসঙ্গে (সাপ্তাহিক বর্তমান ২১-১০-২০০০) লিখেছেন—

কুমারহট্ট নামটি এসেছে যে ঐতিহাসিক ঘটনায় সেটি বড় অদ্ভুত। একটি হল মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য গঙ্গা স্নানের জন্যে বহুলোকজন নিয়ে এই গ্রামে প্রতি বৎসরই আসতেন। সেই সময় মহাসমারোহ হত, হাট বসত, সেই হাট এক সময়ে স্থায়ী হয়ে গেল, জায়গাটির নাম হল কুমারহট্ট। দ্বিতীয় কাহিনী নবদ্বীপের পণ্ডিতরা এসেছেন, বিচার যুদ্ধ হবে। হালিশহরের পণ্ডিতরা বিচারের বদলে তাঁদের কৌশলে পরাস্ত করার ব্যবস্থা নিলেন। পণ্ডিতদের মহা সমাদরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হল। সেবার জন্যে একজন পরিচারিকা নিযুক্ত হলেন। সেই পরিচারিকার সঙ্গে একটি বালকও রয়েছে। ভোর হল। চতুর্দিকে কাকের কর্কশ চিৎকার—কাকা। ওই রমণী তাঁর ছেলেকে বললেন—কাক জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্মই হল কা কা করা। উত্তর শুনে বালকটি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে মায়ের কাছে এসে বললে—'মা তুই বল'। মা তখন পণ্ডিতরা যাতে শুনতে পায় এইরকম উঁচু গলায় বললেন—'শোন, তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিত্মানসাঃ।

'বয়ং কাকা বয়ং কাকা' ইতি জল্পন্তি বায়সাঃ।

কাকরা ভয়ে কা কা করছে, ওরে, সূর্যদেব অন্ধকার বিনষ্ট করে চারিদিক আলো করে দিচ্ছেন। আমাদের গায়ের রঙওতো কালো, সব কালো যদি আলো হয়ে যায় তাহলে আমরাও তো মরলাম। আয় আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে বলি, আমরা অন্ধকার নই আমরা কালো কাক—আমরা কাক, আমরা কাক।'

পণ্ডিতমশাইরা সেই মহিলাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—'তুমি এই শ্লোক কোথায় শিখলে?' পরিচারিকা বললেন—'কোথায় আর শিখব বাবাঠাকুর, বাড়ির পাশে টোল, পণ্ডিতরা ছাত্রদের পড়ান, শুনে শুনে শিখেছি।'

পণ্ডিতরা ভয়ে হালিশহর ছেড়ে চলে গেলেন। যেখানে সামান্য এক নীচ জাতির রমণীর এই পাণ্ডিত্য সেখানাকর পণ্ডিতরা না জানি কেমন! কুম্ভকার জাতির সেই রমণীর বুদ্ধির প্রশংসায় স্থানটির নাম রাখা হল কুমারহট্ট।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র দে মহাশয় তাঁহার "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" নামক গ্রন্থে ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে কুমারহট্ট-কাঞ্চনপল্লী উত্তরে যমুনা ও সরস্বতীর অঞ্চল 'ব' দ্বীপ যে নিম্নবঙ্গের অন্তর্গত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদ দুর্গস্থিত স্তম্ভের উপর যে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দিগ্বিজয়ের বর্ণনার ভিতর নৌযুদ্ধে এই নিম্নবঙ্গ জয়ের বিবরণ আছে। উত্তরকালে কাঞ্চনপল্লীর মাঝেরপাড়া অঞ্চলে রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুষ্করিণী খননকালে ভূগর্ভ হইতে সুপ্রাচীন কালের নিদর্শন নৌকা ও পোতের হাল মাস্তুল ও পোত নির্মাণের যন্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে এতদঞ্চলে বহু প্রাচীনকালেও নৌবিতান বা পোতাশ্রয়ের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ "কালপেঁচা" বিনয় ঘোষ মহাশয় যুগান্তর পত্রিকায় তাঁহার বঙ্গদর্শন শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে হালিশহর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"হালিশহর-কুমারহট্ট অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস মুসলমান-পূর্ব যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত একথা আগেই বলেছি। অন্ততঃ হিন্দুযুগের সেন আমল (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) পর্যন্ত বিস্তৃত, তাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হয় না। তারও আগে আরও কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হালিশহরের মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি আদিম বাসিন্দাদের ধর্মানুষ্ঠান, আচার ও উৎসব পার্বনের মধ্য থেকে তার আভাষ পাওয়া যায়। হালিশহরের শা-পুকুর থেকে খুঁড়ে পাওয়া পাথরের চতুর্ভুজ গণেশ মূর্তিটি সেন আমলের সাক্ষী দিচ্ছে মনে হয়।"

বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে হালিশহর-কুমারহট্টের প্রাচীনত্ব যে অন্ততঃ সেন আমল পর্য়ন্ত বিস্তৃত তাহা স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও তিনি বিজয়পুর বা বিজাপুরের পার্শ্ববর্তী অবস্থিতি এবং পূর্বতন ঐতিহাসিকগণের নির্দেশ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান এক্ষেত্রে করেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে পরে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী সম্বন্ধে আলোচনাকালে কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই কুমারহট্ট-হালিশহর অঞ্চলই বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর।

বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি পরবর্তী রাজগণও সময় সময় এই বিজয়পুর নগরে বাস করিতেন। লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি ধোয়ী তাহার পবনদূত নামক কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন পবনদেব লক্ষ্মণসেনের প্রণয়মুগ্ধা গন্ধর্বকন্যার দৌত্য স্বীকার করিয়া ভারতের দক্ষিণে মলয় পর্বত হইতে লক্ষ্মণসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হন এবং ভাগিরথী তার অনুসরণে উত্তর মুখে অগ্রসর হইয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে উপস্থিত হন; তৎপরে ত্রিবেণী পাশ্চাতে রাখিয়া যমুনা উপকূলস্থ বিজয়পুর নগরে উপস্থিত হন। ধোয়ীর বিবরণীর আক্ষরিক অনুসরণ করিলে বিজয়পুর যে তপনতনয়া যমুনা ও ভাগিরথীর সঙ্গমের অদূরে অবস্থিত ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নবদ্বীপ-নদীয়া বা রাজসাহী জেলার বিজয়নগরের সঙ্গে এক

এবং অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ধোয়ীর পবনদূত কখনও গঙ্গা অতিক্রম করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ নাই, কাজেই বিজয়পুর উত্তরবঙ্গে অবস্থিত হওয়া অসম্ভব। নবদ্বীপ-নদীয়া ত্রিবেণীর অনেক উত্তরে। পবনদূতের বর্ণনা অনুসারে বিজয়পুর ত্রিবেণী হইতে এতদূর হইতে পারে।"

ধোয়ী কবির উপরোক্ত কাব্যাংশ হইতে ইহাও জানা যায় যে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের আমলেও এক রাজধানী অন্যত্র থাকা সত্ত্বেও, বিজয়পুর যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল এবং রাজগণও প্রায়ই বিজয়পুরে অবস্থান করিতেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষের দিকে বঙ্গে প্রথম মুসলমান অভিযান আরম্ভ হয় এবং লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ ও পরে বিক্রমপুরে সরিয়া যান। সেন রাজগণের অধীন সামন্তরাজ শত্রুজিতের বংশীয় কোনও রাজার শাসনকালে ১২৯৮ সালে জাফর খাঁ সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। ১৮৯৮ সালে আরব ভাষায় লিখিত শিলালিপির বর্ণানানুযায়ী জানা যায় যে সপ্তগ্রাম বিজয়ের পর মুসলমান বহু হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করেন ও হিন্দু কাফেরদিগকে তরবারি বা বল্লম দ্বারা সপ্তগ্রাম হইতে বিতাড়িত করিতে থাকেন। সেই সময়েই সপ্তগ্রামের অধিকাংশ ধনী ও সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শ্রেষ্ঠী, বণিক প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায় ভাগীরথীর পরপারে কুমারহট্ট অঞ্চলে পলায়ন করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। এইভাবে ক্রমশঃ সপ্তগ্রামের হিন্দু সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প কুমারহট্টে স্থানান্তরিত হয় (migrated) এবং কুমারহট্ট প্রসাদ, সৌধমালা, দেবালয়, মন্দির প্রভৃতিতে আরও সুসজ্জিত হইয়া বৃহত্তর কুমারহট্ট রূপে গড়িয়া উঠে। এই সময়েই মুসলমান শাসকগণ সপ্তগ্রামকে সাতগাঁও সরকার ও কুমারহট্টকে হাবেলীশহর[১] (City of Hauli or Palaus) পরগণায় পরিণত করেন।

Hunter A Statistical Account of Bengal (1875) গ্রন্থে 'হাবেলী শহর' এই নামটিই উল্লেখ করেছেন— "Havilishahar : area, 36,350 acres, or 56.80 square miles; 174 estates; Subordinate Judge's Court at Barasat. This Fiscal Division is situated north of Calcutta, and is bounded on the north by Nadiya District, on the east by Ukhra Fiscal Division, on the South by Anwarpur and Calcutta Fiscal Division. A thickly populated *Pargana*; rice, jute, sugar-cane, and cold weather crops of pulses and oil-seeds, being the chief produce. The principal villages are Naihati, Havilishahr, Ichapur, Samnagar, Bhatpara, and Kanthalpara,. A portion of this Fiscal

১। ফার্সী শব্দ হাবেলির অর্থ, প্রাসাদ।

Division is situated in Nadiya District.''

হান্টারের লেখায় 'হাবেলী শহর' নামটির উল্লেখ থাকলেও এর কিছুকাল পূর্বেই 'হালিশহর' নামের প্রচলন লক্ষ্য করা গেছে। দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধনী' কাব্যে (১৮৭১) লিখেছেন—

'বামে হালিশহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য-গীত হয়।

L. S. S. O' Malley তাঁর Bengal District Gazatteers–24 Parganas (1914) গ্রন্থে 'হালিশহর' এই নামটি ব্যবহার করে লেখেন ''Halishahar : Town in the Barrackpore sub-division, situated on the bank of the Hooghly, 26 miles north of Calcutta, with which it is connect by the Eastern Bengal State Railway. Its population in 1911 was 13m423. It was formerly part of Naihati, but was constituted a separate municipality in 1903. The Municipal income is raised by a tax on persons, which is assessed at 10 annas per hundred rupees of income; latrine fees are also levied at the rate 5 per cent on the annual value of holdings. The mmunicipality maintains a dispensary for out-door patients; there is also a high school and a Bench of Honorary Magistrates. Kanchrapara, a village containing the Locomotive and Carriage Works of the Eastern Bengal State Railway, is within municipal limits.''

কুমারহট্ট-হালিশহরের চৈতন্যদেবের আগমন এবং তাকে ঘিরে যে চৈতন্য পার্ষদ গড়ে উঠেছিল তাদের ভূমিকা অসামান্য। শ্রী চৈতন্য বাংলার সমাজ জীবনে ভক্তি রসের যে প্লাবন নিয়ে এসেছিল তার জলাধার অবশ্যই কুমারহট্ট। কুমারহট্ট নিবাসী ঈশ্বরপুরীর শ্রী চৈতন্যকে দীক্ষা দানই 'নিমাই'কে যে মহাপ্রভুতে রূপান্তর ঘটিয়েছিল। একথা অবশ্যই বলা যায়। চৈতন্যদেবের সময়ে কুমারহট্টে ছিল অনেক চৈতন্যপার্ষদের আবাস। সেসময় কাঞ্চনপল্লীরও বেশ কিছু অংশ কুমারহট্টের মধ্যে ছিল। উল্লেখযোগ্য চৈতন্যপার্ষদ হলেন শিবানন্দ সেন, শ্রীনাথ পণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখ। 'কবি কর্ণপুরের বিবরণ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্যদেব কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে ২/১ দু-একদিন অবস্থান করে কার্ত্তিকের চতুর্দশী বা অমাবস্যায় ঈশ্বরপুরীর ভিটা হয়ে শিবানন্দের গৃহে ক্ষণকাল অবস্থানের পর মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তের গৃহে পদার্পণ করেন। মহাপ্রভুর কুমারহট্টে অবস্থানকালে মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ভক্ত শিষ্য এ স্থানে সমবেত হয়ে পদাবলী কীর্তন, নগর সংকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কুমারহট্ট অঞ্চলকে মুখরিত

করে তুলেছিল।

■ ঈশ্বরপুরী

ভারত বিখ্যাত মাধবেন্দ্রপুরীর বঙ্গদেশস্থ দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম ঈশ্বরপুরী কুমারহট্ট'র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্যামসুন্দর আচার্য। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে ঈশ্বরপুরী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। সেখানেই নিমাই'র রূপ গুণ পাণ্ডিত্য দেখে তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনে এবং তাঁকে বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হন। ঈশ্বরপুরী স্বরচিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নিয়ে নিমাই'র সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে নিমাই তাঁকে ব্যাকরণের দোষ ধরলেও, তাঁকে পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্য দেখালেও ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর তাঁর মধ্যে ভক্তিরস সঞ্চার হতে থাকে। ঈশ্বরপুরী নিমাই'র ঔদ্ধত্যে আহত না হয়ে বরং আনন্দিত মনে তাঁর মধ্যে অবতারের লক্ষণগুলি লক্ষ্য করে নবদ্বীপ ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বিবাহের কিছুকাল পরে নিমাই পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গয়ায় গমন করলে সেখানে বিষ্ণুপাদ মন্দিরে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে—

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।/আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেইস্থানে।।

ঈশ্বরপুরীকে গয়ায় পেয়ে নিমাই বললেন, গোঁসাই, তুমি ভবসাগর থেকে আমাকে উদ্ধার কর। শুভক্ষণে ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। কুমারহট্টের এই আচার্যের দীক্ষা দান সমগ্র ভারতের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিপ্লবের সূচনা ঘটাল। চৈতন্য বোঝাতে চাইলেন—কৃষ্ণপ্রেম আর জীবপ্রেম একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ—প্রেমই হল প্রকৃত ধর্ম— God is love and love is God চৈতন্য নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন করলে সকলে তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন—তাঁর মধ্যে নেই পাণ্ডিত্যের ঔদ্ধত্যভাব, সবসময় নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে নয়নজলে ।

এরপর নিমাই ১৪১৩ শকাব্দের মাঘ মাসে কাটোয়ায় গিয়ে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নিলেন—

চব্বিশ বৎসর শেষে সেই মাঘ মাস।/তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন দেখা দিল চৈতন্যের মধ্যে। ঈশ্বরপুরীর জীবনাবসানের পর ভারতপরিক্রমা শেষে পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের বাড়ি হয়ে কুমারহট্টের গুরুপীঠ দর্শনে এসে চৈতন্য গুরুর ভিটায় গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। প্রত্যাবর্তনকালে বর্হিবাসে ঐ স্থানের পবিত্র মৃত্তিকা বেঁধে নিলেন। ভক্তবৃন্দ চৈতন্যের দেখাদেখি মৃত্তিকা গ্রহণ করায় সেইস্থানে ডোবার সৃষ্টি হয়। যা চৈতন্য ডোবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

"ভারত ভ্রমণ কালে নিমাই চৈতন্য।
গুরুর ভিটায় আসি হইলেন ধন্য।।

প্রভু বোলো কুমারহট্টের নমস্কার।
শ্রীঈশ্বর পুরী যে গ্রামে অবতার।।
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বর পুরী বিনে।।
সেই স্থানে মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বান্ধি এক ঝুলি।।
প্রভু বোলো ঈশ্বর পুরীর জন্ম স্থানে।
এ মৃত্তিকা মোর জীবন ধন প্রাণ।।”

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত

■ শ্রীবাস পণ্ডিত

শ্রীবাস পণ্ডিত ছিলেন চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ। নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট দু জায়গাতেই শ্রীবাসের গৃহ ছিল। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীবাস কুমারহট্টে বসবাস করতে থাকেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের আদি বাড়ি শ্রীহট্ট। পিতা জলধর পণ্ডিত শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ এসেছিলেন। জলধরের পাঁচটি পুত্র—নলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। নলিন পণ্ডিতের কন্যা নারায়ণী। বৈকুণ্ঠনাথ হল নারায়ণীর স্বামী। এঁদেরই পুত্র হল শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীবাসের চার ভাই নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট উভয় স্থানেই থাকতেন—

অধিকসময় নবদ্বীপে করয়ে বসতি।/কখনও কখনও কুমারহট্টে করে অবস্থিতি।।

চৈতন্যের মা'র সঙ্গে শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবীর অন্তরঙ্গতা থাকার জন্য শ্রীবাস প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন।

গয়া থেকে ফিরে এসে চৈতন্যের মধ্যে প্রেমোন্মাদনা দেখা দিল—

কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ মাত্র প্রভু বলে।/আর কোন কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে।।

এই অবস্থা দেখে লোকে বলতে শুরু করল 'পূর্ব্বেকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।/দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে।।

শ্রীবাসই বুঝতে পারলেন এ বায়ু রোগ নয়, এ হল কৃষ্ণপ্রেম, নিমাই'র উপর কৃষ্ণের সম্পূর্ণ কৃপা পড়েছে। শ্রীবাস একদিন ঠাকুর ঘরে বসে নৃসিংহদেবের ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে কে রুদ্ধদ্বারে লাথি মারতে থাকে—

কাহারে বা পুজিস্ করিস কার ধ্যান।/যাহারে পুজিস্ তারে দ্যাখ বিদ্যমান।।

জলন্ত অনল যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। /হইল সমাধি ভঙ্গ চাহে চারি ভিত।।

দ্বার খুলতেই নিমাই ঘরে ঢুকে বিষ্ণুর আসনে যে শালগ্রাম শিলা ছিল তা সরিয়ে নিজে তার উপরে বসলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত স্তম্ভিত, দেখলেন—চারহাতে শঙ্খ, চক্র গদা এবং পদ্ম। নিমাই বলল—শ্রীবাস সাধুজনের উদ্ধার আর দুষ্টের দলনের জন্য আমি অবতার রূপ গ্রহণ করেছি ঃ তুমি আমাকে অভিষেক কর। নিমাই'র অনুমতি নিয়ে

পরিবারের অনেকেই গৃহে প্রবেশ করে সেই দৃশ্য অবলোকন করতে লাগল। নিমাই সেই অবস্থায় শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা চারবছরের নারায়ণীকে ডেকে বললেন—তোমার কৃষ্ণপ্রেম হোক।

পুরী থেকে ফিরে মহাপ্রভু শ্রীবাসের কুমারহট্টের গৃহে আতিথ্য গ্রহণকালে তাঁর দারিদ্র্য দেখে মহাপ্রভু আশীর্বাদ করে বললেন—লক্ষ্মীদেবীকেও যদি ভিক্ষা করতে হয়, তোমাকে কখনও দারিদ্র্য ভোগ করতে হবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কুমারহট্টে সম্পর্ক বিষয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কুমারহট্টের পার্ষদদের ভক্তিরস নিমাইকে মহাপ্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল এবং বৈষ্ণব ধর্মের যে প্লাবন ভারতবর্ষকে ভাসিয়েছিল তার জলাধার এই কুমারহট্ট।

শৈব, শাক্ত আর বৈষ্ণবদের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরায় কুমারহট্ট গৌরবান্বিত। হলিশহরের শিব মন্দিরগুলি সেই সময়কার কুমারহট্টে শৈবধর্মের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরজুড়ে অসাধারণ টেরাকোটার কাজ সেকালের মৃৎশিল্পীদের উৎকর্ষতার নিদর্শন, যা কিনা আজ ধ্বংসের মুখে। সেনবংশীয় রাজারা শৈবধর্মী হওয়ায় শিব মন্দিরের প্রাচুর্য থাকবে বলাই বাহুল্য। সেনবংশে তাম্রশাসনেও 'ওম্ নমঃ শিবায়ঃ' এরকম মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়।

হালিশহরের গোড়া শাক্ত সাবর্ণ চৌধুরি পরিবারদের আদিপুরুষ পাঁচু শক্তির হাবেলি শহর পরগণার আধিপত্য লাভ করে কুমারহট্টে এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করলে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিতরা সেখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। এই বংশে বিদ্যাধর চৌধুরির (১৬৪০-১৭২০খ্রীঃ) সময়েই হাবেলী পরগণা হাতছাড়া হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী সাবর্ণ চৌধুরি বংশের গোবিন্দ চৌধুরির কন্যা।

শাক্ত কবি রামপ্রসাদের আবির্ভাব হালিশহরকে করেছে অনন্য। সমগ্র হালিশহরেরই প্রসাদময়। রামপ্রসাদের 'মানবজমিন' এতদিন পরে 'মানবসম্পদ' হিসেবে গণ্য হয়েছে আমাদের সংসদে।

রামপ্রসাদের সময়ে আর একজন কবি আঁজু গোঁসাইকে আমরা ভিন্নভাবে পেয়ে থাকি।

■ রামপ্রসাদ ও আঁজু গোঁসাই

ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে আসলে রামপ্রসাদ আর আঁজু গোসাইকে একত্রে করে শাক্ত ও বৈষ্ণবে চাপান উতর একসঙ্গে উপভোগ করতেন। তবে আঁজু গোসাই কখনও কখনও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতেন। শাক্তকবি রামপ্রসাদের পরিচয় যেভাবে আমরা পাই আঁজু গোসাইকে সেভাবে পাই না। কেউ বলেন তাঁর প্রকৃত নাম অযোধ্যনাথ, কেউ বলেন রাজচন্দ্র বা রাজু, বিকৃত হয়ে আঁজু। হালিশহরে শিবের গলিতে বসবাস করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

রামপ্রসাদের সঙ্গে তাল রেখে যেভাবে গান রচনা করতেন তা যে আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে তা বলাই বাহুল্য এবং সেকারণেই আঁজু গোসাইকে একজন প্রতিভাধর কবি বলতে আপত্তি নেই। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক গান প্যারোডি জাতীয় হলেও স্বরচিত পদ হিসাবে কালোত্তীর্ণ। সাম্প্রতিককালে তাঁকে নিয়ে লেখালেখি এক বড় প্রমাণ।

রামপ্রসাদ আর আঁজু গোঁসাই'র লড়াই বহু পদে ছড়িয়ে আছে
একবার তীর্থে যাবার কারণ দেখিয়ে রামপ্রসাদ গান ধরলেন —
কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্যরাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জ্ঞান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী।
আঁজু গোসাই এর উত্তর গাইলেন —
পেসাদ তোর যেতে হবে কাশী।
ওরে তথায় গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী।
ঘরে বসে থাকিস্ যদি, ধরবে তোরে যক্ষ্মা কাশী।
এই বেলা নে তলপী বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি।

বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদ সন্তানের জনক হলে রামপ্রসাদের একটি গানের উত্তরে আঁজু গোসাই একটি সুন্দর গান রচনা করলেন—
রামপ্রসাদ গাইলেন —
এই সংসার ধোঁকার টাটি
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি।।
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু, জল, শূন্যে এত পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অলঙ্কারে লক্ষ কোটি।............
এর উত্তরে আঁজু গোসাই জবাব দিলেন
এই সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি।।
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন মন কররে পরিপাটি।
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি।.................

আর একবার রামপ্রসাদ গাইলেন —
আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যোষ্ঠপুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি।।
আঁজু গোসাই এর উত্তরে গাইলেন—
কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারো কথায় যাস্‌নেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি।।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে হোতে পারিস্ মাঝগাঙ্গেতে ভরাডুবি।।..

রামপ্রসাদের বিখ্যাত পদ "আমায় দাও মা তবিলদারী"। '
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।।
এর উত্তরে আঁজু গোসাই গাইলেন,
"কেনে চাস্ ভাই তবিলদারী,
ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি।

এধরনের বহু পদ আঁজু গোসাই তৈরি করেছেন। দুজনের লড়াই সেকালের সেই অঞ্চলের মানুষ যে ভীষণভাবে উপভোগ করত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে তাঁদের সম্পর্কও ছিল মধুর। আঁজু গোসাই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না গেলেও রামপ্রসাদকে আমরা সমন্বয়ের কবি বলে জানি, সেদিক থেকে রামপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে মধুর ছিল তা ভাবা যেতেই পারে।

রামপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েকবছর পরে হলিশহরের কোণা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রানী রাসমণি (১২০০ বঙ্গাব্দ)। অকাল বৈধব্যে বিচলিত না হয়ে তাঁর তেজস্বিতা আর কৃচ্ছ্রসাধনে নির্মিত দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন মহীয়সী। শোনা যায় তিনি হালিশহরেই নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

তথ্যসূত্র : (১) শ্রী অমিয় নিমাই চরিত—মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, (২) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (৩) যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, (৪) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবন দাস, (৫) কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চবিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ ১৯৫৪—গুডউইল ফ্রেটারনিটি।

লেখক পরিচিতি : লেখক

দর্পণে হালিশহর ঃ সাহিত্যের আঙিনা

কৌন্তেয় শাণ্ডিল্য

এক

হালিশহর, এবং তার সাহিত্যভাবনার সন্ধান—এই দুই আপাতবিরোধী বস্তুদুটির মধ্যে অন্বয়নির্মাণ দুরূহক্রিয়া, সন্দেহ নেই। প্রথমত, বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগণা জিলার উত্তরপ্রান্তের সীমারেখার প্রায় প্রান্তীয় মফঃস্বল শহরতলী হালিশহর, এবং দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের কোনো একটি নির্দিষ্ট কালসীমা ব্যতীত হালিশহরের দান বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে তেমন পরিচিতিমাত্রা অর্জন করতে পারে নি। অথচ সাহিত্যচর্চার বেলাভূমিতে বর্তমানের এই ক্ষুদ্র শহরটির ভূমিকা বিশেষ মনোযোগ দাবি করতে সক্ষম।

দুই

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, প্রাচীন হাবেলিশহর পরগণার মুখ্যকেন্দ্র হিসাবে শহরটি কুলীন। মোগল শাসনকালেই কুমারহট্ট গ্রাম হালিশহর নামে পরিচিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগের কবিকুল তাঁদের কাব্যে এ শহরের উল্লেখ করেছেন। বাহুল্যবোধে কেবল কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। বণিকখণ্ডে ধনপতি সদাগরের সিংহলে বাণিজ্যযাত্রার পথ বর্ণনায় কবিকঙ্কণ হালিশহরকে মর্যাদাসম্পন্ন অঞ্চল বলেই উল্লেখ করেছেন ঃ

উলাত বাহিয়া কিসিমার পাশে পাশে।/মায়াপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে।।
বামদিকে হালিয়া সহর দক্ষিণে ত্রিপিনি।/দুকুলের তপজপ কিছুই না শুনি।।

আবার ধনপতিপুত্র শ্রীমন্ত যখন পিতৃ-উদ্ধারে সিংহল যাত্রা করেন, সে বর্ণনার মধ্যেও হালিশহর অনুপস্থিত নয় ঃ

লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।/বাস তিল হেম ধেনু কেহো করে দান।।
রজতের সিপে কেহো করয়ে তর্প্পন।/গর্ভের ভিতরে কেহো করয়ে মণ্ডন।।।
শ্রাদ্ধ করে কোন লোক জলের সমিপে।/সন্ধ্যাকালে আসি কেহো দেয় ধূপদীপে।।

উপরিউক্ত বিবরণ সঙ্গতভাবেই ত্রিবেণী সম্পর্কিত। কিন্তু যে দৃশ্যপটটি এখানে রচিত তা হালিশহর থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গাতীরের, এ বিষয়ে সংশয় জাগে না। বিশেষত, কবিকঙ্কণের কাব্যের রচনাকাল কোনোমতেই ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে

নয়; এবং তার পূর্বেই মধ্যযুগের বাংলা সংস্কৃতির যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব হালিশহরে পদার্পণ করেছেন।

উপরিউদ্ধৃত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে মধ্যযুগেই হালিশহর এক বর্ধিষ্ণু জনপদে রূপান্তর পেয়েছিলো। বর্তমানের মাপকাঠিতে বিচার না করলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে হালিশহর যথার্থ অর্থেই এক নগর ছিল। পার্শ্ববর্তী দুই জনপদের নাম বিচার করলেও এই ধারনাই বলবতী হবে,—উত্তরে কাঞ্চনপল্লী, ও দক্ষিণে নইহাটি (কবিকঙ্কণ দ্রষ্টব্য)। কাঞ্চনপল্লী পল্লী মাত্র এবং নইহাটি নতুন বসা হাট অঞ্চল (হাটের চেয়েও আয়তনে ক্ষুদ্র, নচেৎ নামটি নইহাট অথবা নইহাটা হতো)। এ আলোচনায় আরো একটি সত্যের ইঙ্গিত পাই,—হালিশহরের মেধাজগত নাগরিকমননে ঋদ্ধ ছিল। লোকজ সংস্কৃতির উচ্ছ্বাস এখানকার সাহিত্যে কখনো উদ্ভাসিত হয়নি। হালিশহরকেন্দ্রিক সাহিত্য আলোচনায় এই নাগরিকমনস্বিতার বৈশিষ্ট্যটিকে কখনো বিস্মৃত হলে চলবে না। সেটিই এই অঞ্চলের সাহিত্যের চলনগতি।

তিন

প্রশ্ন উঠতে পারে, হালিশহরের সাহিত্য আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন কেন? বঙ্গ সাহিত্যের রাজপথে নিত্য যাঁদের আনাগোনা, তাঁরা নিজ প্রয়োজন ও কর্মের চাহিদা অনুসারে হালিশহরের স্থান ও দান নির্ণয় করেছেন। আচার্য সুকুমার সেন তাঁর মহাগ্রন্থ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', এবং আচার্য অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপুলায়তন অনন্যসৃষ্টি 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করলেও সমগ্র বাংলার সাহিত্যরচনার ইতিবৃত্ত গ্রন্থনে তা আঞ্চলিক সাহিত্য আলোচনাও অপরিহার্যতা দাবি করে। প্রতিটি অঞ্চলের খুঁটিনাটি বিবরণহীন তথ্য যেমন সম্পূর্ণতার আকার পায় না, বিবরণ সম্পূর্ণ করাও এক বিরাট সমস্যা। সময় ও শ্রমসাধ্যতো বটেই, আলোচনার ব্যাপকতাও যে বিশালাকার আয়তন দাবি করে, বাস্তবতার খাতিরেই তা মেনে চলা সম্ভব হয় না। সেহেতু প্রয়োজন আঞ্চলিক ভূগোলের সীমারেখা ধরে নির্দিষ্ট অঞ্চলের সাহিত্যপরম্পরা গ্রন্থিবদ্ধ করা।

চার

ষোড়শ শতক বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণযুগ। সৃষ্টির জোয়ারে তখন বাংলাদেশ ভেসে চলেছে। এ যুগেই বাংলার নবজাগরণের প্রথম পুরোহিত দিব্যজ্যোতি ভাগবতীতনু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব নদীয়ায়। তিনিই এদেশে প্রথম বিকাশশীল মানবিকতার উদ্বোধন ঘটালেন, রাজা রামমোহন নন। আমরা তাঁকে একঘরে করেছি ধর্মমাষণার সঙ্কীর্ণপথিক আখ্যা দিয়ে। আজকের বাঙালি মানসিকতার অবক্ষয়ের কারণ হিসাবে বিষয়টিকে মনে রাখার প্রয়োজন।

সেই মহাপুরুষ হালিশহরে ভাগীরথী তীর সংলগ্ন কুমারহট্টে পদার্পণ করেছিলেন। এখানেই ছিলো তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান আজও সুচিহ্নিত হয়ে আছে চৈতন্যডোবা নামে। ঈশ্বরপুরী ছিলেন দক্ষিণ-ভারতীয় বৈষ্ণব ভাবানুসারী নৈয়ায়িক দার্শনিক। তাঁর কোনো রচনা বা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে মনে হয় দক্ষিণভারতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রামানুজ সম্প্রদায়ের মঠগুলিতে, উড়িষ্যার বিষ্ণুভাবাপন্ন মন্দিরগুলির সংরক্ষিত পুঁথিগুলিতে, বা বৃন্দাবনের মন্দিরে রক্ষিত পুঁথিভাণ্ডারে অনুসন্ধান করলে তাঁর রচনার হদিশ পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

শ্রীচৈতন্যের পুণ্যাবির্ভাব বাংলাদেশ মাতিয়ে তুললো। কিন্তু আমরা দেখি, হালিশহরে তাঁর প্রভাব দিগবিস্তারী হয়ে উঠলো না। অথচ প্রান্তীয় কাঁচরাপাড়ায় নদীয়াচাঁদের স্নেহ অর্জন করলেন পরমানন্দ সেন কবি কর্ণপুর। সংস্কৃতে রচনা করলেন শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলা—নাটক "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" এবং কাব্যে জীবন ইতিহাস "চৈতন্যচরিতামৃত—মহাকাব্য"। যুগমহিমাধবের দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ পেলো কবি কর্ণপুর বিরচিত "গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়"। মহাপ্রভুর অপর জীবনীকার "চৈতন্যভাগবত" প্রণেতা বৃন্দাবন দাসের বাড়ি নৈহাটির কাছে এক গ্রামে।

মনে হতে পারে, উক্ত দুই কবির (কবি কর্ণপুর ও বৃন্দাবন দাস) নামোল্লেখ হালিশহরের সাহিত্য-অনুশীলনের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্কিত নয়। বাস্তবে শ্রীচৈতন্যকালপর্বে হালিশহরের মননজগতের রহস্যবিচারে তাঁদের উল্লেখ অত্যন্ত জরুরী। শ্রীচৈতন্যপ্রভাব স্বযুগে হালিশহরে সামান্য, যদিও তিনি স্বয়ং এ ভূমিতে পা ফেলেছিলেন। ষোড়শ শতকে হালিশহরের বৌদ্ধিক কেন্দ্রগুলি অধিকার করে রেখেছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য সমর্থকেরা। হালিশহরের প্রাচীন নাম কুমারহট্ট কুম্ভকার শ্রেণীর বসতি নয়,—এটি সরলীকরণ। বস্তুত, কুমারহট্ট ছিলো ব্রাহ্মণকুমারদের ব্রহ্মচর্যাবস্থায় শিক্ষালাভ কেন্দ্র। ব্রাহ্মণবালকেরা এখানে গুরুগৃহে থেকে হিন্দুপঞ্চশাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। এখনও পণ্ডিতপাড়া, ঠাকুরপাড়া প্রভৃতি নামে গুরুকূলের ভগ্নাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। যাই হোক টোল চতুষ্পাঠি যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধারার কয়েকটি শাখাও এখানে বাস করতেন। এখনও পণ্ডিতপাড়া, ঠাকুরপাড়া প্রভৃতি নামে গুরুকূলের ভগ্নাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। যাই হোক, টোল চতুষ্পাঠি যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। দক্ষিণভারতীয় ব্রাহ্মণ্যধারার কয়েকটি শাখাও এখানে বাস করতেন। এঁরাই ছিলেন সমাজের মাথা। বেদবিদ্রোহী শ্রীচৈতন্যের "অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বকে" এঁরা সহজে স্বীকার করতে চান নি। এ প্রসঙ্গে ডঃ ক্ষেত্র গুপ্তের মন্তব্যটি যোগ করতে পারি ঃ

'চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন ব্রাহ্মণ্যপ্রথার কাঠিন্য অনুসরণ করেনি।

বৈরীমার্গের স্থানে রাগমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার, হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ অথবা 'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে মোর ঠাকুর' মন্ত্রোচ্চারণে এই ভাবান্দোলন ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে অনেকখানি অস্বীকার করেছিল'। (দ্রঃ বাংলা সহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, পৃঃ ১০০-১০১, গ্রন্থনিলয় প্রকাশনা ১৯৯৬)।

স্বভাবতই সঙ্কীর্ণমণা ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের উদার মানবিকতার তত্ত্বকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করে নি; বরং অবদমন করতে চেষ্টা করেছেন; এবং অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য হলেও তাঁরা সফল হয়েছিলেন হালিশহরে। ষোড়শ শতকের ঐশ্বর্যপর্বে হালিশহরের মতো শিক্ষায় প্রাগ্রসর অঞ্চলে কোনো বৈষ্ণবসাহিত্য সৃষ্টি না হওয়া তা প্রমাণ করে। তবু, আমাদের মনে হয়, খুব গোপনে হলেও বৈষ্ণবরসতত্ত্বের সাধনা কিছু হয়েছিল। কেননা কিছুকাল পরেই হালিশহর অঞ্চলে বৈষ্ণব বিস্ফোরণ ঘটে যায়। এমন ঘটনা পূর্ব প্রস্তুতিবিহীন কাকতলীয় হতে পারে না। শ্রীপাট(খড়দহ), কাটোয়া, নবদ্বীপ, মায়াপুর, শান্তিপুর, কালনা প্রভৃতি বৈষ্ণব কেন্দ্রগুলিতে, এমন কি কলকাতার বনেদী বাড়িগুলির নিজস্ব ভাণ্ডার (এদের পূর্বপুরষেরা হালিশহরে স্থায়ীভাবে বাস করতেন) ভাণ্ডারের অনুসন্ধানে হয়তো আকস্মিকভাবে কোনো লুপ্ত মণিরত্নের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

পাঁচ

সপ্তদশ শতকে চৈতন্যপ্রভাবে বাংলাসাহিত্যে দিকপরিবর্তিত যে ধারা লক্ষ্য করা যায়, সে নদীস্রোতে হালিশহরের মুখ্য বা গৌণ সব আয়োজনই শূন্য। দীর্ঘকালীন ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের অবসান ঘটেছে, তার স্থান দখল করেছে শাক্তভাবনা। বৈষ্ণবপ্রাধান্যও জেগে উঠেছে। নগরটি যথার্থ অর্থেই শাক্ত ও বৈষ্ণবমতের কূট-কচলিতে পূর্ণ। যদি এই দুই পরস্পরবিরোধী মতদ্বৈধতার তাত্ত্বিক নির্দশন তাঁরা রেখে যেতেন, তবে তৎকালীন সামাজিক চিত্রটির একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল পাওয়া যেতো। আরো অনুমিত হয়, পরগণার মুসলিম শাসকেরা শাসন ও প্রজাকল্যাণের সাধারণ সূত্রগুলি অস্বীকার করে শোষণের নিয়মগুলিকে সার্বজনীন করে তুলেছেন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও শাক্ত ও বৈষ্ণব যুযুধান এই দুই সম্প্রদায়ে বিরোধ প্রায়শই রক্তপাতী দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়েছে। শ্যাম ও শ্যামার মধ্যে অভিন্নতা সন্ধানের ঐক্যপ্রয়াসী চেতনার উন্মেষ তখনো ঘটে নি।

ছয়

অষ্টাদশ শতকেই মানচিত্রের পরিবর্তন ঘটলো। উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধ তখন আর ততো তীব্র নয়। পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রায় পঞ্চশীল নীতি জনমনে গৃহীত হয়ে গেছে। অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশে ব্যাপ্ত অবক্ষয়, অথচ এ সময়েই সৃষ্টির আঙিনায়,

বাংলাসাহিত্যের নেতৃত্বের আসনে হালিশহর। ষোড়শ শতকে যে বৈষ্ণব পদাবলী মননের উচ্চাসনে নিজেকে আসীন করেছিলো, বহুব্যবহারে জীর্ণ হয়ে, অযোগ্য কবিকুলের অদক্ষ অনুকরণে তার সৌন্দর্যম্লান। মেধা নির্ভর তত্ত্বঠাসা নীরব বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বাঙালিমানস যখন শ্যামল সবুজ কোনো শষ্পভূমি খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখনই বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিময়তার অন্তঃস্তল থেকে জন্ম দেবী কালিকা-নির্ভর শাক্ত পদাবলী। বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত নতুন ভাবরসে সিক্ত হল। বাঙালি মানসচেতনার এই ভাবনবিপ্লবের পশ্চাতে অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল শ্যাম-শ্যামার অভিন্ন রূপকল্পনা। আবার এই বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের চালনশক্তি যার হাতে উঠে এল তিনি হালিশহরের মহান প্রতিভা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মধ্যযুগের সমাপণপর্বের শ্রেষ্ঠ কবি দুজন—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। প্রথমজন ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর সভাকবি। রামপ্রসাদ পেয়েছিলেন নদীয়া অধিপতির পৃষ্ঠপোষণা। সে যুগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমাদার লাভ প্রতিভার শিখরে অবস্থান না করলে সম্ভব ছিল না।

বাল্যবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ, সামাজিক অসঙ্গতি, শোষণ, অত্যাচার ধর্মীয় উন্মাদনা, এককথায় সমাজশরীরের যা কিছু দুর্বহ, দুঃসহ, হলাহল, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমৃতকলম পূর্ণ করে কবি পরিবেশন করলেন বাঙালির রুচির পাতে। সহজ উপমা, সরল বুনোট, কিন্তু নাগরিক বৈদগ্ধ্যের প্রাখর্যে তাঁর গীতিকবিতাগুলি সমুজ্জ্বল, সমাজতাত্ত্বিক গবেষকের দৃষ্টিতে তিনি গৌরীদানের অসামঞ্জস্যে ব্যথিত হয়েছেন। আধুনিককালে যাকে আমরা স্রষ্টার দায়বদ্ধতা অভিহিত করি, সে যুগে দায়বদ্ধ লেখকের ভূমিকা তিনিই প্রথম পালন করেছেন। একটি গানে দেখতে পাই ঃ

গিরি, এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।

বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।

মায়ের এ বেদনাভাষ তো একুশ শতকের। যিনি সচেতনপ্রয়াসে সমকালের দর্পণে বিম্বিত হাহাকারকে ধ্বনিত করেন, এবং অজান্তে চিরত্বের রসদ ভাণ্ডারে সঞ্চিত রেখে যান, তাঁর বৈদগ্ধ্য কোনো কালিক নির্দিষ্টতায় বাঁধা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ঃ

''কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার। কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। ... সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সঙ্কীর্ণমণ্ডলীর মধ্যে কন্যাকে বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। তাহার রূপগুণ অর্থসামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না ... আগমনী ও বিজয়া বাঙালির মাতৃহৃদয়ের গান।' (দ্রষ্টব্য ঃ ছেলে ভুলানো ছড়া ঃ লোকসাহিত্য)।

এই মাতৃহৃদয়ের গানের উদ্‌গাতা ঋষি শাক্তপদের আদিকবি বাল্মীকিস্বরূপ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। হালিশহরে (কুমারহট্ট) বৈদ্যবংশে ১১২৫-১১৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য ঃ বাঙালির গান প্রকাশকাল ১৯০৫ খ্রীঃ উল্লেখ শক্তিগীতি

পদাবলী ঃ অরুণকুমার বসু ঃ পুস্তক বিপণি প্রকাশনা ঃ ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ ঃ পৃ ঃ ২৪৩)। অরুণকুমার বসু বলেছেন ঃ মৃৎপ্রতিমার ওষ্ঠাধারে বিশ্বের লাবণ্যামৃত মাখিয়ে তাকে মা বলতে শিখিয়েছেন রামপ্রসাদ। পৌত্তলিক বাঙালির পক্ষে সেদিন এ যেন ছিল এক অভিনব আত্মমুক্তি। (দ্রষ্টব্য ঃ শক্তিগীতি পদাবলী ঃ প্রাগুক্ত ঃ পৃ ১৬৫)।

সাত

আজু গোঁসাই যিনি ১৮ শতকের বড় কবি তাঁর অনেক রচনা বৈষ্ণব পদসংকলনগুলিতে গ্রন্থিত আছে। কিংবদন্তি অনুসারে নদীয়ারাজ (কৃষ্ণচন্দ্র) প্রায়ই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে কবিরঞ্জন ও আজু গোঁসাইকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। উভয় কবির কবিত্বের লড়াই মহারাজের উপভোগের বিষয় ছিল। এ ঘটনা সত্য হলে অনুমিত হয়, কবিরঞ্জনের মতো আজু গোঁসাইও কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তবে, স্বীকার করতেই হবে রামপ্রসাদের দিগন্তবিস্তারী প্রতিভার কাছে আঁজু গোঁসাইয়ের কবিত্বের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেছে। অধিকন্তু যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বৈষ্ণবপদের পূর্বের প্রতিষ্ঠা পুনরায় অর্জনের সম্ভাবনা ছিলো না। যে রাজা বা জমিদারেরা এঁদের আনুকূল্য দিতেন, তাদের অধিকাংশই কূলধর্মের পরিবর্তন ঘটিয়ে শাক্ত-বৈষ্ণব হলেন। ফলে বৈষ্ণব কবি আজু গোঁসাইয়ের পৃষ্ঠপোষণার এলাকা সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। আমাদের, তবু মনে হয় কবি আজু গোস্বামীকে নিয়ে ব্যাপক গভীর গবেষণার প্রয়োজন।

আট

উনিশ শতকের নবজাগরণ পর্বে হালিশহরের সাহিত্যচর্চা আবার স্তিমিত হয়ে যায়। রামপ্রসাদের মোহিনী আবেশ তখনও এখানকার নাগরিক মননকে ঘিরে রেখে তার প্রকাশ রুদ্ধ করে দিয়েছে। সাহিত্যের ভরকেন্দ্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এতদিন যে স্থানীয় রাজা জমিদারেরা আর্থিক সহায়তা ও পরিপোষণার আয়োজন করে আঞ্চলিক স্বয়ং সম্পূর্ণ সাহিত্যকেন্দ্রগুলি গড়ে তুলতেন, তাদের আর্থিক পরিকাঠামো ভেঙে যেতে শুরু করলো। কলকাতায় ইংরেজ বণিকদের ভিত্তি গড়ে উঠলো অঞ্চলনির্ভর সংস্কৃতি ডানা মেলে কলকাতা প্রবাসী হতে চাইলো। হালিশহরের ক্ষেত্রে আরো একটি উপাদান নজরে পড়ে,—ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যকে হালিশহর সহজে গ্রহণ করতে চায় নি, উনিশ শতকেও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে দ্রুত এবং সহজ আত্মীকরণে তার অনীহা। একটি বাস্তব উদাহরণ মেলে ঃ রেলপথ প্রসারণকালে হালিশহরের তৎকালীন ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাতীর ঘেঁষে রেলস্থাপনপ্রক্রিয়ার প্রবল প্রতিবাদ করে। পরিণামে রেল দূরপথে বসানো হয়। এতগুলি একত্রসংস্থিত হলে হালিশহরে সাহিত্যের ভাগীরথীধারা সহসা পথভ্রষ্ট হল। প্রথমে ভরকেন্দ্রটি স্থানান্তরিত হল কাঁচরাপাড়ায় (কাঞ্চনপল্লী)। সেখানে যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ব্রত নিলেন যাই যাই মধ্যযুগ ও দ্বারে অপেক্ষমান সেতু নির্মাণের।

পরে সেই ভরকেন্দ্র সরে গেলো নৈহাটিতে। নবযুগের ঋষি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশাল উত্তরাধিকারের সম্পদ নিয়ে হালিশহর নিশ্চুপ দ্রষ্টায় পরিণত হল। হালিশহরের দিক থেকে অবশ্যই এটি তামসপর্ব। মহাকাব্যের যুগে হালিশহর নীরব। নতুন গদ্যসাহিত্যের ঘুমভাঙার ভোরে হালিশহর মূক। সেকালের রথীবৃন্দদের কেউই হালিশহরের ভূমিপুত্র নন। তারপর কলকাতাই গ্রাস করেছে সব।

নয়

উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে যখন গীতিকাব্যের মুর্চ্ছনা বাঙ্ময় হয়ে উঠলো তখন হালিশহর ঘুম ভেঙে জেগে উঠছে। বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রমুখ গীতিকবির সঙ্গে আরো একটি নাম উচ্চারিত হয়। ইনি হালিশহরের কবি বলদেব পালিত। গীতিকবিতা আন্দোলনে বিপুলতর কোনো অবদান না রাখতে পারলেও তাঁর কবিতা মর্যাদাহীন নয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় "উনিশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে বলদেব পালিতকে যথাযোগ্য স্মরণ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ "কাব্যমঞ্জুরী" "লালিত কবিতাবলী", "ভর্ত্তৃহরি কাব্য" "কর্ণার্জ্জুন কাব্য"। ভাওয়াল কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের মতোই বলদেব ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে অতীন্দ্রিয় সাধনা করেন নি। তাঁর কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

"নাচাইয়া লতা পাতা, দক্ষিণ বাতাস
সরোবরে কুমুদীরে করি আলিঙ্গন,
বলেতে খুলিয়া তব অবগুণ্ঠ বাস,
উড়ায়ে অলকাবলি করিছে চুম্বন।
তোমার নিকটে যদি প্রকাশিয়া বল,
পবন চুম্বিতে পারে বদন মণ্ডল,
তবে কেন আমি এত তোষামোদ করি।
বঞ্চিত ও কোমলাঙ্গ পরশে সুন্দরি?" (দ্রঃ কুমারহট্ট-হালিশহর পৃঃ ৬১)

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বলদেব পালিতের কবিতার মূল্যায়ন করেছেন।

সমকালের অপর একজন কবি দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তাঁর রচিত কাব্য "বিবিধ দর্শন", "একতা ব্রত", "বিচিত্র দর্শন"। একটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন "জ্ঞানপ্রভা"।

দশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হালিশহর প্রায় বন্ধ্যা। ব্যতিক্রম একমাত্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে সাংবাদিক ও পরে সম্পাদক হিসাবে তাঁর স্থান অত্যন্ত উচ্চে। 'বঙ্গ

বাসী', 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'রঙ্গালয়', দৈনিক হিতবাদী', 'প্রবাহিনী'' বাঙালি ও সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তিনি মূলত প্রবন্ধকার। অতি সম্প্রতিকালে কলকাতার একটি প্রকাশন প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেছে। এই ব্যতিক্রমটি বাদ দিলে হালিশহর একেবারেই শূন্য।

হালিশহরের সাহিত্য অঙ্গনে এক আশ্চর্য পরিচলনসূত্র দেখা যায়। বৃহৎ এবং মহৎ প্রতিভার বিচ্ছুরণমায়া বড়ো দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। বলদেব পালিতের উত্তরকালে কোনো সাহিত্যস্রষ্টার পদচারণা ঘটলো না। সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল মুখ্যত দায়ী। সাহিত্যসৃষ্টি না করলেও হালিশহর প্রতিভাশূন্য নয়। তার অন্তরস্থিত সৃষ্টিমহিমা তখন সাহিত্যের হিল্লোলে উৎসুক নয়। তার আগ্রহ বন্দিনী দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞের সাধনমন্ত্রে। রণক্ষেত্রে প্রথম সারিতে হালিশহর, এবং নেতার আসনে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ বিপনাবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়। হালিশহর থেকে পরিচালিত তাঁর নেতৃত্বে আত্মোন্নতি সমিতির সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। তাঁর কাছে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য ঘোষণা করে কলম ধরার কোমল হাত আঁকড়ে ধরলো রিভলবারের ট্রিগার। স্বভাবতই সাহিত্যস্থান পেলো দুয়োরানীর পাতা ছাওয়া কুটিরে। এরই মাঝে গুড উইল ফ্রেটারনিটি সংস্থা তার আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সাহিত্যসাধনার ক্ষীণধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে।

এগারো

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরেও বন্ধ্যাদশা অপসৃত হল না। এতদিন যাঁরা স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে এক মত্তদশায় জীবনযাপন করছিলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাঁরা আবিষ্কার করলেন, স্বপ্নান্তে জাগরণের ভাঁড়ার শূন্য। খণ্ডিত স্বাধীনতা তাঁদের প্রার্থিত আনন্দ দান করলো না। এই পরম নিরানন্দময় হতাশার গভীরতায় কোনো মহৎসাহিত্যের জন্মসম্ভাবনা ছিল, কিন্তু প্রতিভার প্রকাশযোগ্য ভাষা এতখানি বেদনারুদ্ধ যে সৃষ্টির প্রতি তার উৎসাহ রইলো না। সামাজিক অর্থনৈতিক রসায়নও বিশেষ পরিবেশ গড়ে তুলছিলো—দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ থেকে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে আসা বস্তুহারার ঢল হালিশহরেও। কলকাতা থেকে পরিবর্তিত-অবস্থা নির্ভরসাহিত্য পাঠ করে তার রসে মুগ্ধ হয়ে রইলো হালিশহরের সৃজনশক্তিবিহীন স্থবির মনীষা।

এবম্বিধ বন্ধ্যাত্বের একটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বিপিনবিহারীর স্বপ্নদ্যুতিতে তারা পঙ্গু হয়েছিল। অপর হেতুটি সাধারণ চোখে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও আমাদের বিচারে তা গুরুতর এবং সত্যের নিকটবর্তী। হালিশহরের বিদ্বৎশ্রেণী আদতে এই অঞ্চলেরই আদি-বাসিন্দা। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তুদের জীবনযাপনের গ্লানি ও সংগ্রামের মহিমায় তারা 'বাঙাল'দের প্রতি 'ঘটি' সুলভ তথাকথিত উদাসীনতায় চেয়েছিল। এমন অসহনীয় অবস্থায় সৃষ্টির উপকরণ থাকে সত্য, কিন্তু সৃষ্টির অনুকূলতা থাকতে পারে

না, থাকেও নি।

বারো

সাহিত্যের আঙিনায় হালিশহরের পুনর্জাগরণ ঘটলো স্বাধীনতা-উত্তরকালে, বিশেষত ষাট-সত্তর দশকে এবং এই উত্তরণের পশ্চাতে সক্রিয় অনুঘটকের ভূমিকায় রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব স্বীকার করতেই হয়, প্রধানত মার্কসীয় বীক্ষার ব্যাপক অনুশীলন। এ সময় সাহিত্যের সকল শাখা—গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, নাট্যরচনা প্রতিটিতেই নব নব ধারা বিকশিত হতে থাকলো, কখনো অনর্গল, কখনো শ্লথ। এ পর্বে রামপ্রসাদ সেনের মতো, বা বলদেব পালিতের মতো কোনো একক নেতৃত্ব নেই, আছে সমবেত সংঘশক্তির সমন্বয়। এটিই বর্তমানে হালিশহরের সাহিত্যচর্চার মূল বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য কয়েকটি ঘটনাও সাহিত্যের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করতে সহায়ক বাতাররণ গড়েছে। কাঁচরাপাড়ায় সাহিত্যের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় জ্ঞানমুকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রধান আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন রবীন্দ্রোত্তর বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্থপতি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উত্তরসূরি সমরেশ বসু অক্লান্ত হয়ে উঠছেন। নৈহাটিতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে অধ্যাপনাসূত্রে যোগ দিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধায়—তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠলো তাত্ত্বিক আলোচনার আবহ। নৈহাটি ও কাঁচরাপাড়ার দুই বিখ্যাত জননেতা যথাক্রমে গোপাল বসু ও কুঞ্জবিহারী বসুর সাহিত্যবিষয়ে আগ্রহ নতুন প্রজন্মের লেখকদের প্রেরণা জুগিয়েছে। দুই শহরের মাঝে হালিশহরে তখন সৃষ্টির আকাশ নববর্ষায় ছাওয়া—কাঁচরাপাড়ায় প্রগতি পাঠাগারে আড্ডা, নৈহাটিতে তত্ত্ব শিক্ষা, ও সামান্য দূরে আদর্শ হিসাবে সমরেশ বসু।

তেরো

ষাট-সত্তর দশক থেকে যে গদ্যস্রষ্টারা সক্রিয় সাধনায় নিয়োজিত দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এমন কি অনেক লেখককেই সুনির্দিষ্টভাবে গদ্যকার আখ্যায় চিহ্নিত করা যায় না। অনেকেই গদ্য পদ্য উভয় শাখাতেই অনায়াস যাতায়াতে দক্ষ।

এ প্রসঙ্গে যাঁর নাম প্রথমেই মনে পড়ে, তিনি যশোদাজীবন ভট্টাচার্য। হালিশহরবাসী গদ্যকারকের মধ্যে তাঁরই হাতের পেশী সর্বাপেক্ষা জোরালো। সামান্য বেতনের প্রাথমিক শিক্ষকের বৃত্তি ত্যাগ করে রেলে চাকরি নিয়ে হালিশহর ছেড়ে চলে যান। ধারে ধারে তাঁর সৃষ্টিতে ভাটা নামে, এবং অবশেষে তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। স্বল্পায়ু লেখকজীবনে (ব্যক্তিজীবনে তিনি এখনও জীবিত, পুরুলিয়ার আদ্রাতে বাস করছেন) সত্তরটিরও বেশি গল্প লিখেছেন। দুটি উপন্যাসও লিখেছিলেন তিনি। বাংলা ও বাংলার বাইরের প্রায় সকল পত্রপত্রিকায় তাঁর গল্প উপন্যাস মুদ্রিত হয়েছে। গল্প লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরও ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। আদ্রায় যোগাযোগের

অভাবহেতু তাঁর প্রকাশিত মুদ্রিত গ্রন্থের তথ্য আয়োজন সম্ভব হয়নি। জনপ্রিয় হয়ে ওঠার শিখরমুহূর্তে তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন আমাদের পীড়িত করে।

হালিশহরের অপর কীর্তিমান গদ্যলেখক সমীরণ দাশগুপ্ত। জীবনের খুঁটিনাটির প্রতি তিনিও সমানভাবে আকর্ষিত। তাঁর রচনার একটি মহৎ গুণ স্থানিক সুবাসের আভাস। হালিশহরের মাঠ, পাড়া, পুকুরঘাট, গঙ্গাতীর, ইঁটভাটা, উদ্বাস্তু কলোনী, নষ্ট মেয়ে সবই তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু রসবাদী পাঠকের কাছে নয়, ইতিহাসের গবেষণায় তাঁর গল্প উপন্যাস হালিশহরের জীবনচর্চার দলিল হিসাবে আদৃত হবে। যশোদাজীবনের রচনায় জীবনের তিক্ত আস্বাদ পাই, তিনি নির্মম। গোত্রের দিক থেকে তিনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয়। সমীরণ দাশগুপ্ত নিষ্ঠুর নন, বরং জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র আসঙ্গলিপ্সা। জীবনের ঠিক বেঠিকের প্রতি তাঁর দরদভরা সহানুভূতি। মনে হয়, অন্তরে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত, —'অশ্রুনদী', 'মৃত্তিকা', এবং 'অমিয়র স্বদেশ'। অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছেন, তার মধ্যে 'শ্যামা' উল্লেখযোগ্য। আধুনিক গল্পকার হিসাবে সমীরণ দাশগুপ্তকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়ে থাকে। 'তাহাদের কথা' পত্রিকা তাঁকে নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় মূলত কবি। গদ্যেও যে তিনি অনায়াসসিদ্ধ তার প্রমাণ যথেষ্ট। পূর্বে লিখলেও গদ্য লেখক হৃষীকেশের উত্থান সত্তর দশকে। বিমল কর, দিব্যেন্দু পালিত, সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়, শেখর বসু, বলরাম বসাক, উদয়ন ঘোষ প্রমুখেরা যে নতুন গল্প আন্দোলন শুরু করেন (পরে শাস্ত্র-বিরোধী ছোটগল্প বলে আখ্যাত হয়), সে ধারার অন্যতম প্রধান গল্পকার হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। ন্যারোটিভ ভেঙে ফেলে, প্রতীকী বাক্যবন্ধ, ইঙ্গিতময় বিন্যাস ও সদাভঙ্গুর চিত্রকলায় গড়া তাঁর গল্পের শরীর। গল্পগুলি ঋজু এবং অকপট। একটি মাত্র গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'আমি, সোনা এবং', প্রকাশিত হয়েছে একটি উপন্যাসও 'খণ্ড অখণ্ড বাস্তবতা'। যশোদাজীবন ভট্টাচার্যের মতো তিনিও বোধ করি স্বেচ্ছানির্বাসনের বিলাসিতা উপভোগ করছেন। অনেকদিন তাঁর নতুন কোনো গদ্যরচনা চোখে পড়ে না। সমীরণ দাশগুপ্তও যদি তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ শুরু করেন, তবে হালিশহরের সাহিত্য জগতে সংকট দেখা দেবে।

হালিশহরের আলোচনায় তাঁর নাম ভিন্নভাবে বিচার্য। সম্পাদনা, অধ্যাপনা, উপন্যাসসৃষ্টি এবং কাব্যরচনা সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী। এ যুগে এমন প্রতিভা সত্যিই দুর্লভ। তিনি আনন্দ বাগচী। বঙ্গদেশের একজন অগ্রগণ্য কবি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কাব্যপ্রতিভা স্বীকৃত। অথচ তিনি যখন গদ্য লেখেন তার সঙ্গে কবি আনন্দ বাগচীর কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। দুটি ভিন্ন সত্তাকে স্পষ্টভাবে ধরে রাখা, এবং অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। অগুন্তি উপন্যাস লিখেছেন, অসংখ্য গল্প। সিরিয়াস বিষয় থেকে হালকা হাসি, গোয়েন্দা কাহিনী, রহস্য রোমাঞ্চ সব কিছুই তাঁর অধিগম্য। উল্লেখ্য

সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে 'চকখড়ি', 'এই জন্ম অন্যজীবন', এবং 'রাজযোটক'।

সাম্প্রতিক সর্বাপেক্ষা আলোচিত ব্যক্তিত্ব সুব্রত মুখোপাধ্যায়। নিকট অতীতে রাজপদে বৃত হওয়ায় বর্তমানে অন্যত্র বসবাস করেন। কিন্তু হালিশহরই তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তাঁর স্বাদু গদ্যে আমরা পাই শরৎচন্দ্রীয় আখ্যানরীতির মায়া কাজল, সমরেশ বসুর আশ্চর্য দেখার চোখ। সমালোচকেরা অনেকেই তাঁর রচনাসৌকর্যে সমরেশ বসুর উচ্চরাধিকার আবিষ্কার করেছেন। মূলত সত্তর দশকের প্রারম্ভেই তাঁর উত্থান। আজও তা অব্যাহত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বঙ্কিম পুরস্কারে ধন্য করেছেন। দীর্ঘ লেখক জীবনে স্বভাবতই তাঁর লেখনী নিঃসৃত সম্ভার বিপুল, অনেকগুলি উপন্যাস, একাধিক গল্প সংগ্রহ। বাংলার স্মরণীয় লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। বহুপঠিত ও বহু আলোচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে স্মরণযোগ্য 'পৌর্নমাসী', 'রসিক', 'মধুকর' এবং 'সন্ত্রাস'। আমাদের মনে হয়, গল্পে নয়, শরৎচন্দ্রের মতোই সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের প্রতিমা গঠনে অধিকতর কুশলী শিল্পী।

হালিশহরের গল্প উপন্যাসের জগতে আরো কয়েকজন আছেন। তাঁদের মধ্যে 'ভারত পথিক' ছদ্মনামের অন্তরালে দুলালচন্দ্র চাকীর একটি অদ্ভুত রচনা পাই—''পোড়াঘাটার পাঁচালী'। এটিকে উপন্যাস বা আত্মকথন বা ইতিহাস কি নামে আখ্যাত করা যাবে, স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না। তথাপি নির্দ্ধিধায় স্বীকার করতে হবে গ্রন্থপাঠে প্রবল আনন্দ অনুভূত হয়।

এছাড়া পাওয়া গেছে বিভূতি নিয়োগীর উপন্যাস 'একটি আদিম অধ্যায়' এবং কালীপদ ঘোষের উপন্যাস 'ঝরা ফুল'। কয়েকটি গল্পে চমকলগিয়ে হারিয়ে গেলেন প্রবীণ অশোক বিশ্বাস, এবং তরুণতর রূপক ভট্টাচার্য ও তনুজা ভট্টাচার্য। হলিশহরের সৃষ্টিশীল গদ্যের জগৎ সম্ভবত পুনরায় অন্ধকারে পতিত হতে চলেছে।

চোদ্দ

হালিশহরের আধুনিক কবিকূলের অগ্রপুরোহিত আনন্দ বাগচী। সকলেই জানেন সাহিত্য আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিভিন্নকালে 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা', 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'কালি-কলমে'র গুরুত্ব অপরিসীম। তারই ঐতিহ্যে ষাট দশকে বাংলা কবিতার উচ্ছ্বাস আন্দোলন দেখা দিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে। তাঁদের মুখপত্রের নাম 'কৃত্তিবাস'। 'কৃত্তিবাস' একটি পত্রিকার নাম নয়, একটি আন্দোলনের নাম। এই পত্রের প্রথম সম্পাদক কবি আনন্দ বাগচী। সেই অর্থে আধুনিকতর কাব্য আন্দোলনের অন্যতম ভগীরথ। একাধিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা তিনি। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা, ইংরাজিসহ অন্যান্য বিদেশি ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে। অধ্যাপনার ব্রতে কিছুদিন বাঁকুড়া প্রতাপ বাগানের সজল ছায়ায় থেকে স্থায়ী বসবাসের জন্য ফিরে এসেছেন হালিশহরে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের ফলে

তাঁকে ঘিরে হালিশহরে কাব্যচর্চার জোয়ার সৃষ্টি হতে পারে।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় অপর বড়ো কবি। গদ্যপর্বের আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে বলেছি—তাঁর স্বভাবধর্ম কাব্য। তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য "মহারাজ তোমাকে" এবং "মায়াবী হরিণী"। তাঁর গদ্যের মতোই করিতায় লিরিক ও মননের চমকদারি মিশ্রণ।

সন্তোষ মুখোপাধ্যায় প্রবীণ না হলেও নবীন নন। কুড়ি বছর প্রায় নিরলস কাব্যসাধনা করেছেন তিনি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে গত বৎসর—"আছে অনুগত নদী'। তাঁর কবিতায় এক সিক্ত আর্দ্র স্মৃতির মেদুর আবেশ। চিরাতীতে ফিরে ফিরে আবৃত্ত হওয়া।

দীপক ঘোষ এমন একজন কবি যাঁকে ঘিরে আলোচনার উত্তাপ কম। কলরব থেকে দূরে তিনি কাব্যসাধনায় নিমগ্ন। তাঁর কবিতায় ভাঙা ছাঁচ পাওয়া যায়। প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন—"চিহ্নিত অনামিকা"।

প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত তরুণ। তাঁর কবিতা সহজ সরল হৃদয়ের স্পর্শে সিক্ত। হঠাৎ মাঝে রাজনীতি অতিসচেতনতা কাব্যগুণে লঘুভাব সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে রমেন বসুর কাব্যগ্রন্থ। দীর্ঘদিন কাব্যসাধনা করলেও প্রকাশিত হয়নি কবি লক্ষ্মীনারায়ণ পাড়ুই এবং কল্পনা সেনের কোনো কাব্যগ্রন্থ। শেষ করি তরুণ কবি নির্ঝর মণ্ডলের নাম জানিয়ে। নিবিড় তন্ময়তায় কবিতার অবয়বসংস্থানের তপস্যায় মগ্ন। আশা জাগে আগামীদিনে হালিশহরে কবিতার নেতৃত্ব নির্ঝরের।

পনেরো

সৃষ্টিশীল গদ্য ও কবিতার জগৎ থেকে সরে এসে প্রবন্ধ সাহিত্য আমাদের চমকিত করে। ছ'জন বিশিষ্ট প্রবন্ধকারকে আমরা এই যুগে পেয়েছি। তাঁদের মৌলিক ধ্যানধারণা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি সুধামহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এঁরা হলেন, হীরেন ভট্টচার্য, অজয় সেন, গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁধন সেনগুপ্ত, অলোক মৈত্র এবং সমীর সেন।

হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রাজ্ঞ। আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজই তাঁর প্রধান বিষয়। প্রায় সারাজীবন দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানের দুরূহ ক্রিয়ায় তিনি প্রকাশ করেন এক অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ—"হালিশহরের মানুষ'। হালিশহর সংক্রান্ত আলোচনায় এটি আকর-গ্রন্থ। ইতিহাসচর্চার জীবনব্যাপী সাধনার জন্য হালিশহরবাসী তাঁকে জীবন্ত কিংবদন্তি আখ্যা দিয়েছে। ইতিহাস ব্যতীত অন্যান্য শাখাতেও তাঁর ভাবনা ও যুক্তিবিস্তার অভিনিবিষ্ট ছিলো। কয়েকমাস পূর্বে তাঁর প্রয়াণে হালিশহর সাহিত্য অনুশীলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

অজয় সেন ভিন্নগোত্রের প্রবন্ধকার। সাধুরীতি তাঁর ভাবপ্রকাশের সচেতনবাহন।

অধ্যাত্মদর্শনর প্রতি অত্যাগ্রহে তিনি একমুখী। বেদ উপনিষদের দর্শনালোকে শাক্তদর্শনের অন্বয়সাধন তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও সাধনা'র উপর নানাদিক নির্দেশ করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। একটি বৃহৎ গ্রন্থরচনার স্তর হিসাবে এগুলি সৃষ্টির প্রতি তিনি নিবিষ্ট হন। তাঁর আকস্মাৎ মৃত্যুতে সে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। শুনেছি, তাঁর সুযোগ্যা কন্যা কবি কল্পনা সেন এ বিষয়ে লিখিত প্রকাশিত অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পাদনা করে গ্রন্থিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয়বৈচিত্র্যপূর্ণ। অধ্যাত্মদর্শনের প্রতি তাঁরও আগ্রহ। সাংবাদিকতাসূত্রেও তিনি জড়িত। অত্যন্ত স্নেহশীল এই প্রবন্ধকার প্রয়োজনের চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে নিজের প্রতি অন্যায় করেছেন। তাঁর ঋদ্ধবোধের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়ার কথা ছিল, অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো প্রকাশিত গ্রন্থ আমাদের হাতে আসে নি। বিভিন্ন দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় সংক্ষিপ্তকার রচনায় পরিপূর্ণ তাঁর সম্ভার। শোনা যাচ্ছে, বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও দর্শন নিয়ে দীর্ঘ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এ কাজের যোগ ব্যক্তি তিনিই।

বাঁধন সেনগুপ্ত প্রবন্ধকার সমাজে সর্বাপেক্ষা আলোচিত নাম। হালিশহরের গরিমাস্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক নজরুলচর্চার পথিকৃৎ বলে তাঁকে গণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণার জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রীর অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির সদস্য মনোনীত হন। নজরুল বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর মর্যাদা জাতীয় স্তরে ব্যাপ্ত। বাংলাদেশেও আমন্ত্রিত হয়েছেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদলে নির্বাচিত হন। প্রবন্ধ ব্যতীত কবিতা রচনাতেও তিনি ভাস্কর। চারটি মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা—'নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন', 'বাজেয়াপ্ত রচনা ঃ কাজী নজরুল ইসলাম', 'রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল' এবং 'নজরুলের ছেলেবেলা'। চলচ্চিত্রসংক্রান্ত বিশ্লেষণ করেছেন ''ঋত্বিক চলচ্চিত্রকথা''য়। একাধিক গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ''আমাদের গৌরী বসু'। কবি রামপ্রসাদ ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নিয়েও তিনি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা করেছেন।

অলোক মৈত্র ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু গবেষক। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সদস্যপদের সম্মানও তাঁর রয়েছে। সামাজিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি এ দুইই তাঁর অধীত বিষয়। এ পর্যন্ত দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত—'হাবেলিশহরের লৌকিকধর্মে সমাজ ও সংস্কৃতি' এবং 'বাংলার লৌকিক ধর্মাচারের ঐতিহ্য সন্ধানে'। দুটি গ্রন্থই লোক-ইতিহাস গবেষণায় মূল্যবান সংযোজন।

প্রবন্ধকার সমীর সেন সম্বন্ধে আলোচনা না করলে এ সন্দর্ভ অসম্পূর্ণ থাকে। সমীর একদা ছিলেন শক্তিমান কবি। কবিতাকে বিসর্জন দিয়ে অনেকদিন নীরব রইলেন। তারপর গণবিজ্ঞান আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান করে প্রবন্ধকে করে তুললেন

ভাবপ্রকাশের মাধ্যম। ক্ষুরধার যুক্তি ও বিশ্লেষণের পরতবিস্তারী রীতি তাঁর বৈশিষ্ট্য। কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত নেই।

ষোলো

হালিশহরে নাট্যব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ব্যতিক্রম নাট্য একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত নিখিলরঞ্জন দাস। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘকাল। একাধিক মঞ্চসফল নাটকের রচয়িতা। প্রকাশিত নাট্যগ্রন্থের সংখ্যাও একাধিক। সমাজ বদলের হাতিয়ার হিসাবেই নাটককে তিনি মনে করেন।

সম্প্রতি হালিশহরবাসী হয়েছেন নাট্যকার সত্যজ্যোতি দাশগুপ্ত। তাঁরও একটি নাট্যসংকলনগ্রন্থ আছে।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত প্রসূন মুখোপাধ্যায় ছিলেন হালিশহরে। আনন্দের কথা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী নাটক লিখেছেন। ইনিও 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মী। সমগ্র বাংলাদেশেই নাট্যকারের সংখ্যা মুষ্ঠিমেয়। হালিশহর তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

সতেরো

হালিশহরে বিভিন্ন সময়ে নানা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুসারে সেগুলির একটি কালানুক্রমিক পর্যায় সাজানো যেতে পারে।

'হালিশহর পত্রিকা'। হালিশহর থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্র। প্রকাশকাল ১৮৭১ খ্রীঃ। সম্পাদক জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমারহট্ট হালিশহর পত্রিকার ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রচ্ছদে হালিশহর পত্রিকার প্রচ্ছদপটটি (১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১২৭৮ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত আছে। ওই প্রচ্ছদপটে উল্লিখিত "শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের বিশেষ আনুকূল্যে শ্রীরামপুর আলফ্রেড যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রকাশক হিসাবে নাম পাওয়া যায় কৃষ্ণধন ভট্টাচার্যের।

কুমারহট্ট হালিশহর স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করেন গুডউইল ফ্রেটারনিটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্থা ও হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন ডঃ দীনেশচন্দ্র তপাদার, রাসবিহারী নন্দী, অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রন্থটি হালিশহর সম্পর্কিত একটি আকরগ্রন্থ।

'অধুনা সাহিত্য' উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এর নাম ছিল 'অধুনা'। নিবন্ধনজনিত কারণে নামে পরিবর্তন ঘটে। শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হিসাবে গণ্য। পত্রিকার ঘোষণাই ছিল—স্বকাল ভাবনার জিজ্ঞাসাপত্র। দীর্ঘজীবি হয়েছিল পত্রিকাটি। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ মিত্র, মধ্যপর্বে সুধাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় ও শেষে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। এই

পত্রিকার লেখকসূচিতে সম্পাদকেরা ব্যতীত ছিলেন, মিহির মুখোপাধ্যায়, প্রীতিভূষণ চাকী, সমীরণ দাশগুপ্ত, হিমানীশ গোস্বামী অশোক বিশ্বাস, শান্তিবিধান হালদার, সমীর মুখোপাধ্যায়, দীপক ঘোষ প্রমুখ। এঁরা গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন অনেকগুলি। এখন আর এটি প্রকাশিত হয় না।

'পদাতিক' পত্রের প্রকাশকাল ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। সম্পাদক শ্যামল সাহা, সত্তরের রক্তঝরা দিনের প্রতিবিম্ব এই পত্রিকা। লেখকসূচীতে ছিলেন বাঁধন সেনগুপ্ত, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সমীর সেন, করুনাপ্রসাদ দে, সুনীতি মালাকার প্রমুখ। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাও এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

'লাঙল' প্রায় নিয়মিত প্রকাশ পেতো। এটিও ত্রৈমাসিক। কমিটেড অভিধাপ্রাপ্ত লেখকেরাই এই পত্রিকার লেখক। পত্রিকায় শ্লোগান ছিল শ্রমজীবি জনগনের সংস্কৃতি গড়ে তোলাই তাদের লক্ষ্য। গল্প কবিতার মান যেমন তেমন হলেও প্রবন্ধ খুব উচ্চমানের। প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন স্বপন দে। বর্তমানে অভিজিৎ কেশ।

'এখন সংস্কৃতি' অপর সাড়া জাগানো পত্রিকা। ১৯৯৩ খ্রীঃ এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। তখন অবশ্য এর নাম ছিল এখন'। নাম বদল ঘটেছে দুটি সংখ্যার পর। বাঁধন সেনগুপ্তের সুযোগ্য হাতে এটি সম্পাদিত হয়েছে। সাধারণ সংখ্যাগুলি সাধারণ মানেরই, কিন্তু বিশেষ সংখ্যাগুলি (যেমন নজরুল সংখ্যা) সাধারণ পাঠক এবং গবেষক উভয়েরই প্রয়োজনীয়। এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন লেখক হিসাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, দর্শন চৌধুরী, বিভাস চক্রবর্তী, সুনন্দা মৈত্র প্রমুখ। এ পর্যন্ত সাত বছর নিরবচ্ছিন্ন চলার পর হঠাৎই এর প্রকাশ স্তব্ধ। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। পত্রিকাটি যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তা অতীব দুঃখের।

'চোখ' পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এটি সম্পূর্ণভাবেই তরুণদের পত্রিকা। সম্পাদক অশেষ চক্রবর্তী। এতে লিখেছেন অসীম ত্রিবেদী, লক্ষ্মীনারায়ণ পাড়ুই, তনুজা ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে। পাঁচটি সংখ্যা অনিয়মিত প্রকাশের পর পত্রিকা উঠে যায়।

'দীপাবলী' অপর পত্রিকা। এতে লিখেছেন আনন্দ বাগচী, গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক মৈত্র প্রমুখ। অনিয়মিতভারে হলেও এটির প্রকাশ বন্ধ হয়নি। সম্পাদক কৃষ্ণদাস সরকার।

প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত হল পূর্বী পত্রিকার। সুসম্পাদিত এই পত্রিকার সম্পাদক কল্পনা সেন। লেখকেরা অজয় সেন, প্রীতিভূষণ চাকী, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তথাগত মৌলিক, হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।

'ঋতুপত্র' পত্রিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এতে লিখে থাকেন দীপক ঘোষ, অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় সমীরণ দাশগুপ্ত প্রমুখেরা। সম্পাদক অতনু চট্টোপাধ্যায়।

হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ একটি সুমুদ্রিত পত্র প্রকাশ করেছেন—'গণবিজ্ঞান

ভাবনা'। পরমাণু প্রসারণের বিরুদ্ধে একটি অসাধারণ সংকলন। এতে সংযোজিত হয়েছে জ্যোৎস্নাময় ঘোষ সম্পাদিত "ক্রোড়পত্র'। ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার মতো পত্র।

১৯৯৮ খ্রীঃ বাঁধন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় কুমারহট্ট হালিশহর পত্রটির ২য় পরিবর্ধিত অংশ সহ পুনমুর্দ্রন হয়, পরিবর্ধিত অংশের লেখকসূচীর মধ্যে আছেন অলোক মৈত্র, রবীন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

'আমাদের সেতু' এই বৎসর প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক গুরুদেব চক্রবর্তী। লিখেছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

আঠারো

আমরা আলোচনার প্রারম্ভে বলেছিলাম বাংলা সাহিত্যে হালিশহরের অবস্থান বিপুলতর। ক্ষুদ্র পরিসরে তাকে সুংহতরূপ দান করা কঠিন। বিস্তর পরিবর্তন ঘটছে প্রতিনিয়ত। ভূবনীকরনী মোহান্ধতায় যে বিষ মন্থিত হয়ে উঠছে কে জানে তার যথার্থ মহাকাব্য হালিশহর থেকেই একদিন রচিত হবে কিনা। আমার কথাটি এখানেই ফুরোলো, কিন্তু নটে গাছটি মুড়োলো না নিশ্চিত উচ্চারণ করতে পারি।

সংযোজন।। অনেক কথাই বাদ গেছে। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের অনুল্লেখ। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বলা হয়নি। আছেন প্রবন্ধ লেখক শিবসৌম্য বিশ্বাস।

অতিরিক্ত সংযোজন ঃ নিখিলরঞ্জন দাসের নাট্যগ্রন্থ "পাড়ি ও অন্যান্য' নাটক। সম্প্রতি গুডউইল ফ্রেটারনিটি প্রকাশ করেছেন "রামপ্রসাদের প্রামাণ্য জীবনী ও গীতিসংকলন'। সম্পাদক সমীরণ দাশগুপ্ত ও রতন কুমার ঘোষ।

ঋণ ঃ অনেকের, অলোক মৈত্র, পরিতোষ দাস প্রমুখ।

লেখক পরিচিতি ঃ বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

সাধক কবি রামপ্রসাদ ও তাঁর কাব্যসাধনা

— শিখা দত্ত

শাক্তপদতরঙ্গিনীর গোমুখী ছিলেন সাধক কবি রামপ্রসাদ। শাক্তপদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই সাধক অষ্টাদশ শতাব্দীর আনুমানিক দ্বিতীয় দশকে চব্বিশ পরগণার হালিশহরে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রামপ্রসাদের বংশ বংশপরম্পরায় মাতৃ আশীর্বাদধন্য। পিতার প্রতি যেমন 'অভয়া' সদয়া ছিলেন, তেমনি পিতামহ রামেশ্বর ছিলেন 'দেবীপুত্র'। কবি রামপ্রসাদ শৈশবেই মাতৃহীন হন। তাঁর বিমাতা ছিল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার নাম নিধিরাম।

রামপ্রসাদের জীবন সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ নয়। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের চেষ্টায় যে সামান্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাও নানান লৌকিক-অলৌকিক জনশ্রুতি মেশানো। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে। কবি বিবাহ করেছিলেন। তার চার সন্তান, দুই পুত্র ও দুই কন্যা। জীবিকার জন্য কবি কলকাতার এক জমিদার বাড়িতে মুহুরিগিরি করতেন। কিন্তু মন তার মুহুরির কাজে নয়, বিভোর থাকতো মাতৃ-চিন্তায়। তাই তাঁর হিসাবের খাতা মায়ের সঙ্গীতে ভরে উঠতো। জনশ্রুতি আছে, সাধক কবি হিসাবের খাতায় "আমায় দে মা তবিলদারী' এই বিখ্যাত গানের পদটি দিয়ে খাতা ভরিয়ে ছিলেন। সহৃদয় ভূ-স্বামী কবির কাব্যশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে চাকরির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সাধন ভজনের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ ভরতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। সম্ভবত তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন থাকায় জীবনব্যাপী তাঁকে নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে শুধু 'কবিরঞ্জন' উপাধি নয়, বৃত্তি ও নিষ্কর জমিও দান করেন। রামপ্রসাদ প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুর সময় আসন্ন জেনে তিনি গঙ্গাজলে অবতরণ করেন এবং গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে "মা গো, ওমা আমার দফা হল রফা" গানটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়।

রামপ্রসাদ গৃহী, সাধক পত্নী, পুত্র, কন্যা, জামাতা সকলের সঙ্গেই স্নেহের

সম্পর্ক। পারিবারিক মমত্ব বন্ধন কবির কাছে বিন্দুমাত্র বন্ধন বলে মনে হয়নি এবং তাঁর কবিতার ভাঁজে ভাঁজে পারিবারিক জীবনচর্চার দিনলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আনন্দময়ী মায়ের অনুধ্যানে নিমগ্ন থেকেও তিনি পৃথিবীর বাস্তব জীবনচরিতকে কখনও বিস্মৃত হননি। বাস্তব জীবন নিষ্কাশিত সুখ দুঃখের বিচিত্র মূর্চ্ছনা তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় তথা পদাবলীকে একটি বিশিষ্ট মাত্রা দান করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়িত যুগে, অত্যাচার-অবিচার কণ্টকিত সঙ্কট মুহূর্তে বাংলার মানুষ বরাভয়দায়ী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে পরম নির্ভরতা লাভ করেছিল। মানুষের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর নির্ভরতাই হচ্ছে একমাত্র রক্ষাকবচ যা সর্বাধিক বিপদের হাত থেকে মানুষকে একটি নিরাপদ দূরত্ব দান করে। বর্গীর হাঙ্গামা, রাজকর্মচারীদের শোষণ, সমাজে সর্বস্তরে ভীতি ও নিরাপত্তার অভাব এরই মধ্যে সাধক রামপ্রসাদের আবির্ভাব। তাঁর জীবনপ্রেমিক তথা উদাসীন, গৃহী অথচ ত্যাগী, ভোগী অথচ যোগী তান্ত্রিকসাধনার এই বিচিত্র সমন্বয়ের মর্মবাণী তার প্রবর্তিত সুরের মধ্যে আবর্তিত, যার মধ্যে মানুষ তার আত্মার শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। তাঁর প্রবর্তিত গায়কী রীতিই 'প্রসাদী সুর' হিসাব জনমানসে সমাদৃত।

বিষয় অনুসারে শাক্ত পদাবলীর দুটি বিভাগ—একটিতে তন্ত্র সাধনার কথা, আর অন্যটিতে আগমনী বিজয়া গানের ধারা। আরাধ্যা জননী কখনো জননী, কখনো কন্যা। আগমনী-বিজয়াকে অবলম্বন করেই রামপ্রসাদ তাঁর কাব্যে বাঙালি পরিবারের ব্যথা করুণ সমাজ চিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। সমাজের বুকে নানান সংস্কার এবং প্রথার দাসত্বে বন্দিনী মাতৃজাতি। প্রতিটি সংসারে বালিকা বধূ ও কন্যার বেদনা যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। মেয়ের দুঃখ অনুভব করতে পারে একমাত্র তার মা। রামপ্রসাদ শারদীয় দুর্গাপূজার পৌরাণিক কাঠামোয় বাংলার সমাজ মৃত্তিকার অনুলেপনে হিমালয় জায়া মেনকা ও কন্যা উমার প্রেক্ষাপটে বাংলার চিরন্তন নারীজাতির অব্যক্ত বেদনাবোধকেই উচ্চারণ করেছেন। তার আগমনী ও বিজয়া অংশে বাৎসল্যরসের তীব্র নিখাদ ধ্বনিত। আবার মাতৃরূপ কল্পনায় কবি ভাবের পূজারী, কারণ তিনি শ্যামা মাকে ব্রহ্মময়ীরূপে জানেন—'মা বিরাজে সর্বঘটে।'

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর পারিবারিক জীবনটি নানারূপ ধর্মীয় আচার বিচারের অনুশাসনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। পিতামাতাকে শৈশবেই কন্যাদান করতে হত পাত্রের বয়স বিচার না করেই। সেখানে পাত্রের বয়সের বিচার ছিল বিয়ের ক্ষেত্রে গৌণ, কুলরক্ষাই সেখানে বড় কথা। হিমালয়-কন্যা

পার্বতীর বিয়ে হয়েছে বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে। তিনি শ্মশানচারী, নেশাভাঙ করেন, সংসারের দিকে তার মন নেই। চারিটি সন্তান নিয়ে পার্বতির অতি কষ্টে দিন কাটে। কন্যার কথা ভেবে মেনকার মাতৃহৃদয়ে ব্যথার সঞ্চার হয়। ভাবেন কন্যা এলে তিনি আর তাকে কাছ ছাড়া করবেন না। তাই স্বামীকে বলেন,

" গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না।"

অনেক সাধ্য সাধনার পর মাত্র তিনদিনের জন্য কন্যা মায়ের কাছে আসে।

যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ
নিরখি বদন উমার।
বলে, মা এলে মা এলে,
মাকে ভুলে ছিলে;
মা বলে এ'কি কথা মা'র গো।।

এই ধরনের গানকেই বলে আগমনী গান। কিন্তু মেয়েকে তো নিজের সংসারে চিরদিন বেঁধে রাখা যায় না। তিনদিন পর নবমী নিশি পোহালেই মেয়ে চলে যায় স্বামীর সংসারে। এই যে বিচ্ছেদ-বেদনার অধরা মাধুরী শাক্ত পদাবলীর 'বিজয়া' সঙ্গীতে যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে। রামপ্রসাদের আগমণী-বিজয়া গানে উমা ও মেনকা যেন সে যুগের বাঙালি জীবনের জননী ও কন্যার অশ্রুসিক্ত বেদনার গীতি আলেখ্য।

মানুষের জীবনে যখন নানা বন্ধন, প্রতিপদে আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণার অবসাদ। জীবনযাপনের পথে নানান ছলনা তখন সাধক কবি রামপ্রসাদ বেঁচে থাকার অপার মন্ত্র, বিশ্বাসের পরম উৎসটি খুঁজে পেয়েছেন পরম করুণাময়ী জগতজননীর আশ্রয়ে।

"জন্ম জন্মান্তরে মাগো অনেক দুঃখ আমায় দিলে
প্রসাদ বলে, এবার মলে ডাকবো সর্বনাশী বলে।"

কখনো শ্যামা রূপের সঙ্গে শ্যামরূপের পার্থক্যকে একান্ত বহিরঙ্গ বলে মনে করেছেন। শ্যাম ও শ্যামা যেন অর্ধনারীশ্বর।

"একবার নাচ গো শ্যামা
হাসি বাঁশি মিশাইয়ে, মুণ্ডমালা ছেড়ে, বনমালা পরে
অসি ছেড়ে বাঁশী লয়ে আড় নয়নে চেয়ে চেয়ে।"

তিনি বাস্তব জীবনের অতি তুচ্ছ পরিচিত বস্তুকে অনায়াসে তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক ও তাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশের রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বদ্ধ জীবনের শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণার সঙ্গে, জতান চক্ষু মায়ামোহে আবৃত জীবনের

সঙ্গে 'কলুর চোখ বাঁধা বলদ', ছয় রিপুকে বিষম লেঠেল' এবং জীবনকে 'অশান্ত সমুদ্রবক্ষে তরণী' রূপে কল্পনা করেছেন। ঘুড়ি ওঠানোর রূপকে লিখলেন,

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভব-সংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন ঘুড়ি, আশা বায়ু বাঁধা তাহে মায়া দড়ি।

অথবা,

আমায় দে মা তবিলদারী
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী।
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।"

অধ্যাপক জাহ্নবী চক্রবর্তীর মতে "রামপ্রসাদের কতকগুলি সঙ্গীত কঠিন আবরণ বিশিষ্ট নারিকেলের মত; খোলস ছাড়াইবার কৌশল না জানিলে তাঁহাদের সুমিষ্ঠ আস্বাদ গ্রহণ করা সম্ভব নয়।"

সিস্টার নিবেদিতা সাধক রামপ্রসাদের কবিকৃতি সম্পর্কে বলেছিলেন, "It takes the whole history of Rome and Florence to make the Divinia Comedia comprehensible, infact we can never understand any poet without some knowledge of the culture that produced him" রামপ্রসাদের কবি প্রকৃতি যে সংস্কার দ্বারা নির্মিত, সেই সংস্কার, সেই ধর্মের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে রামপ্রসাদের পদাবলী কবিত্বহীন বলে মনে হতে পারে।

উদার মৈত্রী বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বভুবনের মধ্যে তিনি শ্যামা রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ষড়দর্শনে যার দর্শন মেলে না, প্রগাঢ় ভক্তির মার্গে তিনি তাঁকে দেহস্ত ষট্‌চক্রে আপন করে পেয়েছিলেন। 'মা-পাগল' সন্তানের ন্যায় তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁর হৃদয়ের গূঢ় ভাবকে ব্যক্ত করেছেন আবার সিদ্ধির অপার আনন্দে বিভোর হয়ে পড়েছেন। সাধনার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি অনন্ত শক্তিময়ী জননীর কাছে উদ্ধত সন্তানের মত তেজ ও অভিমান দেখিয়েছেন — এটিই প্রসাদী সঙ্গীত—যা মায়ের প্রসাদের মতই পবিত্র, নির্মল এবং আন্তরিক। তার এই গানগুলি যেন শাক্তপদাবলীর 'আদি গঙ্গা হরিদ্বার'। শাক্ত সঙ্গীতের যাবতীয় সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং রত্ন এতে সংগুপ্ত। আগমতন্ত্রের গুপ্ত সাধন সঙ্কেতকে ভাষার মাধুর্যে এবং নিরাভবরণ রূপ লাবণ্যে ভাগিরথীর মত শাক্ত আনন্দ তরঙ্গিণীকে বাংলা বুকে অবতরণ করার মহান ব্রত নিয়েছিলেন তিনি। নিপীড়িত মানুষ যেন আপন মনের বেদনা মাতৃচরণে নিবেদন করার মত ভাষা এতদিনে খুঁজে পেল।

'ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু চার ডুবে ধন না মিলে
তুমি দম সামলে ডুব দাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে।'

রামপ্রসাদ নিজেই মাতৃপ্রেমে ডুব দিয়ে এই রত্ন সংগ্রহ করেছেন এবং সেই সম্পদ বঙ্গবাসীজনে বিলিয়ে চিরস্মরণীয় হয়েছেন। বাঙালি কণ্ঠে অতীতে যেমন বেজেছিল রামপ্রসাদী গান, আজও তেমনি ধ্বনিত হচ্ছে তার সঙ্গীত লহরী, ভবিষ্যতেও তেমনি এই গানের মধ্যেই বেঁচে থাকবে বিপদসঙ্কুল জীবনের পরম আত্মনিবেদনের নির্ভরতা।

কু পুত্র অনেক হয় মা, কু মাতা কখনো নয়, কখনো তো
রাম প্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত।

কোন কোন পদে ভক্তি অপেক্ষা অভিযোগই বড় হয়ে উঠেছে 'ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিচ্ছ অবিরত'। অথবা "মন গরীবের কি দোষ আছে।/তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা,/যেমন নাচাও তেমনি নাচি।

'সংসারের দুঃখ জ্বালা জর্জরিত বিষণ্ণতায় কবি লিখেছেন
বল মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেউ নেই শংকরী হেথা।

অথবা,

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করো ছলো
ও মা মিঠার লোভে তিত মুখে সারাটা দিন গেল।

কিংবা,

মনরে কৃষি কাজ জানো না।
এমন মানব-জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।'

মানব মনের সুখ দুঃখকে নিরাভরণ ভাষায় তিনি হৃদয়ের সামগ্রী করে নিতে পেরেছিলেন। জগৎ জননীকে এমন করে গৃহ-জননী করে তুলতে আর কোন সাধক পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন অধ্যাপিকা ও গবেষক

■ রামপ্রসাদের জন্মকাল

গবেষক শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-এর 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থ থেকে গৃহীত

"রামপ্রসাদের জন্মমৃত্যু কাল সূচনা করিয়া গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন—"৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন ময়িক সংসার পরিহারপূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।"[১]

গুপ্ত কবির রচনাই রামপ্রসাদের জীবনীসম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। এই অনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু সন গণনা করিলে ১১৮৯ বঙ্গাব্দের ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে পারে না, হয়ত ২।৩ বৎসর পরেও হইতে পারে। সে সময়ে তাঁহার বয়স ৬১।৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মকাল মোটামুটি ১৭২১-২৬ খ্রীষ্টাব্দই নির্ণয় করিতে হয়।

বিদ্যাসুন্দর ও কালী-কীর্ত্তন-গ্রন্থের রচনার তারিখ ধরিয়াও রামপ্রসাদের কাল অনেকটা নির্ভুলরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি রচনার উর্দ্ধতম কাল ১৭৬০ সাল। ইহার পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। কারণ বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধিতে ভূষিত। অথচ ১৭৫৯ সালেও রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন উপাধি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের নামে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রদত্ত সনদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই সনদটি এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীরাম
শরণং

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেবস্য

নকল
পারশী
১৫৮৩
ইঙ্গরাজী

নং ১৮৩৪৮

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলী সহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পঁয়ত্রিশ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করত ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ ফাল্গুন শহর—

লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বিশেষ আইনের বলে যখন বাংলার নিষ্কর ভূমির সনদাদি তলব করা হয়, তখন ১২০২ সালে (১৭৯৫ খ্রীঃ) শ্রীরামদুলাল সেন সাং কুমারহট্ট "সন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতা রামপ্রসাদের নামীয় 'মহাত্রাণ' সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক সংখ্যায় দাখিল করেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৭

*সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে দানপত্র করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলি সহর পরগণার নকুল বাটি গ্রামে 'আন্দাজী' ১).০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামদুলাল সেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৮

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১).০ একান্ন বিঘা জমি 'সনন্দ' করিয়া দেন। যথা—

বউলপুর ১৮). উখরা পরগণা

পদ্মনাভপুর ১৭). ঐ

মামুদপুর ১৬). হাবিলি শহর পরগণা

এই সকল সনন্দে রামপ্রসাদের নামের পূর্ব্বে 'কবিরঞ্জন' উপাধির উল্লেখ কোথাও নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

অথচ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত সনন্দে দানভাজন ব্যক্তির উপাধি প্রয়োগ করারই ব্যবস্থা দেখা যায়। কারণ ১৭৪৯ সালে ভারতচন্দ্রকে যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে কবির উপাধির স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শ্রীতরঙ্গ শরণং

নকল

শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

সদুদার চরিতেষু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মনো।

নমস্কারঃ শিবং বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ

সপরিবারে অধিকারস্থ হইয়া আনাওরপুর চাকলায় বসতি করিয়াছ অতএব চাকলা মজকুরে বেওয়ারেশ গরজামাই উজ্জট বাস্তু ও লায়েক বাগাতি জঙ্গলভূমি ২১ একইশ বিঘা এবং বেলায়তি সমেত পতিত জঙ্গলভূমি ৫১ একান্ন বিঘা ও একুনে ৭২).০ বাওত্তর বিঘা বৃত্তি দিলাম বাস্তুতে সপরিবারে বসতি করিয়া বাগাতি জমিতে বাগিচা করিয়া জঙ্গলভূমি নিজ জোতে ভোগ করহ ইতি সন ১১৫৬ ছাপান্ন—১ অগ্রহায়ণ।

ইহা হইতে এই সহজ সিদ্ধান্তই আসিতেছে যে ১৭৬০ সালের পূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হয় নাই।

আবার বিদ্যাসুন্দর রচনার নিম্নতম কাল ১৭৭০ সাল। কারণ এই গ্রন্থরচনাকালে রামপ্রসাদের কনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের জন্ম হয় নাই। রামমোহনের জন্মকাল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ বা তাহার দুই এক বৎসর পরেই হইবে।

শ্রীযুক্ত দীনেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—

"রামমোহনের পৌত্র গোপালকৃষ্ণ ২৯।৪।১৮৯৫ তারিখে '৭৩' বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ তাঁহার জন্ম সন ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালে রামমোহনের বয়স ন্যূনকল্পে ৫০ ধরিলে তাঁহার জন্মতারিখ হয় ১৭৭২-৩ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র দুর্গাদাস সেন ১২৯৩-৯৪ সনে 'প্রায় ৮০' বৎসর বয়সে স্বর্গী হন অর্থাৎ অনুমান ১৮১০ সনে তাঁহার জন্ম ধরা যায়। তৎকালে রামমোহনের বয়স ৪০ ধরা যায়। আমরা সম্বাদ দুইটি গোপালকৃষ্ণের পৌত্র মানসবাবু এবং দুর্গাদাসের পৌত্র রামরঞ্জনবাবুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।"[১২]

অতএব বিদ্যাসুন্দর-রচনার কাল যদি ১৭৬০ হইতে ১৭৭০ সনের মধ্যে ধরা যায়, তবে রামপ্রসাদের বয়স তখন ৩৫-৪০ হইবে। কারণ ২২ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করিলে তিনটি সন্তানের পিতা প্রসাদের বয়স তখন স্থূলভাবে অনুরূপই হইবে। ১২৮২-৮৩ সনে দয়ালপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার প্রসাদ প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের পৌত্র দুর্গাদাস এবং দুইজন প্রপৌত্র গোরাচাঁদ ও গোপালকৃষ্ণকে জীবিত পাইয়া তাঁহার গ্রন্থের ২য় সংস্করণে পৃ. ৭৬ লিখিয়াছেন—

'দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দারপরিগ্রহ করেন।"

সুতরাং উপরি-উক্ত গ্রন্থরচনার কালনির্ণয়দ্বারা এবং ঐ সময়ে রামপ্রসাদের ঐরূপ বয়সনির্ধারণে রামপ্রসাদের আবির্ভাবকাল স্থূলভাবে ১৭২০-৩০ সনের মধ্যেই হওয়া যুক্তিসম্মত।"

■ রামপ্রসাদের রচনাসমগ্র

(১) **শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন** ঃ কবি ঈশ্বরগুপ্ত শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন প্রকাশ করেন ১৮৩৩ খ্রীঃ। রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থটি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুর্নমুদ্রিত করেন। ওয়ার্ড সাহেবের বইয়ে এর উল্লেখ আছে। —The Hindoos London, 1822, vol-II ।

গৌরচন্দ্রী — এই অংশটুকু ১২৬১ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়।

(২) **বিদ্যাসুন্দর** ঃ নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর অনুরোধে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। এটি রামপ্রসাদের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ।

(৩) **শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন** ঃ মাত্র দু'পাতার বই। ১২৬০ বঙ্গাব্দে ১লা পৌষ 'সংবাদপ্রভাকর'-এ প্রথম প্রকাশ পায়।

(৪) **নৌকাখণ্ডের সঙ্গীত** ঃ ১২৬১ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র 'সংবাদপ্রভাকর'-এ প্রকাশ পায়।

(৫) **সীতা বিলাপ** ঃ এটি নাতিদীর্ঘ রচনা। ১২৬১ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র

'সংবাদপ্রভাকর'-এ প্রকাশ পায়।

(৬) **শিবসঙ্গীত** ঃ এটিও নাতিদীর্ঘ রচনা। ১২৬১ বঙ্গাব্দে ১লা চৈত্র 'সংবাদপ্রভাকর'-এ প্রকাশিত হয়।

(৭) **পদাবলী** ঃ এর মোট গানের সংখ্যা ২৫৫। তবে গানগুলি যে সবই রামপ্রসাদের সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। এই গানগুলির "সরল ও মর্মস্পর্শী সুর, ঘরোয়া ভাব এবং হৃদয়গলা ভক্তি সহজেই মন টানে।"

(৮) **আগমনী ও বিজয়া** ঃ স্বল্প পরিসরের এক অন্যন্য সুন্দর কাব্য।

■ রামপ্রসাদ নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান

রামপ্রসাদের তিরোধানের পর রামপ্রসাদের স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে হালিশহরে। ১৮৫২ খ্রীঃ 'হালিশহর হিতৈষিণী' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কিছু লোক 'পূর্ণিমাব্রত সমিতি' গঠন করে। এই সমিতি প্রথম রামপ্রসাদের ভিটা জঙ্গল পরিষ্কার করে খুঁজে বের করে। ১৮৮৮ খ্রীঃ 'রামপ্রসাদ স্মৃতি ভাণ্ডার' গড়ে ওঠে রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা কল্পে। ১৯১৪ খ্রীঃ গঠিত হয় রামপ্রসাদ লাইব্রেরী। পরে স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমানে ক্রেগ পার্কের পাশে 'রামপ্রসাদ শহর লাইব্রেরী' নামে পরিচিত হয়। এছাড়া গঠিত হয়েছিল রামপ্রসাদ শিল্পসমিতি, রামপ্রসাদ এ্যাথলেটিক ক্লাব। ১৯২২ খ্রীঃ 'রামপ্রসাদ সম্মেলন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হালিশহরে সমস্ত লাইব্রেরী, ক্রীড়াসংস্থা এরকম অনেক সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৩৫ খ্রীঃ গঠিত হয় 'রামপ্রসাদ নাট্যসমাজ'। ১৯৪১ খ্রীঃ 'রামপ্রসাদ সাহিত্য সম্মেলন' হয়। ১৯৫২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় 'রামপ্রসাদ লীলাকীর্ত্তন সমিতি'। ১৯৭৪ খ্রীঃ হালিশহর পৌরসভা 'রামপ্রসাদ ঘাট' সংস্কার করে। রামপ্রসাদ বিদ্যামন্দির, রামপ্রসাদ খেলার মাঠ ও মঞ্চ, রামপ্রসাদ নগর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে হালিশহরের মানুষ রামপ্রসাদকে এক ঐতিহ্যের পরম্পরায় বেঁধে রেখেছে।

পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডাসন। ছবি : পরিতোষ দাস

শ্রীরামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

(সংগৃহীত তথ্য)

"মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন সহোধর ছিলেন শ্রীরামপ্রসাদ। দক্ষিণেশ্বরে সে মহা অভিমান ভরা উক্তি — মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিলি না। তিনিও ছিলেন তান্ত্রিক। চৌষট্টি তন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ। দুজনে তন্ত্রের পথ ধরে ভক্তির সাম্রাজ্যে মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনিও মাকে গান শোনাতেন। তিনিও বলতেন, আমি কিছুই জানি না। আমি খাই দাই এবং থাকি। আর সব জানেন আমার মা। তিনিও ছুটে ছুটে মায়ের কাছে চলে যেতেন। গল্প করতেন, ঝগড়া করতেন। মান-অভিমান হতো, আবার খেলাও করতেন। তিনি ফুল তুলতেন, বালিকার রূপ ধরে মা জগদম্বাও তার সঙ্গে ফুল তুলতেন, রাসমণিও ঐ বাগানে। তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন জমিদারের অনুগ্রহ। ভক্তিসাধনার এ যেন একই পরিণতি শতাব্দীর এপারে আর ওপারে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধি এবং তাঁর উপদেশ সহজ করার জন্যে রামপ্রসাদের সঙ্গীত প্রয়োগ করতেন। দুজনেই ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেছেন। দুজনেরই এক উপলব্ধি—এ সংসার ধোঁকার টাটি/ ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি। দুজনেরই এক নির্দেশ—ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

দুজনেই বললেন, সব ধর্মই এক। রামপ্রসাদ বলছেন—মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।/যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী।।/আমি বেদাগম-পুরাণে করিলাম/কত খোঁজ তল্লাসি।/এ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম।/সকল আমার এলোকেশী। দুই সাধকেরই এক নির্দেশ—'রিপু ছয় কর জয়।' 'মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা।' ..... রামপ্রসাদ বলেছেন—'বেদ বাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য/সে কথা না ভালো শুনি বুদ্ধির তারল্য/প্রসাদ বলে কালো রূপে সদা মন ধায়/যেমন রুচি তেমনই কর নির্বাণ কে চায়।'

সৌজন্য : *সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়*—সাপ্তাহিক বর্তমান, ২১-১০-২০০০

স্বামী পরমাত্মানন্দ

"মা আর একদিন চলে গেল, রামপ্রসাদকে দ্যাখা দিলি, কই—আমাকে দ্যাখ্যা দিলি নি!" এই ছিল ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের মাতৃমূর্তি দর্শনের জন্য ক্রন্দনের ভাষা যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের। তাঁর আবির্ভাবের মাত্র এক শতাব্দীকাল পূর্বে মাতৃসাধক শ্রীরামপ্রসাদ হালিশহরের নিজ সাধনপীঠে সাক্ষাৎ ঈশ্বর দর্শন করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতোই শক্তিরূপিণী কালিকামূর্তিতে। কালী বা দেবী কালিকা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মহাশক্তির

প্রাণময় প্রকাশ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, আর যখন তিনি এইসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি—শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নাম-রূপ-ভেদ।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬ পৃঃ ৫২) বক্তব্যটি তন্ত্রের দৃষ্টিতেই উচ্চারিত, কারণ তন্ত্রে প্রকৃতিরূপিণী শক্তি নিত্যা ও চিতিরূপা, যা 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'—ব্রহ্মের সমসত্বা, কেবল দৃষ্টিভঙ্গির ভেদ। যদিও ব্রহ্মনিত্য ও শক্তি লীলাময়ী অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী, কিন্তু 'অবতার-বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধ সত্য-ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। ঐ কথার স্বপক্ষে তাঁর অখণ্ড যুক্তিঃ "ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না।" (শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫২) সিদ্ধসাধক শ্রীরামপ্রসাদের ভাষাতেও একই সত্যের অভিব্যক্তি ঃ "কালী নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি।" সর্ব বেদান্তের সার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় একথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ—"সর্বধর্মাণ্ পরিত্যজ্য মামেকংশরণংব্রজ।" এই দুরূহ তত্ত্বটি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর উপলব্ধিজাত সমদৃষ্টি ও সমানুভূতির দৃষ্টান্ত দিতে অতি সহজভাবে বলেছেন ঃ "এক ব্রাহ্মণ যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি-বামুন।" আবার বলেছেন ঃ "কিন্তু একই বস্তু (ব্রহ্মবস্তু) নামভেদ মাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৬৬, পৃঃ ৪০) তাছাড়া জীবনের অধিকাংশ সময়ে গান করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধনসিদ্ধ সাধকদের রচিত মাতৃসঙ্গীত—যা বাংলার ভক্তিরসের বন্যাকে চিরসঞ্জীবিত রেখেছে ও রাখবে।

ভারতের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সর্বজন বিদিত পণ্ডিত-লেখক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর 'বাণী ও বিচার' গ্রন্থের প্রথম ভাগের পূর্বাভাসে লিখেছেন,—"মাতৃসাধক রামপ্রসাদ ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধনার পূর্ববর্তী সাধক (পূর্বসূরী) ও প্রেরণাকেন্দ্র, তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী ও উপদেশের অনুশীলনের সঙ্গে সাধক রামপ্রসাদের স্মৃতির নিবিড় সম্পর্ক থাকা সমীচীন।"

সাধক রামপ্রসাদের তিরোধানের দ্বাদশবর্ষ পরে জন্মগ্রহণ করেন স্বনামধন্যা রমণী রাণী রাসমণি কুমারহট্ট-হালিশহরের গোলাবাড়ি পল্লীতে দরিদ্র মাহিষ্য পরিবারে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনপতি জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় মাত্র ১১ বৎসর বয়সে। কিন্তু মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে স্বামী বিয়োগ হওয়ার পর তিনি রাজচন্দ্রের বিশাল জমিদারীর দায় ভারপ্রাপ্ত হন। রাণী ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, দূরদৃষ্টিসম্পন্না এবং তেজস্বিনী। তাঁর অনন্য দানশীলতা, অভূতপূর্ব ধর্মনিষ্ঠা, দরিদ্রদের হিতসাধন, স্বার্থান্বেষী ইংরেজদের সমুচিত শিক্ষাদান এবং সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্ম সর্বজনবিদিত। মহাতীর্থ-দক্ষিণেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেবীকালিকার

অষ্টনায়িকার অন্যতমা বলেছেন। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরেই ভবতারিণীর সাক্ষাৎকার করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজারী, অগ্রজ রাজকুমারের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় তন্ময় এবং তাঁহার দর্শনলাভে অতিশয় ব্যগ্র হলেন। 'শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'কার স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন—"তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীরে উচ্ছ্বাপূর্ণ ঐ সকল গীতি গাহিতে গাহিতে তাহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন, জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, 'আমি কেন তবে দর্শন পাইব না? ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন,—'মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমার কেন তবে দেখা দিবি না?" আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।' ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী—একই বস্তু। ..... একই ব্যক্তি, নাম-রূপ ভেদ।" 'একই' বলতে সর্বব্যাপক-অখণ্ড-চৈতন্যসত্তা, উপনিষদকার যাকে বলেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এই অদ্বৈত দৃষ্টি জ্ঞানরাজ্যের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বলেছেন ঃ "জ্ঞানই ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুত ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনি সচ্চিদানন্দময়ী।" এই তত্ত্বই দেখি শ্রীরামপ্রসাদের গানে উচ্চারিত ঃ

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে—
সেটা চাতারে কি ভাঙবো হাঁড়ি,
বোঝনা রে মন ঠারে-ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যাঁরে'—অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মেরই তত্ত্ব করছি এবং তাঁরেই (সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকেই) মা মা বলে ডাকছি।

শ্রীরামপ্রসাদ সে মনকে 'ঠারে-ঠোরে' (সাধন সহায়ে) বুঝতে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তা চাতারে হাঁড়ি ভেঙ্গে বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন তাঁর বাণী ঃ "যিনিই শক্তি (সগুণ ব্রহ্ম), তিনিই ব্রহ্ম (নির্গুণ ব্রহ্ম)। পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ।" এই সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুভূতিসিদ্ধ চরমসিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাই শ্রীরামপ্রসাদের উপর্যুক্ত সঙ্গীতে।

সৌজন্য : স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৮, হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব

রামপ্রসাদের ছবি

লন্ডনের শিল্পকলা মিউজিয়ামের পক্ষ থেকে মিসেস আর্চার যিনি ওই মিউজিয়ামের চিত্রকলা বিভাগের কিউরেটার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত একটি সেমিনারে এসে জানান রামপ্রসাদের একটি ওয়েল পেন্টিং লন্ডন মিউজিয়ামে রয়েছে। ছবিটি এঁকেছে আর্থার উইলিয়াম ডেভিস। মিসেস আর্চার লেখক চম্পক চট্টোপাধ্যায়কে ঐ ছবির একটি প্রিন্ট পরে লন্ডন থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন। ছবিটি সম্ভবত ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের আঁকা। চম্পক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"With the gradual expansion of the power of the East India Company in the latter half of the 18th Century a number of artist adventurers were to come to India, the 'Land of the pagoda tree' from Britain in quest of easy gold and in search of the picturesque and exotic. Arther Willium devic was in many ways the most enigmatic among them not excepting Zoffany Thomas and William Daniell and other. Unlike other who came to India by choice. Devis Came more by accident than design in November 1784 Via the Pacific braving shipwreck and injury en route. He lived in India till 1795......

Davis proposed to imclude an engraving of an asectic called Ramprasad out of the well painting already completed by him. A photograph of Ramprasad taken from the original work which is now in Britain is reproduced here. (Courtesy Mr. Mrs. Mildred Archer, the noted authority on us). It shows an ascetic with long hair, with a rosary seated on a platform in front of a larg tree. On the ground in the right hand corner is a stone scuplture. Stylistically the work is unmistakabily Davis. The composition the elegent and simple. And the tree background is characteristically that of Davis one which he used in a very large number of his Indian paintings. The protrate represents possibl the only authentic picture of Ramprasad, the bard saint of Bengal in the 18th century whose devosional songs are to be heard in practically every Bengali home even to day. Although in art there is seldom, if ever conclusive evident, especially so when we are separated from Davis by nearly too centuries, circumstancial factors would lend evident to the fact that Davis actually drew Ramprasad and that this Ramprasad was none other than the Ramprasad Sen we all know through his songs of Bhakti Raga dadicated to the goddess Kali.''

ছবিটি প্রকাশ পাওয়ার পর রামপ্রসাদের মৃত্যুকাল নিয়ে কিছু বিতর্ক দেখা দিয়েছে। ডঃ বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন—''Arthur Willium Davis ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদ সেনের ছবি আঁকার পরিকল্পনা নিয়ে প্রথমে কুমারহট্টে আসেন। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, রামপ্রসাদ অন্তত ঐ সময় পর্যন্ত অবশ্যই বেঁচেছিলেন। ডেভিসের তথ্যাদি পাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা অনেকেই কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিত ১৭ই অক্টোবর বুধবার ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ তারিখটিকেই রামপ্রসাদের প্রয়াণ দিবস হিসেবে গ্রহণ করে এসেছি। কিন্তু পাশাপাশি W. H. Karey সাহেবের মতে, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদের জীবনাবসান ঘটে। অন্যদিকে Edward J. Tomson লিখেছেন, He died (Ramprasad Sen) in 1775. কারো কারো ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেই রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। আবার 'হালিসহরের মানুষ' গ্রন্থের প্রণেতা অগ্রজ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন .... নবাব মীরজাফরের তৃতীয়া বেগমের পুত্র নবাব মুবারকউদ্দৌলার রাজত্বকালে (১৭৭০-১৭৯৩ খৃঃ) রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়।

উপরিউক্ত তথ্যাদির ক্ষেত্রে কোন লিখিত প্রমাণ কেউ উপস্থিত করতে পারেননি। সে তুলনায় শিল্প সমালোচক লন্ডনের শ্রীমতী মাইলড্রেড আর্চার প্রেরিত ডেভিস বিষয়ক তথ্যাদি অনেকখানি বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে আমাদের বিশ্বাস। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদের মৃত্যু যে অন্ততঃ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের আগে হয়নি এ বিষয়ে অধিকতর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তা স্বীকার করা ভিন্ন উপায় নেই।"

(কুমারহট্ট-হালিসহর—দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ ১৯৯৮।

রামপ্রসাদ স্মারক গ্রন্থে (সম্পাদনা সমীরণ দাশগুপ্ত এবং রতনকুমার ঘোষ) 'কবির প্রতিকৃতি ঃ একটি বিতর্ক'—শ্রী হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত অংশে লেখা হয়েছে, 'কলিকাতার এক সংবাদপত্রে (দি ষ্টেটস্ম্যান ৫-৯-৮২) চম্পক চট্টোপাধ্যায় নামীয় এক ব্যক্তির একটি প্রবন্ধ (Portrait of a Mystic) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের আরম্ভেই, বৃক্ষতলে এক বাঁধানো চাতালে উপবিষ্ট এক শীর্ণ রুক্ষ সন্ন্যাসীর ছবি আছে। পরনে কৌপীন-মাথায় আজানুলম্বিত চুল, ডান হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। বাম পার্শ্বে শিলাখণ্ডে খোদিত কালীমূর্তি। এই ছবিটির নীচে লেখা Ramprosad by A. W. Davis. এই ছবিটি নাকি হালিশহরের সাধক রামপ্রসাদের।

আমাদের মতে এ-ছবি আদৌ রামপ্রসাদের নয়। প্রথম ও প্রধান কারণ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মি. ডেভিস ভারতবর্ষে আসেন। তখন সদ্য প্রয়াত সাধক রামপ্রসাদের নামে জন-মানস পরিপূর্ণ। সেই সময়ে হয় শান্তিপুর, নয় হালিশহর, নয় কলিকাতার পথপার্শ্বে উপবিষ্ট কোন সন্ন্যাসীর ছবি এঁকে সেই ছবি সুখ্যাত রামপ্রসাদের নামে চালিয়ে দেওয়া অতি সহজেই হতে পারে এবং হয়েছেও তাই।

'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'র আমলে সাপ, সাধু আর মহারাজার দেশ ভারতবর্ষের যে-ছবি ইংলণ্ডবাসীর চোখে আঁকা ছিল তার সঙ্গে এই বৃত্তিধারী সন্ন্যাসীর ছবি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাছাড়া মি. ডেভিসের এই ছবি আঁকার ব্যাপারে চম্পকবাবুর প্রবন্ধে পারিপার্শ্বিক অবস্থাদৃষ্টের অনুমান নির্ভর' কথাটা বলা হয়েছে। মি. ডেভিসের নিজের কথা কিছু নেই।

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Victoria Memorial Hall-এর হীরক-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে গঠিত এক আলোচনা সভায় ইংলণ্ডে রক্ষিত রামপ্রসাদের 'আসল' তৈলচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এবং পরে চম্পক চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে মিসেস মিলড্রেড আর্চার (Mrs Mildred Archur) ইংলণ্ড থেকে এই তৈলচিত্রের একখানি ফটো পাঠিয়ে দেন। মনে হয় চম্পকবাবুর এই 'Portrait of a Mystic' এখন উক্ত হলেই রক্ষিত আছে। এই ছবি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়োজন।

দীনেশচন্দ্র সেন ("বৃহৎবঙ্গ" গ্রন্থে —প্রথম খণ্ড পৃঃ ২।।/০)
রামপ্রসাদ সেনের সম্পর্কে লিখেছেন "কবি রামপ্রসাদ সেন ও তাঁহার পত্নী যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি হালিশহরবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ মহাশয়ের নিকট পাইয়াছে। একখানি স্বর্ণখচিত সমুজ্জল চণ্ডীমূর্ত্তি দুই পার্শ্বে ভক্তিমান ও ভক্তিমতী ছবি দুইটি দেওয়া হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এই ছবি যখন অঙ্কিত হইয়াছিল তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্বে রামপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তখন হালিশহর অঞ্চলটা রামপ্রসাদের স্মৃতিময়, যে পটুয়া ছবি আঁকিয়াছিল তাঁহার বাড়ি হালিসহর কুমার পাড়া, এই স্থানটি রামপ্রসাদের গৃহ ও 'পঞ্চমুণ্ডি' হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে এক পাড়া বলিলেই হয়। গোপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়িও একমাইলের মধ্যে। এবং তাঁহারই পূর্ব্ব পুরুষ ছবি আঁকাইয়াছিলেন। সেখানকার লোকের মত শুনিয়াছি উক্ত পার্শ্বচর ভক্তদ্বয়ের ছবি রামপ্রসাদও তাঁহার স্ত্রী অনুরূপ। এখন যেমন কালীমূর্তি আঁকিয়ে যাইয়া অনেক সময়ই পরমহংস দেবের ছবিও তৎপার্শ্বে আঁকা হয়, রামপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহারই প্রতিবেশী পটুয়া যে ভক্ত আঁকিতে যাইয়া রামপ্রসাদ ও তাঁহার পত্নীর ছবি আঁকিবে, তাহাও তেমনি স্বাভাবিক। রামপ্রসাদের পত্নী কালীকা দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। একথা কবি স্বয়ং বলিয়াছেন। রামপ্রসাদকে যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছিলেন, জীবনী লেখক অতুলবাবু তাঁহাদের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"রামপ্রসাদের বাবরিচুল ছিল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল, গলায় স্ফটিক মিশানো রুদ্রাক্ষ মালা ছিল, অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন।" (অতুল মুখোপাধ্যায়কৃত রামপ্রসাদের জীবন, ২৫৪ পৃঃ) দাড়ী ছিল না বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু লোকের দাড়ী কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অন্যান্য বিষয়ে এই বর্ণনার সঙ্গে চিত্রের খুব সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।"

সৌজন্য : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, উত্তর ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সূত্রে 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকাটি প্রাপ্ত

তথ্য ও পরিসংখ্যানে হালিশহর

—————————————— গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়

হালিশহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তর ২৪পরগণার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ১৮৫৪ সালে। কালচক্রের আবর্তনে নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এই গৌরবমণ্ডিত বিদ্যালয়টি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বহু টানাপোড়েনের মধ্যে পড়েও সাময়িকভাবে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেও এর অগ্রগতি কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি। ১৯৬০-৬১ সালে বিদ্যালয়টি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৯৬৩তে একাদশ শ্রেণীর কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৪-৭৫ সালে বিদ্যালয়টি অংশকালীন সান্ধ্য শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৫ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ১৫০০। হালিশহরে উচ্চ বিদ্যালয় ও হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটির যৌথ উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে শতবর্ষ উৎসব এবং ১৯৭৯ সালে বিদ্যালয়ের ১২৫ বার্ষিকী উৎসব বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে বিদ্যালয়টি (১৯৯৮) ১৪৪ বছর স্মরণ করে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই বিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তেও ছড়িয়ে আছে। বিদ্যালয়ের কিছু সংস্কারের কাজও হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার; ভারতখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত; বিশিষ্ট বাস্তুকার যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ। বর্তমানে বিদ্যালয়ের সম্পাদক পদে তাপসকুমার দে ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে সম্প্রতি যোগদান করেছেন অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে পৌরোহিত্য করেন তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবাংলায় তদানীন্তন

রাজ্যপাল কৈলাশনাথ কাটজু। এই বিদ্যালয় যাঁদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন দেশনায়ক বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, যোগেশচন্দ্র গাঙ্গুলি, নির্মলচন্দ্র গাঙ্গুলি প্রমুখ। নির্মলচন্দ্রের মায়ের নামে 'অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়। ১৯৭৯ সালে রজত জয়ন্তী এবং ১৯৯৯ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, শিক্ষাবিদরা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সম্প্রতি বিদ্যালয়টিতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক দুলালকুমার দাস ও প্রধান শিক্ষিকা দিপালী (বসাক) বন্দ্যোপাধ্যায়।

হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ

প্রখ্যাত সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন বলেছিলেন—এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা। রামপ্রসাদের নামে বিজড়িত হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ সেই 'মানব জমিন' আবাদের কাজ শুরু করেছিল আজ থেকে ৫২ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে। সেনা বিভাগের পরিত্যক্ত ঘরগুলিতে শুরু হয়েছিল প্রথম স্কুল। এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন 'মনোমোহন সোম'। ১৯৪৮ সালে ২৫/৩০জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে শুরু হয়েছিল এই বিদ্যালয়। এখন এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১২০০। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, রেল কলোনীর সকল আবাসিকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও প্রচার। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। ১৯৯৮ সালে সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে পালিত হয়। বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।

হালিশহরের মঠ-মন্দির-মসজিদ

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্দির

১৯৭৭ সালে হালিশহর তেঁতুলতলায় ঘোষপাড়া রোডের পাশে 'সৎসঙ্গ বিহার বিজপুর' প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান মন্দিরটি পঞ্চচূড় বিশিষ্ট আধুনিক স্থাপত্যে গড়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদ মঠ ও মিশন

হালিশহর বলুরপাড়া, হাজিনগর, আই পি পি গঙ্গার ঘাটে ১৯৯৯ সালে স্বামী আগমানন্দর ব্যক্তিগত চেষ্টা ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতায় শ্রী রামপ্রসাদ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। মঠের মূল উদ্দেশ্য, রামপ্রসাদের সঙ্গীতের ভাবধারাটি চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া।

আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ (স্বামী নিগমানন্দ আশ্রম)

রাধাকান্তপুরের শ্রী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন হালিশহর খাসবাটীর বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুবালা দেবীকে (১৩০৪)। সুধাংশুবালার মহাপ্রয়াণের পর নলিনীকান্ত স্ত্রীর ছায়ামূর্তির দর্শন পান এবং তারপরই তাঁর জীবনের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। পরে কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন স্বামী। 'জ্ঞানীগুরু', 'যোগীগুরু', 'তান্ত্রিকগুরু' ও 'প্রেমিকগুরু' বই চারটি সাধনজগতের এক পরম সম্পদ। নলিনীকান্ত পরবর্তীকালে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী নামে বিখ্যাত হন। তিনি 'শংকরের মত ও গৌরাঙ্গের পথ'-এ বিশ্বাসী ছিলেন। গঙ্গাতীরে মন্দিরটি খুবই মনোরম। বাগানটিও আকর্ষণীয়। স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেবের প্রতিষ্ঠিত 'আর্যদর্পণ' মাসিক পত্রিকাটি ভক্তপ্রাণ নর-নারীদের কাছে খুবই আদৃত। এই সারস্বত মঠে তাঁর দেহ শায়িত আছে। স্বামীজির জন্ম-জয়ন্তী ছাড়াও নানা ধরনের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বর্তমান মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

শ্যামাসুন্দরী মন্দির (খাসবাটী)

খাসবাটীতে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামে এক সাধক শ্যামাসুন্দরী তলায় পাষাণময়ী দক্ষিণা কালিকা মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে খাসবাটীর বিশিষ্ট ব্যক্তি হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর পুজোর ভার ন্যস্ত হয়। তাঁরই বংশধর হরেন্দ্রনাথ ও সমর বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দিরটি দেখভাল করছেন। বর্তমান মন্দিরটি সংস্কার করায় সুরক্ষিত অবস্থায় আছে।

শ্রীপরমানন্দ যোগানন্দ যোগাশ্রম

হালিশহর কোনা অঞ্চলে ১৩৭১ বঙ্গাব্দে স্বামী যোগানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু পরমানন্দ পরমহংস। মন্দিরটি গঙ্গার তীরে এক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। এখানে যোগানন্দজির দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছে। যোগানন্দজির স্মরণোৎসব ছাড়াও দু'একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন বর্তমান আশ্রম কর্তৃপক্ষ।

শংকর স্বরূপ যোগমঠ (স্বামী স্বরূপানন্দ আশ্রম)

স্বামী স্বরূপানন্দজির অন্যতম এক ভক্ত রোহিনীকুমার রায়চৌধুরী স্বামীজির আদেশে হালিশহরে স্টেশন রেল বাউন্ডারীরোডে বাড়ির পাশে সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে একটি সুদৃশ্য মন্দির স্থাপন করেন। ১৩৫৭তে স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ নবনির্মিত আশ্রমে শুভাগমন করেন। এখানেই তাঁর মহাসমাধি রক্ষিত

আছে। বর্তমান স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজি মঠটির রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বে আছেন।

বৈদ্যপাড়ার দুটি মৃৎকারু শিল্প মন্দির

ঘোষপাড়া রোডের পশ্চিমপাশে, গঙ্গার গা ঘেঁষে শিব মন্দির দুটি অবস্থান করছে। আনুমানিক প্রায় ৩৫০ বছর পূর্বে মন্দির দুটি কেন কারা নির্মাণ করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। অপূর্ব মৃৎকারু শিল্পের নিদর্শন ছিল এক সময়। এখন শুধুই ধ্বংসস্তুপের আকারে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শিবের গলির জোড়া শিবমন্দির

১২৬ বছর পূর্বে হালিশহর অধিবাসী রাম গোবিন্দ ঘোষাল পঞ্চচূড় বিশিষ্ট দুটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নিঃসন্তান রামগোবিন্দ পুত্রের মানসে দুই স্ত্রীর নামে দুটি মন্দির স্থাপিত করেন। কিছুদিন নিত্যপুজো চলার পরে কোন এক বিশেষ কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি শিবের গলিতে 'শিবের গলি জোড়া শিব মন্দির উন্নয়ন সংস্থা' গঠিত হয়েছে। তারা এই শিবমন্দির দুটি সংস্কার সাধন করে। এই সংস্থার নবীন সদস্য প্রদীপ পাত্র মন্দির গাত্রে ছোট-বড় ৫০টি মূর্তি অঙ্কিত করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

বারেন্দ্রগলির চারটি শিবমন্দির

মদনগোপাল রায় বারেন্দ্রগলিতে এই চারটি শিব মন্দির ১১৫০ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির চারটির দুটি পুবমুখী ওদুটি পশ্চিমমুখী সামনাসামনি অবস্থিত। উত্তর দিকের দুটি মন্দির গাত্রে অপরূপ মৃৎকারু শিল্পের নিদর্শন আছে। প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখযোগ্য কিছু চিত্র মন্দির গাত্রে অঙ্কিত আছে। এই মন্দিরগুলি নির্মাণে হালিশহরের শিল্পীরা মৃৎকারু শিল্পের কাজে যে অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সমগ্র বাংলার এক বিরল দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার মন্দিরটি অধিগ্রহণ করলেও ভারতের জাতীয় সম্পত্তিটি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ না করার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে চলেছে।

বাগের মসজিদ

হালিশহরের শাসনকর্তারূপে নির্বাসিত ব্যক্তি হয়ে এখানে প্রথমে আসেন আহম্মেদ বেগ এবং তার কিছুকাল পরে আসেন মালেক বারখোরদার। যে কোন কারণেই হোক আহম্মেদ বেগের কার্যকাল সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে শাসনকর্তারূপে আসেন 'মালেক বারখোরদার' এই নামই ক্রমশঃ 'মল্লিক খোরদার' নামে পরিচিত হয়। এবং পরবর্তীতে 'মল্লিকবাগ' নামে পরিচিত। মুসলমানদের নমাজ পড়ার জন্য

এখানে ১৬৮৭ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। দিল্লি থেকে পানি বক্কর সা' কে এনে এই বাগের মসজিদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩০০ বছরের ওপরে স্থাপিত এই মসজিদটি তিনটি গম্বুজ ও চারটি মিনারের সমন্বয়ে গঠিত। প্রাচীন স্থাপত্যের এক নিদর্শন এই বাগের মসজিদ। সংস্কারের এবং উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অতীত ঐতিহ্যপূর্ণ মসজিদটি ক্রমশ ভগ্নস্তুপে পরিণত হতে চলেছে।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর স্মৃতি মন্দির ঃ (শ্রীচৈতন্যডোবা)
কুমারহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যামানন্দের পুত্র ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর সুযোগ্য শিষ্য। বৈষ্ণবসাধক ঈশ্বরপুরী ছিলেন আবার শ্রীমৎ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। এইখানে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ 'শ্রীচৈতন্য ডোবার' সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরপুরী স্মৃতি মন্দিরে দোল ও মহাপ্রভুর শুভাগমনী তিথি উৎসব দুটি আজও সমানভাবে চলছে।

সিদ্ধেশ্বরী স্মৃতি মন্দির ঃ (বালিদাঘাটা)
হালিশহর ভূ-স্বামী সাবর্ণ চৌধুরী বংশজ বিদ্যাধর রায়চৌধুরী স্থাপিত মূর্তিটি বাজার পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করা হলেও পরে মায়ের প্রত্যাদেশ পেয়ে মূর্তিটি বালিদাঘাটায় স্থানান্তরিত করা হয়। প্রায় তিনশ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পাশে একটি শিবমন্দির ও নাটমন্দির আছে। মায়ের মন্দির, শিবমন্দির দুটি ভক্তপ্রাণ নর-নারীদের সহযোগিতা ও সাহায্যে গড়ে তুলেছেন। নাটমন্দির ও গঙ্গার ঘাটটি হালিশহর পৌরসভার কর্তৃক নির্মিত হয়।

হালিশহরের রাস্তা

(১) ঘোষালপাড়া ঃ আড়িয়াদহের ঘোষাল পদবীধারী অনেক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবার এ অঞ্চলে বসবাস করার কারণে এর নাম হয় ঘোষাল পাড়া। **(২) কালিকাতলা ঃ** সাবর্ণ চৌধুরী বংশজ বিদ্যাধর রায় চৌধুরী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে গঙ্গা গর্ভ থেকে এক শিলাখণ্ড পান। ঐ শিলাখণ্ড থেকে কালিকা মূর্তি নির্মাণ করে এখানে বসান হয়। সেই থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয় কালিকাতলা।
(৩) মান্নাপাড়া ঃ এ অঞ্চলে দীর্ঘদিনের বাস মান্না পরিবারের। ঐ পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি গোলোকচন্দ্র মান্না। তাঁর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় মান্নাপাড়া। **(৪) রামসীতা গলি ঃ** এখানে একটি পুকুর (ঠাকুরপুকুর) কাটার সময় রামসীতার মূর্তি পাওয়া যায়। পরে রামসীতার মূর্তি গড়ে পুজো করা হত। তদনুসারে এর নাম হয় রামসীতা গলি। **(৫) মল্লিক বাগ ঃ** হালিশহরের

শাসক 'মালেকবার খোরদার' ও 'আহমেদ বেগ' এর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের নাম হয় 'মল্লিক বাগ'। **(৬) গোলাবাড়ি ঃ** ব্যবসায়ের বিভিন্ন মালপত্র রাখার জন্য অনেক গোলাঘর এখানে তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণে এই অঞ্চলের নাম গোলাবাড়ি। **(৭) আচার্যপাড়া ঃ** মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর (ঈশ্বরচন্দ্র আচার্য) পিতা শ্যামসুন্দর আচার্যের নামে রাস্তাটির নাম হয় আচার্যপাড়া। **(৮) সরকারপাড়া ঃ** রামচন্দ্র দে'র পুত্র জনার্দন বল্লভ দে এই অঞ্চলে ছোট জমিদার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন এবং সরকার কর্তৃক 'সরকার' পদবী লাভ করেন। তিনি তখন 'দে' পদবী ত্যাগ করে 'সরকার' পদবী গ্রহণ করেন। এভাবেই ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের নাম হয় 'সরকার পাড়া'। **(৯) পূর্বাচল ঃ** ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন দেওয়া হয় এখানে। পূর্ব থেকে আসর কারণে এই অঞ্চলের নাম হয় পূর্বাচল। **(১০) কল্যাণগড় ঃ** দেশভাগের পর ওপার বাংলার নিরাশ্রয় মানুষদের সরকার ধুবুলিয়া ক্যাম্প থেকে এই স্থানে বসবাসের জন্য জমি দেন। তখন এখানকার বসবাসকারী মানুষ এর নাম দেন কল্যাণগড়। **(১১) রেল বাউনডারি রোড ঃ** হালিশহর রেল ইয়ার্ডের যে পাঁচিল তাঁর বরাবর এই রাস্তাটি। সে কারণে এর নাম রেল বাউনডারি রোড। **(১২) কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত রোড ঃ** ভারতের প্রথম এফ আর সি এস কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত-র নামানুসারে হালিশহর স্টেশন রোডের নাম পরিবর্তন করে কর্ণেল কে পি গুপ্ত নাম রাখা হয়। **(১৩) খাসবাটী ঃ** বাংলাদেশ থেকে এই বাংলায় এসেছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। খাসকুলীন ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বাড়ির নামকরণ করেন 'খাসবাটী'। তখন থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয় খাসবাটী। **(১৪) শিবের গলি ঃ** সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর বিদ্যাধর রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন এই বুড়ো শিবের মন্দির। এই শিবের মন্দিরের নামেই এই রাস্তার নাম শিবের গলি। **(১৫) বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি সরণি ঃ** বুনাঘাটার নাম পরিবর্তন করে হালিশহরের কৃতী সন্তান ও অগ্নিযুগের বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলির নামানুসারে এই রাস্তার নামকরণ করা হয়। **(১৬) ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সরণি ঃ** পূর্বে ঠাকুরপাড়া রোড বর্তমানে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সরণি। তিনি ছিলেন সমাজসেবী ও প্রাক্তন উপ পৌরপ্রধান। **(১৭) বারেন্দ্রগলি ঃ** বারেন্দ্র বংশোদ্ভুত রায় পরিবারের লোকেরা বসবাস করতেন এখানে। তাঁদের বংশের নামানুসারে এই নামের উৎপত্তি। **(১৮) বালিদাঘাটা রোড ঃ** এখানে একসময় ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধ ছিল। যার ফলে গরুরগাড়ির সমাগম হত প্রচুর। সেই থেকে বলা হত বদলঘাটা। পরে তা রূপান্তরিত হয় বলিদাঘাটা নামে। **(১৯) পি এস বণিক সরণি ঃ** শিকদারপাড়া লেন পরিবর্তন

করে পি এস বণিক সরণি করা হয়। প্রাণশংকর বণিক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধ প্রতিষ্ঠা আইন ব্যবসায়ী। তিনি হালিশহর পৌরসভার কমিশনারও ছিলেন। (২০) **চৌধুরী পাড়া ঃ** কুমারহট্ট-হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীর আদিবাস ছিল হালিশহর চৌধুরী পাড়ায়। তাঁদের বংশের নাম অনুসারেই এ অঞ্চলের নাম হয় চৌধুরী পাড়া। (২১) **পুরোহিত পাড়া ঃ** নিষ্ঠাবান পুরোহিতের প্রয়োজন অনুভব করে স্থানীয় কিছু লোক ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদ থেকে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামে এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এনে বসবাস করান। সেই থেকেই এই অঞ্চল পুরোহিত পাড়া নামে পরিচিত। (২২) **বাজারপাড়া ঃ** এই অঞ্চলে কালিকাতলা বাজার অবস্থিতির জন্য এটাকে বাজার পাড়া বলা হয়। (২৩) **বিজপুর রোড ঃ** তেঁতুলতলা থেকে যে রাস্তাটি বিদেশ সঞ্চার নিগমের পাশ দিয়ে চলে গেছে বিজপুর থানা অবধি। সেহেতু এর নাম হয় বিজপুর রোড। (২৪) **পুরানো বারুই পাড়া ঃ** ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ এখনকার বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ এপার বাংলায় চলে আসে। বারুজীবীদের একটা অংশ এখানে এসে বসবাস শুরু করেন সেই কারণেই নাম হয় পুরানো বারুই পাড়া। (২৫) **রানী রাসমণি ঘাট রোড ঃ** বাগমোড় থেকে যে রাস্তাটি লোকমাতা রানী রাসমনির জন্মভিটের দিকে গঙ্গার ধারে চলে গেছে। তাঁর নামই রানী রাসমনি ঘাট রোড। (২৬) **কাঁসারী পাড়া ঃ** কেদারনাথ দত্ত নামে এক কংসবনিক (কাঁসারী) বাস করতেন এখানে। তাছাড়া আরো কিছু কাঁসারী পরিবারের বাসছিল এ অঞ্চলে। সেহেতু এর নাম হয় কাঁসারী পাড়া। (২৭) **নিরঞ্জন সমাজপতি সরণি ঃ** পূর্বের ট্রেনচিং গ্রাউণ্ড রোড যেটি সরকার বাজার থেকে লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনীর দিকে চলে গেছে সেটি বর্তমানে নিরঞ্জন সমাজপতি সরণি। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা। (২৮) **বলুড়পাড়া ঃ** ঘোষপাড়া রোড থেকে যে রাস্তাটি পেপারমিলের পাশদিয়ে গঙ্গার দিকে চলে গেছে তার নাম বলুড় পাড়া। (২৯) **শ্যামাসুন্দরী লেন ঃ** শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে তার নাম শ্যামাসুন্দরী লেন। শ্যামাসুন্দরী কালীমন্দির এর কারণেই এই নামকরণ। (৩০) **মুখার্জিপাড়া ঃ** যদুনাথ মুখার্জি নামে এক মুখার্জি পরিবার এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। এই মুখার্জি পরিবারের পূর্ব নিবাস ছিল বর্ধমানে। এই মুখার্জি পরিবারের বাস থেকেই এর নাম হয় মুখার্জি পাড়া। (৩১) **এইচ কে ভাটার রোড ঃ** হাজিনগরস্থ হুকুমচাঁদ জুট মিলের পরিচালকমণ্ডলীর একজন কর্তাব্যক্তি হরকিষেণ দাস ভাটার নাম অনুসারে রাস্তাটির নাম এইচ কে ভাটার রোড। (৩২) **দত্তপাড়া ঃ** আদিশূরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থ এসেছিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত ছিলেন তাঁদের

একজন। পরে কয়েক পুরুষ ধরে দত্ত পরিবারের এখানে বাস। সেই থেকে এর নাম হয় দত্ত পাড়া। (৩৩) বৈদ্যপাড়া ঃ হালিশহরের এই অঞ্চলে বৈদ্যদের দীর্ঘদিনের বাস। কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত, কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, ব্যরিস্টার এন এন গুপ্ত, ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত একদা এখানে বাস করতেন। এখনও কিছু বৈদ্য পরিবার এখানে বাস করেন। বৈদ্যদের প্রাধান্য হেতু এর নাম হয় বৈদ্যপাড়া।

স্বদেশি আন্দোলনে হালিশহরের ভূমিকা

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে হালিশহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে যিনি নের্তৃত্ব দেন, তিনি হলেন 'আত্মোন্নতি সমিতি'র কর্ণধার বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি। বাঘাযতীনের সহযোগী বিপিন গাঙ্গুলি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক।

পরবর্তীকালে নির্যাতিত দেশ কর্মী সুশীলকুমার ঘোষ অসাধারণ সাংগঠনিক নৈপুণ্যের পরিচয় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিগত সচিবের পদ অলংকৃত করেন। নেতাজির আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বীর সেনানী মেজর ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। এছাড়া বাংলার স্বদেশি আন্দোলনে সে সবদেশপ্রেমী অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (নেপু), নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কানাইলাল রায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, উমাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ভট্টাচার্য, বিজন বিহারী দত্ত, গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। এর নেতৃত্ব দেয় মঙ্গল পাণ্ডে। সেইসময় বারাকপুরের সেনানিবাসে হালিশহরের অধিবাসী রাজীবলোচন ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর সহযোগী সুশীলকুমার ঘোষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হালিশহরে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আগমন ঘটে।

বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরের এক সর্বজন সমাদৃত বংশের কৃতী সন্তান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। ১৮৮৭ সালে তাঁর জন্ম হয় হুগলী জেলাতে। অতি শৈশবেই রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পড়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হন। বিদ্যালয় ছাত্রবস্থায় ব্লকম্যান সাহেবের লেখা ভুগোল 'বাঙালি এক দুর্বলচেতা নিরীহজাতি' পড়ে বিশেষ অপমানিত বোধ করেন। আর সেই সময় থেকেই বাঙালীকে সবল ও দুর্ধর্ষ জাতি হিসেবে গড়ে

তোলবার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯০৩ সালে কলেজে পড়াকালীন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, লোকমান্য তিলক, শ্রী অরবিন্দ, ব্যারিষ্টার পি মিত্র, পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, 'ডন সোসাইটি'র সতীশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। এই সময় বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) প্রমুখের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১৪ সালের ২৬ অগস্ট প্রকাশ্য দিবালোকে চারজন বিপ্লবী সুকৌশলে লুঠ করলেন ৫০টি মাউজার পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ। ছিয়াশি বছর আগের ঐ ঘটনাটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। এই ঘটনার মহানায়ক ছিলেন বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি। ১৯১৫ সালে গার্ডেনরীচ, আগড়পাড়া, বিক্রমপুর (ঢাকা) প্রভৃতি স্থানে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এইসময় বাঘা যতীন, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (এম এন রায়) অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীকে সহযোগী হিসেবে লাভ করেন।

১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে লবণ আইন আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেপ্তারবরণ করেন। ১৯৩১ সালে কুমিল্লায় জেলা সম্মেলন ও ত্রিপুরী জেলা ছাত্র-ছাত্রী অধিবেশনে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ও দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করে উভয় সভাতেই বক্তব্য রাখেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কারাবরণ করেন।

গান্ধী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী হয়ে লেনিনের সাহিত্যও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছিলেন এবং তাঁদের দুজনের প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মদেশের মান্দালয়, রেঙ্গুন, দিল্লি, আলিপুর, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি কারাগারে দীর্ঘ আটাশ বছর তাঁকে বন্দীজীবন-যাপন করতে হয়েছে।

১৯৫৪ সালে ৬৭ বছর বয়সে এই সর্বত্যাগী বিপ্লবীর তিরোধান ঘটে।

হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটি

১৮৫৪ সালে হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে 'হিতৈষনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা খাসবাটীর যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৮২ সালে পূর্ণিমা ব্রত সমিতি গঠিত হয়। ১৮৮৪ সালে পূর্ণিমা ব্রত সমিতি হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটিতে রূপান্তরিত হয়। এই ফ্রেটারনিটির উদ্যোগেই হালিশহরে জনসেবামূলক কাজ

শুরু হয়। হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় ও হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় দুটিরই প্রতিষ্ঠাতা হল এই প্রাচীন সংস্থাটি। ফ্রেটারনিটির পরিচালনায় বাৎসরিক কালীপুজো ও ২৬ জানুয়ারি অন্নকূট মহোৎসব যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়। ফ্রেটারনিটির উদ্যোগে জনসাধারণের সহযোগিতায় আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রামপ্রসাদ ভিটের সংস্কারসাধন করা হয়েছে। বর্তমানে যাত্রী নিবাসের কাজ শুরু করা হয়েছে। হালিশহরের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেছেন। বর্তমানে ফ্রেটারনিটির সভাপতি এবং সম্পাদকের পদে আসীন রয়েছেন যথাক্রমে রতনকুমার ঘোষ ও কার্তিক চক্রবর্তী।

হালিশহর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

প্রায় ৫৬ বছর পূর্বে হালিশহর সঙ্গীত প্রতিযোগিতার শুভারম্ভ চঞ্চলকুমার ভট্টাচার্য, অমিয় সেন ও গোবিন্দ শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উৎসাহী যুবকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও রাধিকারঞ্জন সেনের সক্রিয় সহযোগিতায়। ঠাকুরপাড়ার সেন বাড়িতে মাত্র দশজন প্রতিযোগী নিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় বাংলার নামীদামী প্রতিযোগিতা এখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, প্রভাতী মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, পূরবী দত্ত, মণিমালা শীল, তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিচারক হিসেবে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঙ্কজ মল্লিক, রথীন ঘোষ, জয়কৃষ্ণ সান্যাল, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শচীন দাস, মতিলাল, দুর্গা সেন, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। এই সমিতির সঙ্গে যাঁরা একদা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, পুলিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, দুর্গাচরণ ঘোষ, সৌরেন্দ্রনাথ পালিত, দুলালচন্দ্র দত্ত, নীহার মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুধীরকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

সুষ্ঠুভাবে যাঁদের পরিচালনায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এখন চলছে তারা হলেন, দুর্গাপদ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি পরমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য।

হালিশহর শরৎ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা

শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হল হালিশহর। হালিশহরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

হালিশহর শরৎ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা সুদীর্ঘ ৩২ বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হালিশহর তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মনীষীদের জন্মজয়ন্তী ছাড়াও হালিশহরের কৃতী সন্তানদের জনগণের কাছে তুলে ধরার বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। সংস্থার উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলি যথাক্রমে, মহান বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, খ্যাতনামা কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার জন্মশতবর্ষ উৎসব, পুণ্য শ্লোকারানী রাসমণির দ্বিশতবর্ষ এবং ভক্তকবি সাধক রামপ্রসাদের ২৭৫ জন্মোৎসব, কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ ও কথাসাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উৎসব যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপন। বর্তমানে এই সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পদে উপবিষ্ট আছেন যথাক্রমে গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, অমলকৃষ্ণ ভৌমিক ও মিহিরকুমার দত্ত।

হালিশহরের সাহিত্য সাধনায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গ *

(হালিশহরে জন্ম/আদিনিবাস/বাসিন্দা)

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৮৬১ সালে বিহারের মতিহারীতে নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁর আদিনিবাস ছিল ২৪ পরগণার হালিশহরে। নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা বাংলা কিছু কবিতা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। লাহোরের 'ট্রিবিউন', এলাহাবাদের 'লীডার' ও করাচির 'ফিনিক্স' পত্রিকার সম্পাদনা করে সারা ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকগুলি হলো 'স্বপন সঙ্গীত', 'লীলা তপস্বিনী', 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী', 'রথযাত্রা' ও অন্যান্য গল্প। সাংবাদিক-সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে লোকান্তরিত হন।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৪)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ১৮৫৪ সালে ২৪ পরগণার হালিশহর বারুইপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। 'প্রভাতী' সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতার হাতেখড়ি। কিছুদিন 'বসুমতী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে আসীন থেকে যোগ্যতার ছাপ রাখেন। শেষে তিনি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'শশীপ্রভা' নাটকটি একসময় খুবই জনপ্রিয়

* 'দর্পণে হালিশহর : সাহিত্যের আঙিনা' প্রবন্ধে আলোচিত ব্যক্তিবর্গকে গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় অনুল্লেখ করা হয়েছে। —সম্পাদক

হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' হতে প্রকাশিত 'রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী'র সম্পাদনা করা। ১৯৩৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বৃন্দাবন দাস

শ্রীবাস পণ্ডিতের অনুজ শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস (১৫১৮-১৫৮৯)। পিতা বিপ্রবৈকুণ্ঠ দাস। কুমারহট্ট—হালিশহরের মানুষ বৃন্দাবন দাস ছিলেন নিতানন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরমভক্ত। বৃন্দাবন দাসের রচিত গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য ভাগবত', এটি বৈষ্ণর্ব সমাজের একটি আকরগ্রন্থ। তৎকালীন বাংলার সামাজিক, লৌকিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত তাঁকে 'চৈতন্য-লীলার ব্যাস' বলা হত।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ হালিশহর—কুমারহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম অ্যান্স্‌লি ও অন্যান্য সিভিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে পড়াকালীন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তক দুটি ঃ 'সেতু সংগ্রহ', 'খোস গল্পসার'।

অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়

হালিশহর রামসীতা গলির অধিবাসী অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৭—১৯৬৪) কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের কর্মী ছিলেন। সুকণ্ঠের অধিকারী অমূল্যচরণের অতি শৈশব হতে সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ছিল। সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনকে কেন্দ্র করে 'রামপ্রসাদ লীলা কীর্তন' তাঁর অনন্য সৃষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে এই লীলা কীর্তন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্নস্থানে পরিবেশিত হচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্য জীবনকে নিয়ে 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দলীলা তাৎপর্য'টি তাঁর আরেক সৃষ্টি। তিনি 'রামপ্রসাদ' নামে একটি নাটকও রচনা করেছিলেন।

স্বামী পুরাতনানন্দ

হালিশহরের অধিবাসী ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রটি বর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের প্রক্টার।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১—১৯৬০)

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হালিশহর তাঁর পিতৃভূমি। উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের মামা। বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত বইগুলি 'দিকশূল', 'রাজপথ', 'অন্তরাগ', 'স্মৃতিকথা' (চারখণ্ড)। একাধিক পুরস্কারে ভূষিত উপেন্দ্রনাথ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নরসিংহ দাস পুরস্কারও লাভ করেন। ১৯৬০ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত (১৯২০—২০০০)

কটকে জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস হালিশহর। শ্রী চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ কড়চা লেখক মুরারী গুপ্ত ছিলেন এঁর পূর্ব-পুরুষ। পিতা ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ বিপনি বিহারী গুপ্ত। বাংলা, ইংরেজি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, প্রবন্ধ, পাঠ্য পুস্তকের সমালোচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত বইটি 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ'।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হালিশহর খাসবাটীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আবৃত্তিকার ও অভিনেতা হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। সুবক্তা হিসেবেও তাঁর পরিচয় ছিল। ভ্রমণ সাহিত্যের ওপর অনেকগুলি বই লিখেছিলেন। বইগুলি হল 'শংকর নর্মদা', 'নর্মদা আবার', 'মনমধুকর' প্রভৃতি। অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় রেখেছেন।

অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়

১৯০৭ সালে কলকাতার এক উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতা পেশায় ছিলেন আইনজীবী। পিতামহ সাংবাদিক তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। হীরেন মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র জীবন কৃতিত্বে উজ্জ্বল। হীরেন মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (রিপন) ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। লোকসভায় কমিউনিস্ট দলের ডেপুটি লিডার, বাগ্মী ও সুপণ্ডিত হিসেবে পরিচিত। একাধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর নামী বই 'তরী থেকে তীর'। হীরেনবাবুর আদি নিবাস ছিল হালিশহর।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮২—১৯২৬)

১৮৮২ সালে উত্তর ২৪ পরগণা হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্যাতিমান বাস্তুকার।

পেশায় পূর্তবিদ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ইংরেজি ও বাংলা বিষয়ে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল 'স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা', 'ওড়িষ্যার দেবদেউল', 'Swami Vivekananda : a Study' প্রভৃতি। 'মহাবোধি সোসাইটি', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রভৃতির সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বেদান্তদর্শন এবং স্থাপত্য বিজ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পান। ১৯২৬ সালে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায়

হালিশহর অধিবাসী কবি ও সাংবাদিক বামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। তিনি 'ক্ষমা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'ব্যাসকূট' তাঁর অন্যতম কাব্যগ্রন্থ।

লক্ষ্মীনারায়ণ পাড়ুই

হালিশহরের অধিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ পাড়ুই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন।

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হালিশহর পৌরসভার কর্মী ছিলেন। এখন অবসর যাপন করছেন। সুকণ্ঠের অধিকারী প্রভাসচন্দ্র একজন আবৃত্তিকার। কবিতা, গল্প ও শ্রুতিনাটক লিখে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন।

কিশোরী দাস বাবাজী

জন্ম মেদিনীপুর জেলায়। বর্তমানে শ্রীপদ ঈশ্বরীপুরী স্মৃতি মন্দিরের (শ্রী চৈতন্য ডোবা) মঠাধ্যক্ষ। একাধিক পুস্তক রচয়িতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি 'জগৎগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত', গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম', 'বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ' প্রভৃতি। 'বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ', 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। বৈষ্ণব রিসার্চ সেন্টার স্থাপন তাঁর অন্যতম

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়

হালিশহর খাসবাটীর অধিবাসী ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় কৃতি অধ্যাপক হিসেবে বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক সংস্কৃতি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। কল্যাণী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ চট্টোপাধ্যায় মাসিক,

সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইটির নাম 'লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ' ও 'স্বরূপ সন্ধান'। দেশ-বিদেশের বহু জায়গায় আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার লোকধর্ম ও লোকায়ত সাহিত্য প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

ডঃ রামেশ্বর শ'

হালিশহরের খাসবাটীতে ১৯৩৬ সালে ডঃ রামেশ্বর শ' জন্মগ্রহণ করেন। হালিশহরের এই কৃতী ছাত্রটি প্রথমে হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন। ডঃ শ' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। একাধিক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। সুবক্তা হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। উল্লেখযোগ্য রচিত পুস্তকগুলি 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস', 'বাংলা ভাষা তথ্য ইতিহাস', 'অরবিন্দ ঃ জীবন ও প্রতিভা' ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্ববিদ ডঃ শ' শ্রী অরবিন্দের 'ভবিষ্যতের কবিতা' গ্রন্থটি অনুবাদ করে আকাডেমি পুরস্কার পান।

শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য

হালিশহর সরকার পাড়ায় (১৮৫৮ সালে) শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ ও বি এল পাশ করে ওকালতি শুরু করেন। বহু সাহিত্য পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগও 'বঙ্গবাসী', 'সোমপ্রকাশ', 'নবজীবন', 'স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি। অতি শৈশব থেকে ধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। সংসার ত্যাগ করে তিনি কাশী ও পুরীতে কিছুকাল অবস্থান করেন। পরে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন এবং পরমানন্দ তীর্থস্বামী নামে পরিচিত হন। তিনি শেষ জীবনে গোবর্ধন মঠে 'শঙ্করাচার্য' পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ তিনি মর্তধাম ত্যাগ করে দেবলোকে গমন করেন।

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২ সালে হালিশহর ২৪ পরগণায় তাঁর জন্ম হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ভারতীয় প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনা করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়,

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ দিকপাল অধ্যাপকরা তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল 'কলকাতা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ১৯৫৬তে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

বেণীমাধব ভট্টাচার্য

১৮৬৮ সালে হালিশহরে বৈদিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন বেণীমাধব ভট্টাচার্য। হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তিনি। বেণীমাধববাবু বি এ, বি টি পাশ করে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। ১৮৯১ সালে মুখার্জি সেমিনারীতে শিক্ষক ও পরবর্তীকালে প্রধান শিক্ষক হন। শেষ জীবনে বারাকপুর দেবীপ্রসাদ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বেণীমাধব ভট্টাচার্য একাধিক সমাজসেবীমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর লেখা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি সে যুগে বুদ্ধিজীবী মহলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ভবতোষ চক্রবর্তী

নবনগর শান্তি পল্লির অধিবাসী ভবতোষ চক্রবর্তী হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ছোট থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। বর্তমানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি 'দৈনিক পত্রিকায়' সাংবাদিকতা করছেন।

রমেন বসু

১৯৩৭ সালে জন্ম কুষ্টিয়া জেলায়, বর্তমানে হালিশহর নবনগরের অধিবাসী। কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কশপের উচ্চপদে আসীন থেকে বর্তমানে অবসর জীবনযাপন করেছেন। সুকবি হিসেবে তাঁর একটা বিশেষ পরিচিতি আছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি 'বিষাদ' 'শিউলিফুল', 'আহত যৌবন' এবং শুধু 'তোমারই জন্যে' ইত্যাদি।

ডঃ অমরচন্দ্র সাহা

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। বর্তমানে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যাপক। বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় সিদ্ধহস্ত।

ডঃ রবীন মুখোপাধ্যায়

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের রীডার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য। তিনি হোমিওপ্যাথির একজন সুচিকিৎসক। সুবক্তা হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক

প্রবন্ধ লিখে থাকেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হুগলীর মাদ্রাসা সরকারি স্কুলের সহযোগী শিক্ষক সাময়িক পত্র-পত্রিকায় লিখে থাকেন। হালিশহর বাগমোড়ের অধিবাসী। সোমনাথবাবু 'সংবাদ প্রতিদিন' পড়াশুনার কলমে ইতিহাসের নিয়মিত লেখক।

স্বামী পরমাত্মানন্দ

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ কলকাতা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার সম্পাদক।

ডঃ প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পাশ করে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগে যোগদান করে। পরে ঐ বিভাগে উপ-অধিকর্তা পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট আবৃত্তিকার এবং সুঅভিনেতা ছিলেন। নাটক সম্পর্কে তিনি গবেষণা করেছিলেন। এ সম্পর্কে কয়েকটি বইও লিখেছেন।

ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

১৮৮৯ সালে উত্তর ২৪পরগণা জেলার হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতী ছাত্র নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বি পরে এম ডি পাশ করেন। একজন নামজাদা চিকিৎসক হিসেবে সারা ভারত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাস্থ্যধর্ম সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। সুবক্তা ও সুলেখক ডাঃ নলিনীরঞ্জনের চিকিৎসা সম্পর্কে লেখাগুলি সে যুগে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ধর্মনিষ্ঠ ডাঃ নলিনীরঞ্জনের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯৭২ সালে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১৯১০' সালে মুর্শিদাবাদে জন্ম হয়। সাধক কবি রামপ্রসাদের বংশধর ছিলেন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল কুমারহট্ট—হালিশহর। তিনি এম এ পাশ করার পর অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। পরে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব। সাহিত্যিক নন্দগোপাল দীর্ঘকাল ছিলেন যুগান্তর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। বাগ্মী হিসেবেও তাঁর সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হল 'রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ', 'স্মরণীয়দের সান্নিধ্যে',

'বেলাশেষের ফসল', 'অপরাধ জগৎ' ইত্যাদি। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিদ্যাসাগর) অধ্যাপক ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর একমাত্র পুত্র। ১৯৮৮ সালে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পরলোকগমন করেন।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী (১৯০৬—১৯৭৭)

অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলায় জন্ম। ছোটবেলা হতেই অলৌকিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার মধ্যে। মাত্র ২০ বছর বয়সে ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় স্বামী নিগমানন্দ দেবের ঘনিষ্ঠতা লাভ করেন এবং তাঁর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেখানে বিশ্ববিশ্রুত বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীমৎ অনির্বাণের কাছে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদি আয়ত্ত করেন। ২৫ বছর বয়সে আর্যদর্শন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হন এবং দীর্ঘ ৪৬ বছর সেই পদে বর্তমান ছিলেন। ভারত বিভাগের পূর্বে ১৯৪৬ সালে বগুড়া থেকে হালিশহরে আসেন দক্ষিণ বাংলা সারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ হয়ে। তাঁর রচনা, বাগ্মিতা, পত্রিকা সম্পাদনা, বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক বুধমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করে। তিনি বেদান্তাচার্য ও তত্ত্ব বাচস্পতি উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর পরিচালনায় শাখা শ্রমটির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং এটি কেন্দ্রীয় মঠে রূপান্তরিত হয়। জীবনের শেষ ১৩ মাস তিনি আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে ১১৩টি ছোট-বড় পুস্তক রচনা ও সম্পাদনা করে সারস্বত জগতে স্থায়ী কীর্তি রেখে গেছেন।

স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী (১৯০৪—১৯১১)

পুরুলিয়ার মুরাডি গ্রামে জন্ম। সেকেণ্ড ক্লাসে (বর্তমানে নবম শ্রেণী) পড়ার সময়ই স্বামী নিগমানন্দদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯২৪ সালে পূর্ব বাংলার বগুড়া আশ্রমে অন্তেবাসী হন। কিছুদিন পর ঐ আশ্রমের অধ্যক্ষ হন ও সেখানে সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী এবং আর্যদর্শন মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে হালিশহর আশ্রমে আসেন এবং প্রচার বিভাগ বগুড়া হতে এখানে আনেন। তিনি স্বভাবকবি, সুসংগঠক, সুলেখক ও সুবক্তা, ঐ সঙ্গে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ১৯৭৭ সালে স্বামী সত্যানন্দের প্রয়াণের পর আর্যদর্পণের সম্পাদক হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ ৫ বছর আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের মোহান্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর লিখিত ৪৬টি গ্রন্থ তাঁর গভীর মণীষা ও মননশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। কুচবিহার জেলায় নিগমনগরে সারস্বত আশ্রম, উচ্চ বিদ্যালয়, শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১২৮৬—১৩৫৬ বঙ্গাব্দ)
হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। হালিশহর রামপ্রসাদ লাইব্রেরীও হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্যসেবী প্রভাসচন্দ্র সে যুগের বহু পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি শুধু একজন সাংবাদিকই ছিলেন না, যোগ্য সমালোচকও ছিলেন। সাহিত্য সেবার জন্য 'কলকাতা সারস্বত সমাজ' তাঁকে 'সাহিত্যরঞ্জন' উপাধি দেন। সমাজসেবী প্রভাসচন্দ্র সহজও সরল জীবনযাপন করতেন।

অতুলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
হালিশহরের জমিদার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর বংশধর। অতুলকৃষ্ণ খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এম এ এবং বি সি এস পাশ করে বিলাতে গিয়ে কৃষিবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন। কলকাতার সেনসাস্ কমিশনার পদে থেকে যোগ্যতার পরিচয় দেন। কলকাতার 'সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও 'লক্ষ্মীকান্ত' তাঁর লেখা এই বই দুটি একদা বিদ্বজ্জন সমাজে আদৃত লাভ করেন।

হালিশহরের ব্যক্তিত্ব

কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত
হালিশহরের অতি দরিদ্র পরিবারে ১৮৪৩ সালে কর্ণেল কালীপদ গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম এ পাশ করার পর কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। কর্ণেল গুপ্ত চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রথম ভারতীয় হিসেবে এফ আর সি এস ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সৈন্য বিভাগে যোগ দিয়ে তিনি প্রথম ভারতীয় আই এম এস অফিসার হন। কালীপদ গুপ্ত জনসাধারণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য হালিশহর স্টেশন রোডের পাশে একটি পুষ্করিণী খনন করেছেন—যা আজও 'সাহেব পুকুর' নামে খ্যাত। কর্ণেল গুপ্তের উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল সাধারণের স্নানের ঘাট ব্যবহারের জন্য বাঁধাঘাট নির্মাণ ও গরিব মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন। বর্তমান হালিশহর স্টেশন রোডটি কর্ণেল কে পি গুপ্ত রোড করা হয়েছে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র তপাদার
ডঃ দীনেশচন্দ্র তপাদারের আদিনিবাস বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। ছাত্র জীবন তাঁর কৃতিত্বে উজ্জ্বল। প্রথমে হাজিনগর ইন্ডিয়ান পেপার পাম্পের উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেলুলোজ রসায়ন বিজ্ঞানে বহুদিন অধ্যাপনার কাজে ব্রতী ছিলেন। পাটকাঠি থেকে কাগজ তৈরির এই

অভিনব পরিকল্পনাটি তাঁরই সৃষ্টি। সমাজসেবী ডঃ তপাদারের একজন সুবক্তা, সুরসিক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তিনি হালিশহরের প্রাচীন সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটি ও হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন।

কিরণশশী দেবী (গুরুমা)

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুমারহট্ট হালিশহরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন গানের ওস্তাদ। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে কিরণশশীর অবদান ছিল উল্লেখ করার মত। স্বামী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অল্প বয়সে মারা যান। আর্থিক অনটন ও সাংসারিক দুরবস্থার মধ্যে থেকেও শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। পরে তিনি নিজ গ্রাম হালিশহর বাজারপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে দীর্ঘ চল্লিশবছর শিক্ষকতা করার পর অবসর গ্রহণ করেন। সকলের অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। হালিশহরের মানুষের কাছে 'গুরুমা' বলে অধিক পরিচিত ছিলেন। সাধিকা হিসেবেও তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন। বর্তমানে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি 'কিরণশশী বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত।

ডঃ সুচিত্রা রায় (আচার্য)

হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সংস্কৃত নিয়ে এম এ পাশ করে সুচিত্রা রায় বর্তমানে কাঁচরাপাড়া কলেজের সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপিকা পদে আসীন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তব্য রেখে শ্রীমতী রায় সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সলিল দাসগুপ্ত

হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমান কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের উপঅধিকর্তা পদে উপবিষ্ট।

হালিশহরের ক্লাব/সংঘ

হালিশহর ব্যায়াম সমিতি

১৯৩৯ সালে হালিশহর শিবের গলিতে হালিশহর ব্যায়াম সমিতি স্থাপিত হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও প্রাক্তন পৌরপ্রধান প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরে ক্লাবটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। ক্লাবটিতে প্রধানত

শরীরচর্চা হত। অবশ্য এর সঙ্গে খেলাধূলা জিমন্যাস্টিক-এর ব্যবস্থাও ছিল। শরীরচর্চার ক্ষেত্রে অতীতযুগের যেসব ব্যায়ামবীর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিষ্ণুচরণ ঘোষ, তাপস ভট্টাচার্য, ননীগোপাল আইচ ও 'আয়রণম্যান' নীলমনি দাস প্রমুখ। জিমন্যাস্টিকে যে সংগঠনটি ব্যায়াম সমিতিকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল, সেটি হল হুগলী সাহাগঞ্জের রাসবিহারী শক্তি সমিতি। ১৯৫১তে অল বেঙ্গল জিমসিয়াম অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সিঙ্গল ট্রাপিজে ব্যায়াম সমিতির নিতাইচন্দ্র পাল প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫২তে ডাবল ট্রাপিজে সমিতির সদস্য নিতাই পাল ও রাখাল গাঙ্গুলি প্রথমস্থান অধিকার করেন। ২৪ পরগণা জেলা ভারত্তোলক সংস্থা পরিচালিত জেলা দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় সমিতির সদস্য রেণুপদ মুখার্জি '২৪পরগণা শ্রী' হন। অপর এক সদস্য গৌতম মজুমদার একাধিকবার দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হন। তার মধ্যে উল্লেযোগ্য ১৯৬৮তে বাগবাজার তরুণ ব্যায়াম সমিতিতে দ্বিতীয়, ১৯৬৮তে বউবাজার ব্যায়াম সমিতিতে তৃতীয়। এছাড়া ২৪ পরগণা জেলা ভারত্তোলক ও দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় প্রথম। সমিতির সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে ভলি, ক্রিকেট এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন। অতীতের খ্যাতিমান ফুটবলার বিমল দত্তের হাতেখড়ি এই ক্লাবেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অনাথবন্ধু রায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ক্লাবের গৌরব বৃদ্ধি করেন। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ক্লাবের ভূমিকা উল্লেখে করার মত। ক্লাবের জমিটি দান করেছেন হালিশহরের বিশেষ ব্যক্তিত্ব শ্যামা দাশগুপ্ত। ক্রীড়া অনুরাগীদের সহযোগিতায় নিজস্ব ঘরটি তৈরি করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত ফুটবল লীগে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে ব্যায়াম সমিতি। সম্প্রতি ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত ফুটবল প্রতিযেগিতায় উপস্থিত ছিলেন অতীতের দুই দিকপাল ফুটবলার শৈলেন মান্না ও কেষ্ট পাল।

হালিশহর সরস্বতী ক্লাব

পূর্ব পাকিস্থান অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত একদল উদ্বাস্তু ১৯৫০ সালে পূর্বাচল কলোনীতে বসতি স্থাপন করেন। এখানকার অধিবাসীরা এলাকার উন্নয়নে সরস্বতীপুজো, খেলাধূলা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন। সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে ১৯৫৪ সালের ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলাকার রাস্তাঘাট, রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্বাচল কো-অপারেটিভ, খেলার মাঠ প্রভৃতি গঠনে ক্লাবের অবদান অপরিসীম।

ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও ফুটবলে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনুমোদিত লীগে সরস্বতী ক্লাব বর্তমানে প্রথম বিভাগের অন্যতম সেরা দল। নামী ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতীতের শংকর মুখার্জি। বর্তমানে কলকাতা প্রথম বিভাগ ফুটবলে খেলছেন ক্লাবের সুবীর খাসকেল, চিরঞ্জীব চৌধুরী।

মৃণাল দাস পাওয়ার লিফটিং-এ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন। রবি সেন রাজ্য ওয়েট লিফটিং-এ ৩য় হন। ক্লাবের প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত উষারঞ্জন দে। বর্তমান সম্পাদক সুকান্তকুমার সেন।

সবুজ সংঘ

বাগমোড় সুকান্ত পল্লীতে ১৯৫৩ সালে সবুজ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষত ফুটবলে এদের সুনাম যথেষ্ট নিজস্ব ঘর আছে নিজস্ব মাঠে বহু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এই ক্লাবের মূল স্থপতি অতীতদিনের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় কোচ ও রেফারী দীপক দাস। জেলা ফুটবল ক্রীড়া এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালিত লীগে এরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

হালিশহর স্পোর্টিং ক্লাব

১৯৮২ সালে সরকার পাড়ায় হালিশহর স্পোর্টিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজস্ব ঘর ও নিজস্ব মাঠ আছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল লীগে দ্বিতীয় ডিভিশনে অংশগ্রহণ করেছে ক্লাবটি। ফুটবলের মানকে উন্নত করতে মাঝে মাঝে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে।

জাগ্রত সংঘ

হালিশহর পবনতলার নবাগত জাগ্রত সংঘ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল লীগে অংশগ্রহণ করছেন।

হালিশহর রেলওয়ে স্পোর্টস

হালিশহর রেলওয়ে স্পোর্টস জেলা পরিচালিত ফুটবল লীগে তৃতীয় বিভাগে অংশগ্রহণ করে। এলাকার অতি প্রাচীন ক্লাব এটি।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে হালিশহরের ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হালিশহরে নাট্যচর্চা ও নাট্যানুষ্ঠান আজও সমানভাবে এগিয়ে চলেছে।

হালিশহর খাসবাটীর 'প্রমোদন নাট্য সমাজ'র নাম এ প্রসঙ্গে প্রথমেই করতে হয়। এরপর চৌধুরী পাড়ার 'প্রতিভা নাট্য সমিতি'র সভ্যবৃন্দ নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেন। তবে হালিশহরের ওয়াই এম ডি এ (Youngmen's Dramatic Association) নাট্য জগতে সে সময় একটা স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন একাধিক মঞ্চ সকল নাটক অভিনয় করার জন্য। পরবর্তী ক্ষেত্রে 'বান্ধব' নাট্য সমাজর নাম করতে হয়। তবে সাধক রামপ্রসাদ নামাঙ্কিত 'রামপ্রসাদ নাট্য সমাজ' ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাট এই তিন দশকে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করে তাঁরা শুধু হালিশহর নয়, পাশ্ববর্তী অঞ্চলের নাট্যপ্রেমিকদের হৃদয় জয় করেন। তাঁদের অভিনীত উল্লেখয়োগ্য নাটকগুলি হল, 'প্রতাপাদিত্য', 'কেদার রায়', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মহা নিশা', 'আনন্দমঠ' (সন্তান), 'টিপুসুলতান', 'উল্কা', 'উত্তরা', 'রায়গড়', 'দুই মহল', 'বারঘণ্টা' প্রভৃতি। পরিচালক হিসেবে সে সময় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন অমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমান ভট্টাচার্য, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এরপর হালিশহর নাট্য সংস্থা খুব অল্প দিনের মধ্যে 'মহেশ' নাটকটির মিহির দত্তর পরিচালনায় ও অভিনয়ে হালিশহরের বুকে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। শরৎ সাহিত্য সংসদ পরে হালিশহর শরৎ সাহিত্য সংস্কৃতি সংস্থা প্রযোজিত 'রমা', 'রামপ্রসাদ', 'চকমকি', 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' নাটকগুলি দর্শকবৃন্দকে মোহিত করে। নির্দেশনার দায়িত্বে বিমলকৃষ্ণ পালিত ও শ্যামাপদ গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে হালিশহরে বহু গ্রুপ থিয়েটার তৈরি হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম 'নটদূত নাট্যসংস্থা' এক সময় পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক মঞ্চস্থ করে হালিশহরকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য নাটক—'বায়েন', 'কাঞ্চন রঙ্গ'। এরপর কাঁসারীপাড়ায় 'সানডে ক্লাব' যে সব নাটকগুলি মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছিলেন সেগুলি হল, 'নহবৎ', 'ফেরারী ফৌজ', 'সংক্রান্তি', 'নরক গুলজার' প্রভৃতি। এছাড়া হালিশহরে কোনা প্রভাত সংঘের প্রযোজনায় 'যা তারা পারেনি' নাটকটি অজিত বসু ও সুনীল বসুর সু-অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আরেকটি নাট্য সংস্থা হল, হালিশহর বাগমোড়ের 'অন্যচোখ'। এটাই সম্ভবত হালিশহরের একমাত্র 'মুক্তাঙ্গন নাট্য সংস্থা'। তাঁদের অভিনীত নাটকগুলি 'মহাজ্ঞানী', 'ট্যাক্সি ড্রাইভার', 'বাম রহিমের দেশে'। এছাড়া কর্নেল কে পি গুপ্ত রোডের 'সংলাপ ও প্রহরী' এবং রামসীতা গলির 'স্টারলিট' নাট্য সংস্থা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করে নাট্যমোদীদের হৃদয়স্পর্শ করেন। আশির দশকের গোড়ায় জেঠিয়ার হালিশহর 'ইউনিটি মালঞ্চ' নাট্যগোষ্ঠী নানা

ধরনের একাংক নাটক পরিবেশন করে। নাট্যদলটি শুধু এলাকায় নয়, সারাবাংলার মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। এঁদের প্রযোজিত ও অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি 'মারণখেলা', 'কোটিপতির কাছে প্রার্থনা' 'উলঙ্গ রাজা', 'উজানগানে' প্রভৃতি। বিশেষ আনন্দের কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আকাডেমি পুরস্কার সম্মান লাভ করেন এঁদের প্রযোজিত 'হনুয়া কা বেটা' একাংক নাটকটি। নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন দেবাশিস সরকার। হালিশহরের নাট্যচর্চায় নিখিলরঞ্জন দাসের নাম অবশ্যই ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। হালিশহরের উল্লেখযোগ্য নাট্য সংস্থা 'নমামি'। এঁবা দীর্ঘদিন ধরে নানা নাটক মঞ্চস্থ করেছেন এবং যথেষ্ট সুনামও পেয়েছেন। শ্রুতি নাটকের ক্ষেত্রে এঁদের সফল প্রয়োজনায় 'সকলই তোমারি ইচ্ছা', 'রানী রাসমণি', 'নলিনীকান্তের তন্ত্র-সাধনা', 'মাকে মনে পড়ে'। এঁদের নাট্য পরিচালক হিসেবে কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হালিশহরে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে একাধিক পুরস্কার লাভ করেন।

একাংক নাটক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দুটি সংস্থার নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটি, হালিশহর শিবের গলির 'স্টুডেন্টস থিয়েটার গ্রুপ' অন্যটি হালিশহরের স্টেশন সংলগ্ন 'মহুয়া নাট্য সংস্থা'। স্টুডেন্টস থিয়েটারের একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় ষাট দশকের নামী নাট্য দলগুলি অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতার গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। হালিশহরের আর যে সব সংস্থা মাঝে মাঝে নাটক বা শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁরা হলেন পণ্ডিত পাড়ার 'সেভেন জুয়েলস্ ক্লাব', ও 'সুরতান'। খাসবাটীর 'রামপ্রসাদ অপেরা', 'স্বস্তিতীর্থ', 'আশীর্বাদ', 'শিল্পীতীর্থ', 'ছন্দনীড়', 'সারস্বত মহিলা সংঘ' প্রভৃতি।

নাটক বা শ্রুতি নাটক রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুলাল চক্রবর্তী, প্রভাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন স্বর্ণকার প্রমুখ। হালিশহরের 'মাস্টার থিয়েটার গ্রুপের' স্রষ্টা ও পরিচালক অনিলাভ গঙ্গোপাধ্যায় মূকাভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, হালিশহর পুরোহিত পাড়ার অজিত চট্টোপাধ্যায় ও চৌধুরী পাড়ার শিপ্রা চট্টোপাধ্যায় (মিত্র) বেতার, মঞ্চ ও সিনেমায় অভিনয় করে শুধু হালিশহরের নয়, সারা পশ্চিমবাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

হালিশহরের সঙ্গীত চর্চা

শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সমানতালে পা রেখে সঙ্গীত চর্চা চলছে সারা হালিশহরে।

হালিশহর সঙ্গীত চক্র ঃ হালিশহর পণ্ডিত পাড়ায় ১৯৪১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত

হয়। প্রতিষ্ঠাতা রাধাবল্লভ দাস। এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রভৃতি শেখানো হয়। এর সম্পাদক শ্রী অপূর্ব রায়।

পারিজাত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ঃ এটি নবনগরে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। লঘু সঙ্গীত ভজন, ঠুংরি, নজরুল গীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এর অধ্যক্ষা সাবিত্রী দে (দাস)।

শচীন হালদার ঃ বর্ষীয়ান বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী শচীন হালদার পূর্বে কাঁচরাপাড়ায় বাস করতেন। বর্তমানে শিবের গলিতে বসবাস করেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে সঙ্গীতের তালিম নিয়ে থাকেন।

ইন্দু স্মৃতি সঙ্গীতায়তন ঃ ১৯৯১ সালে খাসবাটীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সব ধরনের লঘু সঙ্গীত এখানে শেখানো হয়। এর দেখাশোনা করেন শ্রীমতী কাজল গুহ। অধ্যক্ষ বেতার শিল্পী বিপুল চক্রবর্তী।

সুর ও ছন্দম্ ঃ বলিদাঘাটায় ১৯৯৪ সালে এটি স্থাপিত হয়। অধ্যক্ষা শিপ্রা ঘোষ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সঙ্গে নজরুল গীতির তালিম দেওয়া হয় এখানে।

সঙ্গীতাঙ্গন ঃ নবনগরে অবস্থিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী রত্না চক্রবর্তী এর অধ্যক্ষা। রবীন্দ্রভারতীর ভাবধারায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লঘু সঙ্গীত প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

গীতিমাল্য সঙ্গীত বিদ্যালয় ঃ বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়-এর ছাত্রী গায়ত্রী মজুমদার এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা। এখানে রবীন্দ্র, নজরুল সঙ্গীত ছাড়াও নৃত্যের তালিম দেওয়া হয়।

হালিশহর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ঃ ইছাপুর গোয়ালাপাড়ার গীতা ভট্টাচার্য (ঘোষাল) হালিশহর সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আয়োজিত সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করে একাধিক পুরস্কার লাভ করেন ১৯৫০ সালে নাগাদ। তারসঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেন অন্ধগায়ক বেতার শিল্পী কানাইদাস বৈরাগী।

সাবর্ণ চৌধুরীদের আদি নিবাস হালিশহরে

দশম শতাব্দীতে কনৌজের রাজা বাংলার শাসন পদে নিয়োগ করেন আদিশূরকে। আদিশূর আবার কনৌজ থেকে বঙ্গদেশে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এনেছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বেদগর্ভ। তিনি সাবর্ণ গোত্রজ ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদগর্ভের অধঃস্তন পঞ্চদশ পুরুষ হলেন পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর (১৪০৫০ পূর্বে) মাঝামাঝি পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী আমাটিতে কিছুদিন অবস্থান করেন। পরে হুগলী জেলার গোঘাটে (গোপালপুর) স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সৈন্যবাহিনীতে সামান্য একজন সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। পরে

অসাধারণ শৌর্য ও বীর্যের পরিচয় দিয়ে পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায় সৈন্য বিভাগের অতি উচ্চপদে উপবিষ্ট হন। এই সময়েই পাঠান সরকারের কাছ থেকে তিনি 'পাঁচু শক্তি খান' উপাধি পান। পাঠান সরকারের হুকুমনামায় তিনি বঙ্গদেশের কিছু অংশের জমিদারি এবং এর সঙ্গে হাবেলীশহর পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। পরে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'হালিশহর সমাজ' গড়ে ওঠে।

পাঁচু শক্তি খানের সাত পুত্র ছিল। এরা সকলেই হালিশহরের অধিবাসী ছিলেন। পাঁচুশক্তি খানের পুত্রদ্বয় কামদেব ও বলরাম গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সে যুগের সকলেরই নমস্য। ঋষি কল্প কামদেব বিদ্যা বাচস্পতির পাণ্ডিত্য সমগ্র বঙ্গ দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর সম্পর্কে লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এই কথাগুলি—'কাম, কমল গঙ্গেশ/তিন নিয়ে বঙ্গদেশ'।

১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতার জমিদারি স্বত্ত্ব ক্রয় করেন মাত্র তেরশ টাকায়। দলিল পত্রটি স্বাক্ষরিত হয় সম্ভবত লালদীঘির কাছারি বাড়িতে। বিক্রয়পত্র দলিলে সাবর্ণ চৌধুরীদের পক্ষে দস্তখত দেন যে পাঁচজন তাঁরা রাম রায় ও গৌরী রায়ের বংশধর। আর কোম্পানির পক্ষে স্বাক্ষর করেন চার্লস আয়ার। এই বিক্রয় দলিলটি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আজও সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন শিক্ষক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক

শ্রী চৈতন্য ডোবা। ছবি : রঘুনন্দন দে

হালিশহরের সংস্কৃত সাধনার উত্তরাধিকার

অলোক মৈত্র

১.১ হালিশহর এবং কুমারহট্ট এই নাম দুটি বাইরের লোকদের কাছে মনে হবে দুটি জায়গা। স্থানীয় লোকেরা জানেন এটি একই জায়গার দুটি নাম। কুমারহট্ট নামটির প্রচলন কম হলেও বর্তমানে দলিলে 'সাং কুমারহট্ট, পরগণা হাবেলিশহর' এরকম উল্লেখ পাই। আবার আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ কুমার হট্ট শাখা এভাবেও মানুষের কাছে কুমারহট্ট নামটির প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে হাবেলিশহর নামটি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে হালিশহর নামে নথিভুক্ত হয়েছে। এখানকার স্থান-নামের বিবর্তনের ধারা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। ইতিহাসের দিক থেকে এটি বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে বলা যেতে পারে হালিশহর ও কুমারহট্ট একই ভূখণ্ডের নাম।

১.২ আমাদের আলোচনার বিষয় হালিশহরের সংস্কৃত ভাষার চর্চা। এই বিষয়টি যে পূর্বে আলোচিত হয়নি, তা নয়। বিদগ্ধ পণ্ডিত, গবেষক ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 'কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ' প্রবন্ধটির মাধ্যমে যে গভীর ইতিহাসের পরম্পরা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

১.৩ তবে, হালিশহরের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাস আলোচনার পূর্বে ভাটপাড়া থেকে কাঁচরাপাড়া পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সংস্কৃত চর্চা কিভাবে শুরু হল তার একটা হদিশ আমাদের স্মরণে রাখতেই হবে। বারাকপুর তাম্রশাসনে দেখা যায়, ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বাৎস গোত্রের উদয়কর ঘোষালকে মহারাজ বিজয় সেন ভাট্রবড্ডা গ্রামের চারপাটক ভূমি দান করেছেন। মাদ্রাল গ্রামের ঘোষালরা উদয়করের বংশধর। ড. হিরন্ময় ঘোষাল, পঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন সাংসদ দেবী ঘোষাল এই বংশেরই মানুষ। এই বংশেরই পূর্বপুরুষরা—রামশঙ্কর বাচস্পতি, রাম নারায়ণ বিদ্যাপঞ্চানন—এঁরাই বলতে গেলে এ অঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত করেন।

১.৪ 'কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ' প্রবন্ধটির পাঠ গ্রহণকালে এই তথ্যটিকে স্মৃতিতে রাখলে ভাল হয়।

২.১ ঐ প্রবন্ধে রামেশ্বর সার্বভৌমের (১৬০০ খৃষ্টাব্দ) চতুষ্পাঠীর উল্লেখ পাচ্ছি। এখানে আমরা আরও একটি তথ্য যুক্ত করতে চাই! রামেশ্বর যখন মঠের বাড়ি এলাকায় টোল খোলেন তারও আগে শ্রী চৈতন্যদেব ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে

আচার্যপাড়ায় তার গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটে পরিদর্শনে আসেন। শ্যামসুন্দর আচার্য রাজা গণেশের রাজত্বকালের কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ পঞ্চাশ শতকের প্রথম দিকে হালিশহরের উত্তরদিকে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর একটি টোল ছিল, সেখানে প্রচুর ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। এই বংশধারার গোপাল আচার্য, পুরন্দর আচার্য, ভগবান আচার্য এরা সকলেই পণ্ডিত ছিলেন। শ্রী চৈতন্যদেব নবদ্বীপের পণ্ডিতদের কূট তর্কে পরাস্ত করেছিলেন। শ্রী চৈতন্যদেব এই শ্যামসুন্দর আচার্যের ছেলে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা নেন।

২.২ রামেশ্বর সার্বভৌমের টোল খোলার সময়কে ঘিরে আমরা আর একটি তথ্য এখানে যুক্ত করছি। বর্ধমান সাহিত্যসভার একটি প্রাচীন' পুঁথি থেকে। পুঁথিটির রচনাকাল ১৫৫২ শকাব্দ, ১৬১০ খৃষ্টাব্দ। সেটি সরাসরি এখানে উল্লেখ করছি।

"শ্রী গুরুবে নমঃ। ... কর্নাট...। তস্য পুত্র অনিরুদ্রনামা। তস্যৌ পুত্রৌ দ্বৌ রূপেশ্বর-হরিহরৌ। রূপেশ্বর জ্যেষ্ঠ বেদ প্রবীণ-কনিষ্ঠ হরিহর সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ। পিতা মরণ সময়ে তাভ্যাং রাজ্য অর্ধাধিং বিভাজ্য দদৌ। হরিহরস্তু বলাৎ রূপেশ্বরং বিজিতাং দেশাৎ কালয়ামাস। রূপেশ্বরস্তু ঘোটকাষ্টেন সহিত স্বস্ত্রিয়া সহিত গৌড় দেশমাগত্য শিখরদেশে বাসং চকার। স শিখরেশ্বর. পঞ্চাগ্রামং ব্রহ্মোতরং চ দত্তং। কথ দিবসান্তরে তস্য পদ্মনাভনামা পুত্রোভবৎ। পুরুযোত্তম জগন্নাথ-নারায়ণ-মুরারি-মুকুন্দনামান। তস্য মুকুন্দস্য কুমার নামা পুত্র অভবৎ। স তু কুমার কুমারহট্টং পরিত্যজ্য বং দেশে বাসং চকার। তস্য তত্র পঞ্চপুত্রোভবৎ। জ্যেষ্ঠ অগ্রজৌ দ্বৌ দেশাধিকারিনৌ ভবৎ। কনিষ্ঠামস্ত্রয়ো মহাভাগবতা জ্ঞাতা জ্যেষ্ঠ শ্রী সনাতন মধ্যম শ্রীরূপ কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্য কৃপয়া সার্বভোগং পরিত্যজ্য তৎপাদ সঙ্গিনো বভূব।"

রূপেশ্বর হরিহর দুজনেই বেদপ্রবীণ ও সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ। রূপ ও সনাতনের পূর্ব পুরুষ এই পণ্ডিতদের বংশধারার পদ্মনাভ ও মুকুন্দ কুমারহট্টে বাস করতেন, অন্তত তথ্যটি তাই বলে।

২.৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন,

"১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কুমারহট্টের মধুসূদন বাচস্পতি হুগলি জেলার জজ-পণ্ডিত ছিলেন। কুমারহট্টের শেষ টোল সম্ভবতঃ ব্রজনাথ তর্কালঙ্কার ও মাধব চূড়ামণি প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার কোটি পরিমিত 'অশ্ববলের' নিষ্পেষণে এখন সব ধূলিসাৎ হইয়াছে।"

মধুসূদন বাচস্পতি শুধুমাত্র হুগলী জেলার জজ-পণ্ডিত ছিলেন না। গবেষক হীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য তাঁর 'হালিশহরের মানুষ' গ্রন্থে জানিয়েছেন, মারকুইস অব হেস্টিংস (লর্ড ময়রা) যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল, সেই আমলে মধুসূদন বাচস্পতি সুপ্রীম কোর্টে জজ-পণ্ডিত ছিলেন (১৮১৪-১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার ৯ই শ্রাবণ, ১২৬৩ বঙ্গাব্দের একটি সংবাদ এই তথ্য সমর্থন করে। কুমারহট্ট বিদ্যালয় সংক্রান্ত একটি বিশেষ সভার সংবাদ পরিবেশনের সময় লেখা হয়েছিল, "এই সভার প্রধানাসনে প্রদেশ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি ভট্টাচার্য মহাশয় উপবেশন করিয়াছিলেন, তিনি এই উপলক্ষে পাঠশালার উন্নতি নিমিত্ত প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, কার্যে তাহার কোনাংশে অন্নথা না হয়, ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিত মহাশয় অতি সভ্য ও শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট মনুষ্য এবং বিদ্যারূপ রসালের রসিক বটে, বোধ হয় উপরোধ অনুরোধের বশবর্তী হইয়া বিদ্যালয় বিষয়ে পদোপযুক্ত অনুরাগ প্রকাশে বীতরাগ করিয়াছিলেন"। মধুসূদন বাচস্পতি কেমন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, সেটাও এই প্রস্তাব/সংবাদ থেকে জানা যায়।

২.৪ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর কুমারহট্টের সংস্কৃত চর্চা সত্যিই বিলীন হতে থাকে। যেটুকু বজায় ছিল তারও হদিশ মেলে ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন বিবরণীতে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কুমারহট্ট বিদ্যাসমাজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এরকমই বিবরণ মেলে। এক সময় নবদ্বীপের পণ্ডিতদের পরাস্ত করে হালিশহরের পণ্ডিতবর্গ যে সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন সে গৌরব আর অক্ষুন্ন থাকে নি।

৩.১ তবে হালিশহরে সংস্কৃতর্চা যে একেবারে থেমে থাকে নি তার প্রমাণ কিছু কিছু মিলেছে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর বিগত পঞ্চাশ বৎসরের হালিশহরে সংস্কৃতচর্চার ধারাটি এখানে লক্ষ্য করব। চারটি বেদ পড়ানো হত বলে চতুষ্পাঠী আর টোল নামকরণটি হয় সম্ভবত মুসলমান আমলে। শিক্ষা ব্যবস্থাটি বরাবরই ছিল গুরুকুল অর্থাৎ গুরু বা আচার্যে সন্নিধানে থেকে শিক্ষা লাভ করা। আর পাঠশালাতে শেখানো হত বাংলাভাষা। একদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রাচীনকালে শিক্ষাটা নির্ভর করত গুরু সন্নিধানে থেকে। এজন্য গুরুমুখী বিদ্যাও বলা হয়। হালিশহরের সংস্কৃত চর্চা এর থেকে অন্যথা হবে কেন! ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর রাজভাষা সম্পর্কিত একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংশোধনীটি ছিল "Sanskrit as official language of Indian Union–sponsered to be the official language, Sept 11, 1949." আর আমরা দেখি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১ মে তারিখে হালিশহরের শ্রী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের তত্ত্বাবধানে ঋষি বিদ্যালয় স্থাপন করে সংস্কৃত চর্চার যুগোপযোগী এক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। শ্রী নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সাধক বামাক্ষেপা, সচ্চিদানন্দ পরমহংসদেব এবং সুমের দাসজীর সংস্পর্শ লাভ করে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরমহংস নিগমানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তিনি যে ঋষি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল আশ্রমের অন্তেবাসী ও বহিরাগত ভক্তশিষ্য ও ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত বাতাবরণ তৈরি করা, প্রাচীন

শাস্ত্রের অধ্যয়ন, নৈতিক চরিত্রের মানোন্নয়ন এবং ধর্মভাব জাগ্রত করা। সম্ভবতঃ গুরুকুল শিক্ষা ব্যবস্থাও বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এই দুটিকে সুসংহত করতে চেয়েছিলেন। তখন থেকে হালিশহরে সংস্কৃত চর্চার ধারাটি কিছুমাত্র হলেও এখনো টিকে আছে।

৩.২ সংস্কৃত চর্চার দুটি ধারা আমরা লক্ষ্য করি। এক, মাধ্যমিক স্তরে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। পরবর্তীক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষা ঐচ্ছিক। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও সংস্কৃতভাষা নিয়ে পড়বার সুযোগ রয়েছে। দুই, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্ সাংখ্য ইত্যাদি বিষয়ে উপাধি প্রদান করে। পরিষদটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে পরিচালিত। হালিশহরের বিদ্যালয়গুলোতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থাটি চালু আছে। অন্ততঃ ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাভাষার উৎসমূলে পৌঁছনোর জন্য সংস্কৃতের এই চর্চাটি অব্যাহত। আর নিগমানন্দ পরিচালিত সারস্বতে মঠের তত্ত্বাবধানে ঋষি বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু কিছু অনুদান দেন।

৩.৩ হালিশহরের এই চতুষ্পাঠীতে (ঋষি বিদ্যালয়ে) সব বিষয়ই যে পড়ানো হয় তা নয়। এমনিতে সংস্কৃত ভাষায় মূল বিদ্যা যা শেখানো হত তা হল ঃ ঋগ্বেদ, যর্জুবেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, আর্য়ুবেদ, ধর্নুবেদ, গান্ধর্ববেদ, তন্ত্র, শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, মীমাংসা, তর্ক, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ, ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, নাস্তিকমত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অলংকৃতি, কাব্য, দেশভাষা, অবসরোক্তি দেশাদিধর্ম ইত্যাদি। হালিশহরের চতুষ্পাঠীতে যে যে বিষয় পড়ানো হয় তা হল ঃ কাব্য, ব্যাকরণ, উপনিষদ্, সারস্বত চন্দ্রিকা, কলাপ, লঘুকৌমুদী, বেদান্ত, ন্যায়, সংক্ষিপ্তসার, পৌরোহিত্য, চন্দ্রিকা, সাংখ্য, মীমাংসা, পুরাণ, মুগ্ধবোধ, জ্যোতিষ ইত্যাদি। ছাত্র ও অধ্যাপকের উভয়ের অভিগম্যতার ওপর বিষয়টি নির্ভরশীল। যদি কেউ নির্দিষ্ট বিষয় (যা মূলবিদ্যার অন্তর্গত) পড়তে চান তাও পড়তে পারেন। আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের এই চতুষ্পাঠীতে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ অধ্যাপনা করেছেন। এমনকি এখনও এই সময়ে নিভৃতে যে সমস্ত পণ্ডিত অধ্যাপক সংস্কৃত চর্চায় আত্মনিবেদিত তাঁদের পাণ্ডিত্য ও মেধার কথা জানলে বিস্মিত হতে হয়। চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠার সময়ে পণ্ডিত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি ১ মে ১৯৪৯ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৩ পর্যন্ত প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। তারপর থেকে যে সমস্ত পণ্ডিত বর্গের সন্ধান আমরা পাই তাঁরা হলেন শ্রী যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ, শ্রী শ্যামাপদ মিশ্র, ন্যায়তর্কতীর্থ, শ্রীবৎস, লাঞ্ছনপতি তর্কতীর্থ, শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রী হেমন্তকুমার ষঠতীর্থ, শ্রী গদাধর পূততুন্ড, ব্যাকরণ তীর্থ, শ্রী বিভূতিভূষণ কাব্য ব্যকরণতীর্থ, শ্রী পঞ্চানন তর্কবেদান্ততীর্থ, শ্রী রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ, শ্রী গোপালচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ বেদান্ত উপনিষদ্ তীর্থ ও পণ্ডিত শ্রী রাজেন ব্রহ্মচারী। শ্রী সুধীর কুমার শর্মা,

অপর একটি তথ্য দিয়েছেন, তিনি তার ছাত্রাবস্থায় যাঁর কাছ থেকে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করেছিলেন তিনি হলেন শ্রী রঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায়। দেশ স্বাধীন হবার পরে তিনি ঢাকা থেকে এখানে চলে এসে হালিশহরের বারুইপাড়ায় বসবাস করেন। পিতার নাম চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায়। রঙ্গলাল ছিলেন ম্যাট্রিক, কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কাঁচরাপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। জ্যোতিষবিদ্যাতেও তাঁর সুনাম ছিল। কলকাতায় সুবিখ্যাত এম পি জুয়েলার্স এ জ্যোতিষ বিভাগে আমন্ত্রিত গণক হিসেবে কাজ করেছেন।

হালিশহর থেকে আমরা সাধারণভাবে কোন খবরই রাখি না যে এখানে যে সমস্ত পণ্ডিতেরা অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন তাঁদের প্রজ্ঞা, ধী ও মেধাশক্তির গভীরতা। অথচ আমরা তাঁদেরই সঙ্গে একই বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করছি। শ্রী হেমন্ত কুমার ষঠতীর্থ মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে এসেছেন গুসকরা বর্ধমান থেকে। তিনি কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাংখ্য, বেদান্ত 'ক' ও উপনিষদ্ বিষয়ে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ থেকে উপাধি লাভ করে এখানে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন শুধু মাত্র সামান্য সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করে। ইনি বর্তমানে চতুষ্পাঠীর প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত আছেন। বর্তমানে দ্বিতীয় অধ্যাপক পদে বৃত আছেন মেদিনীপুর থেকে আগত শ্রী গোপাল চন্দ্র কর মহাপাত্র। ইনি কাব্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত ও উপনিষদ তীর্থ। বিশিষ্ট অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করছেন পণ্ডিত শ্রী পঞ্চানন্দ নন্দ, পঞ্চতীর্থ। ইনি বাঁশবেড়িয়ায় ভূদেব শ্রুতি পরিষদের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে কুচবিহারে মহারাজার আনুকূল্যে পরিচালিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। তারপর কাঁথি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করেন। হালিশহরে সারস্বত মঠের প্রতি অবিচল আস্থা এবং মঠের আমন্ত্রণে এখানে বিশিষ্ট অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করছেন। কাব্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত 'ক' ন্যায় ও তর্ক এই পাঁচটি বিষয়ে উপাধি প্রাপ্ত পণ্ডিত প্রবর এই মানুষটি আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। হালিশহরের তেঁতুলতলায় শ্রী রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে একটি চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। বর্তমানে এটি বন্ধ হয়ে আছে। রমেশচন্দ্র তার আগে সারস্বত মঠের ঋষি বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। আমরা আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের নাম করব যিনি হালিশহর থেকে প্রকাশিত আর্যদর্পণ পত্রিকায় বেদের ভাষ্য লিখতেন। তাঁর গৃহী নাম ছিল সম্ভবতঃ বরদা। সারস্বত মঠে অন্তেবাসী হয়ে যখন যোগ দেন তখন নাম গ্রহণ করেন বরদা ব্রহ্মচারী। পরে হন নির্বাণানন্দ সরস্বতী। অনির্বাণ এই নামেই আশ্রমের ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে ঋগ্বেদের সহজ সরল অনুবাদ আর্যদর্পণ পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। শ্রীপদ ঈশ্বরপুরীর ভিটেতে অবস্থিত মঠর প্রধান মোহান্ত শ্রী কিশোরীদাস বাবাজীও পণ্ডিত মানুষ। তিনি মুগ্ধবোধ বিষয়ে উপাধি প্রাপ্ত। হালিশহরের কোনা এলাকায় যোগানন্দ আশ্রমের প্রধান শ্রীশ্রী অখিল মহারাজও পাণ্ডিত্যের অভিজাত্যে

পরিপূর্ণ। নিগমানান্দ মঠের প্রধান মোহান্ত শ্রী স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী বর্তমান আর্যদর্পণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। আসলে এঁরা কখনোই নিজেদের পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগরিমার কথা প্রকাশ করেন না। ভগবৎ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করণীয় কর্মটি সম্পাদন করেন। বর্তমানে হালিশহরে ঠাকুরপাড়ায় আর একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মানুষ বাস করেন যিনি ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পাশ করার পর কাব্য ব্যাকরণ, ন্যায় ও জ্যোতিষ এই চার বিষয়ে উপাধি লাভ করেন। তাঁর নাম শ্রী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, ন্যায়তীর্থ। ছাত্রছাত্রীরা এখনো তাঁর কাছে সাহিত্য ও সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। কলকাতার শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ উপেন্দ্রমোহন হালিশহরের মানুষ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "ভারতাজির" পত্রিকা বর্তমানেও প্রচলিত। ১৪০২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'ভারতাজির' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ ও ব্যবহারবিধির নানা ব্যাখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে।

৩.৫ হালিশহরের এই পণ্ডিতমণ্ডলী নিভৃতে ও নীরবে থেকে আধুনিক ভোগ বিলাস নির্ভর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে অশেষ কষ্ট ও উপেক্ষা সহ্য করেও যে যে বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও জ্ঞানচর্চায় সাহায্য করেন তার একটি হদিশ দেওয়া যেতে পারে। বিশেষতঃ কাব্য বিষয়ে যে যে গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে তা হল ঃ কাব্য আদ্য পরীক্ষার জন্য কালিদাসের রঘুবংশম্, কুমার সম্ভবম্, বিশ্বনাথের সাহিত্য দর্পণম্, গঙ্গাদাসের লেখা ছন্দঃমঞ্জরী, উদয়নের প্রতিমানাটক ইত্যাদি। কাব্য মধ্য বিষয়ে দণ্ডীর লেখা দশকুমাচরিতম্, সাহিত্যদর্পণম, ছন্দঃমঞ্জরী, ভারবীর লেখার কিরাতার্জুনীয়ম্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সম্পাদনায় বাল্মিকী রামায়ণম্ এর অন্তর্গত রুক্মিনীহরণম্। কাব্য উপাধি পরীক্ষায় কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ বানভট্টের কাদম্বরী, সাহিত্যদর্পণ, ছন্দঃমঞ্জরী, মাঘ এর লেখা শিশুপালবধ, শ্রীহর্ষের লেখা নৈষধচরিতম্, কালিদাসের মেঘদূত, বাল্মিকী রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ড, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম্, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, বানভট্টের শ্রী হর্ষচরিত, পঞ্চানন তর্করত্নের অমরমঙ্গল, হনুমান এর লেখা মহানাটক আর বেণীসংহার। ব্যাকরণ শাখায় আদি মধ্য ও উপাধি এই তিনটিতেই ভট্টিকাব্য, মুগ্ধবোধ, অমরকোষ, মিত্রলাভ, কবিরহস্য, সারমঞ্জরী, কবিকল্পদ্রুম ইত্যাদি গ্রন্থগুলির পাঠ গ্রহণ করতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী এখানে প্রকাশ করা গেল না, কারণ এটি নিয়ত পরিবর্তনশীল। আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ থেকে বিগত ৫০ বছর ধরে সংস্কৃত চর্চার ফলাফল সম্বলিত একটি তালিকা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত পত্রিকা মারফৎ হাতে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে এই সংস্কৃতভাষার প্রতি নেতিবাচক ভূমিকা ও প্রভাবের মধ্যেও হালিশহরে সংস্কৃত পাঠরত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয়। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেখা যায়—বিভিন্ন বিষয়ের আদ্য-মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় সফল

হয়েছেন তাদের সংখ্যা কাব্য বিষয়ে আদ্য পরীক্ষায় ১৫ জন, মধ্য পরীক্ষায় ৭ জন, উপাধি পরীক্ষায় ৭ জন, ব্যাকরণ আদ্য ৪ জন, উপনিষদ আদ্য ৮ জন, মধ্য ৫, উপাধি ১ জন, সারস্বত চন্দ্রিকা বিষয়ে আদ্য ১২ জন, মধ্য ২ জন, কলাপ বিষয়ে আদ্য ২২ জন, মধ্য ৩ জন, উপাধি ১ জন, লঘু-কৌমুদী বিষয়ে আদ্য ২৩ জন, বেদান্ত 'ক' বিষয়ে আদ্য ১৭ জন, মধ্য ৯ জন, উপাধি ৪ জন। ন্যায় 'ক' আদ্য ১ জন, ন্যায় 'খ' আদ্য ৫ জন এবং উপাধি ৬ জন, সংক্ষিপ্তসার মধ্যপরীক্ষায় ১ জন পৌরোহিত্য বিষয়ে আদ্য ১ জন, মধ্য ১ জন এবং উপাধি ২ জন, চন্দ্রিকা বিষয়ে আদ্য ৫ জন, মধ্য ২ জন, সাংখ্য বিষয়ে আদ্য ৬ জন, মধ্য ৫ জন এবং উপাধি ২ জন। মীমাংসা বিষয়ে আদ্য ২ জন, উপাধি ১ জন, পুরাণ বিষয়ে আদ্য ৭ জন, মধ্য ৪ জন, উপাধি ৩ জন, মুগ্ধবোধ বিষয়ে আদ্য ৪৯ জন, মধ্য ২০ জন এবং উপাধি ১২ জন এবং জ্যোতিষ বিষয়ে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২ জন। হালিশহরের এই চতুষ্পাঠী থেকে যাঁরা যাঁরা উপাধি পেয়েছেন তাঁরা হলেন—

কোন বিষয়	নাম	কোন খৃষ্টাব্দ
(১) কাব্য	শ্রী গৌরীশঙ্কর মিশ্র	১৯৫৩
(২) কাব্য	শ্রী বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৬৬
(৩) কাব্য	শ্রী গোপালচন্দ্র কর মহাপাত্র	১৯৭১
(৪) কাব্য	শ্রী অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৭১
(৫) কাব্য	শ্রী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী	১৯৭২
(৬) কাব্য	শ্রী নিতেশ কুমার ভট্টাচার্য	১৯৭৩
(৭) কাব্য	শ্রীমতী মাধুরী দেবী	১৯৮৮
(৮) মুগ্ধবোধ	শ্রী অমলেন্দু সরদার	১৯৬৪
(৯) মুগ্ধবোধ	শ্রী বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৭১
(১০) মুগ্ধবোধ	শ্রী প্রমোদকুমার ব্রহ্মচারী	১৯৭৫
(১১) মুগ্ধবোধ	শ্রী সমরেন্দ্র সরকার	১৯৭৫
(১২) মুগ্ধবোধ	শ্রী শৈলেন্দ্র হালদার	১৯৭৮
(১৩) মুগ্ধবোধ	শ্রী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়	১৯৭৯
(১৪) মুগ্ধবোধ	শ্রী কমললোচন মিশ্র	১৯৮০
(১৫) মুগ্ধবোধ	শ্রী রাজেন ব্রহ্মচারী	১৯৮৮
(১৬) মুগ্ধবোধ	শ্রী উমাচৈতন্য ব্রহ্মচারী	১৯৮৯
(১৭) মুগ্ধবোধ	শ্রী গুরুকৃষ্ণ আচার্য	১৯৯০
(১৮) মুগ্ধবোধ	শ্রী ব্রজকিশোর মহাপাত্র	১৯৯১-৯২
(১৯) মুগ্ধবোধ	শ্রী বিমল কিঙ্কর পাণ্ডা	১৯৯১-৯২
(২০) ন্যায় 'খ'	শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী	১৯৫৬

(২১) ন্যায় 'খ'	শ্রী নলিনীকান্ত মিশ্র	১৯৫৭
(২২) ন্যায় 'খ'	শ্রী হেমন্তকুমার ভট্টাচার্য	১৯৫৮
(২৩) ন্যায় 'খ'	শ্রী দেবদেব ভট্টাচার্য	১৯৭৪
(২৪) পুরাণ	শ্রী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য	১৯৫৭
(২৫) পুরাণ	শ্রী বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৬৮
(২৬) পুরাণ	শ্রী সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী	১৯৭৬
(২৭) মীমাংসা	শ্রী গিরীশচন্দ্র তর্কতীর্থ	১৯৫৭
(২৮) কলাপ	শ্রী গদাধর পূততুণ্ড	১৯৫৮
(২৯) কলাপ	শ্রী নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯৬৭
(৩০) সাংখ্য	শ্রী পঞ্চানন বেদান্ততীর্থ	১৯৬৩
(৩১) সাংখ্য	শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য	১৯৭৫
(৩২) পৌরোহিত্য	শ্রী গদাধর পূততুণ্ড	১৯৬৮
(৩৩) পৌরোহিত্য	শ্রী প্রমথনাথ ভট্টাচার্য	১৯৬৮
(৩৪) বেদান্ত	শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য	১৯৬৮
(৩৫) বেদান্ত	শ্রী সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী	১৯৭৪
(৩৬) বেদান্ত	শ্রী গুরুপ্রসাদ দেবশর্মা	১৯৭৫
(৩৭) বেদান্ত	শ্রী গোপালচন্দ্র কর মহাপাত্র	১৯৮৭
(৩৮) উপনিষদ্	শ্রী গোপাল চন্দ্র কর মহাপাত্র	১৯৯৩-৯৪

৩.৭ আধুনিক পর্বে হালিশহরের সংস্কৃত চর্চার যে ধারাটির পরিচয় এখানে পাওয়া গেল, তাতে যে বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি তা হল যুগের অভিঘাতকে তুচ্ছ করে আধ্যাত্মিকতা বিকাশের চেষ্টা। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর অধিকাংশই আশ্রমের অন্তেবাসী। বহিরাগত ছাত্রের সংখ্যা খুব কম। মঠ প্রতিষ্ঠার পর অন্তেবাসীদের ধর্মীয় বোধ জাগ্রত করতে, তাদের পঠন-পাঠনে আদি সনাতন হিন্দুধর্মের ভাবধারা ও ঐতিহ্য যাতে রক্ষিত হতে পারে তারই প্রচেষ্টা আছে এতে সন্দেহ নেই। যেহেতু সনাতন ধর্মের মূল ভারধারা বিভিন্ন তত্ত্ব ও দার্শনিক প্রস্থান সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যেই নিহিত আছে তাই সংস্কৃত চর্চাটা সন্নাসী, ব্রহ্মচারী ও আশ্রমিকদের পক্ষে বেশি রকমভাবে যুক্ত। তবে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার যখন সনাতন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তখন এটাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষ বহুত্ববাদী। নানা ধর্মের দেশ। অনেক সময় সংস্কৃত ভাষাটিকে নিয়ে ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত করা হয়। সেটা হলেই বিপত্তি। সুকুমার সেন, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এঁরা আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, আবার সৈয়দ মহঃশহীদুল্লহ মজতুবা আলি, সৈয়দ্ মুস্তাফা সিরাজ এঁরাও কম সংস্কৃত ভাষা জানতেন বা জানেন না তা নয়। মুক্ত দৃষ্টিতে এঁরা সব ভাষায়ই শাস্ত্রগুলোর পাঠ গ্রহণ করেছেন। আসলে সংস্কৃত ভাষার চর্চাটি, বর্তমান লেখকের মতে, অন্যত্র নিহিত আছে।

গৃহে বা সংসার আশ্রমে থেকে ধর্মীয় সাধনা সম্পূর্ণ হত না—এই রকম চিন্তা থেকেই বেদ-বেদান্ত এবং উপনিষদ্ পাঠের পর আরো অনন্ত জিজ্ঞাসা, দর্শন চিন্তা উপস্থিত হত বলেই অরণ্যে গিয়ে আধ্যাত্মিক দর্শনের পাঠ গ্রহণ করতে হত। তাই পরে 'আরণ্যক' সঙ্কলিত হয়েছিল। আমাদের কাছে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন রয়েছে আমাদের দেশের সভ্যতার সংস্কৃতির সমাজের শিল্পকলার প্রায় সবকিছুরই প্রাচীন আদর্শ জানবার জন্যে। এমনকি ভারতীয় প্রদেশগুলির প্রত্যেকটির দেশীয় ভাষায় শব্দের মূল খুঁজতে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্ত হতে হয়। 'দেশ ভাষা' সংস্কৃত শাস্ত্রের মূল বিদ্যারই অন্তর্গত। ইংরেজির ক্ষেত্রে যেমন অভিধানে মূল শব্দটি বুঝিয়ে দিতে ল্যাটিন শব্দটি আহরণ করে দেখানো হয়, তেমনি আমাদের যে কোনো প্রদেশের মাতৃভাষার উৎসমূল খুঁজলে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব থাকেই। দক্ষিণ ভারতে এটি সর্বাংশে সত্য। সংস্কৃত শিক্ষা এ কারণেই জরুরী। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি, প্রাচীনতর সমাজ ব্যবস্থা, বিভিন্ন চিন্তার ও জ্ঞানচর্চার জন্যও সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন আছে। এমন কি এখনকার যে শাসনব্যবস্থা, আইন-বিচার, নিয়মকানুন, ভূমি রাজস্ব, দণ্ডনীতি এ সবই চাণক্যের অর্থশাস্ত্র, দায়ভাগ, মিতাক্ষরা—প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আজও যদি কোনো শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন দলিল মেলে সেটারও পাঠোদ্ধার করতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, দর্শনের বিভিন্ন শাখায়, জ্ঞান চর্চায়, ইতিহাস চর্চায়, সাহিত্যের ভাব অনুশীলনে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান না থাকলে অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই শিক্ষাটি সম্পূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত তাহার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়া আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাইব।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : (১) বঙ্গীয় সংস্কৃতি শিক্ষা পরিষদ (২) আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিশহর (৩) স্বামী বিমলানন্দ (৪) শ্রী গোপাল চন্দ্র কর মহাপাত্র, কাব্য ব্যাকরণ বেদান্ত উপনিষদ তীর্থ (৫) সম্পাদক, আর্যদর্পণ পত্রিকা, হালিশহর।

লেখক পরিচিতি : ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সদস্য এবং সমাজতত্ত্ব ও লৌকিক ধর্ম বিষয়ে গবেষণারত

হালিশহরে নারী শিক্ষা ও মহিলা সমিতি

——————————————————লক্ষ্মীমণি ভট্টাচার্য

হালিশহরের নারী শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে এর উৎস সন্ধানে যেতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম, দ্বিতীয় দশকে। আজ হালিশহরের অনেক মহিলা উচ্চশিক্ষিতা, কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা। এদেশে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে বিদেশ থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় পারদর্শিনী হয়ে ফিরে এসেছেন হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রী। কিন্তু এই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হালিশহরের নারী পেয়েছে বলতে কি বলতে কি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে।

হালিশহরের বালকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'হালিশহর উচ্চবিদ্যালয়' ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা —'গুডউইল ফ্রেটারনিটি'। এই বিদ্যালয়ে হালিশহরের বালিকারা উচ্চশিক্ষা লাভের প্রথম সুযোগ পায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় শুরু হয় বালিকাদের জন্য শিক্ষা পঞ্চম শ্রেণী থেকে। হালিশহরের নারী শিক্ষা ধারার দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়' থেকে।

বৈদ্যপাড়ার কর্নেল কে পি গুপ্ত এবং তাঁর কন্যা শ্রীমতী সুরবালা গুপ্ত তাঁদের নিজের বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে। এটি সম্ভবত নারী শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয়। দুজন খ্রীষ্টান মহিলা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করতেন। একজন ইউরোপীয়ান মহিলা সপ্তাহান্তে এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে আসতেন নৈহাটি থেকে। এই স্কুলটি "মেমের স্কুল" নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলের বালিকাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ রইল না। তখন হালিশহরবাসী ঁজগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঁনিতাইচরণ চক্রবর্তী নিজ নিজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালকদের সঙ্গে বালিকাদেরও শিক্ষা দান করতে লাগলেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে "গুরুমার স্কুল"। বিদ্যালয়টির নাম ছিল "বাজার পাড়া বালিকা বিদ্যালয়"। কিন্তু সকলের কাছে এই বিদ্যালয়টি "গুরুমার স্কুল" নামেই বেশি খ্যাত ছিল। রামপ্রসাদ ভিটের পিছনে ছিল গুরুমার বাসগৃহ। তিনি বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর বাজার পাড়ার জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটীতে।

বর্তমানে এ বিদ্যালয়টি "কিরণশশী বালিকা বিদ্যালয়" নামে পরিচিত। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর হালিশহরের আরো কয়েকটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে বলিদাঘাটার "রামদাস বিদ্যালয়"ই উল্লেখযোগ্য।

আবার ফিরে আসি ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এইসময়ে হালিশহরে শিক্ষানুরাগী কয়েকজন ব্যক্তি নারী শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়। বাজার পাড়ার স্বর্গীয় নারায়ণ দাস বসুমল্লিকের চেষ্টায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হালিশহর উচ্চবিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। সেইসময় হালিশহরে সহশিক্ষার কথা অনেকেই ভাবতে পারননি। এইসময়ে বিদ্যালয়ে দুজন শিক্ষিকা নিযুক্ত হন। এঁরা হলেন ঁঅপর্ণা তপাদার ও শ্রীমতী রেণুকা ঘোষ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করলে উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সেখানেই প্রেরিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ মার্চ অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার আগে আরেকটি স্কুল "তারিনী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চৌধুরী পাড়ার ঁতারিনীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রামসীতা গলির ঁঅমূল্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্হিবাটীতে এই বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। ১৯৪৯ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুয়ারি "তারিনী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল" শিক্ষিকা ও ছাত্রীসহ অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। ১৯৫২ খ্রীঃ থেকে অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় মাধ্যমিক পর্যায়ে ছিল। ১৯৬১ থেকে ১৯৭৫ উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণী) পরে আবার মাধ্যমিক স্তরে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯৯ খ্রীঃ শিক্ষাবর্ষ থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

হালিশহরে বর্তমানে হালিশহর উচ্চবিদ্যালয়, আদর্শ বিদ্যাপীঠ ও রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ—এই সব স্কুলে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, মল্লিগবাগ উচ্চবিদ্যালয় ও আদর্শ বিদ্যাপীঠে পঞ্চম শ্রেণী থেকে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে।

হালিশহরের নারী শিক্ষা বিস্তারে "হালিশহর মহিলা সমিতি'র অবদান উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী নিবেদিতা সেনগুপ্তা অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুদিন পর একটি মহিলা সমিতি গঠন করেন। সেলাই, তাঁতের কাজ, এইসব চলত বৈদ্যপাড়ার কর্নেল কে পি গুপ্তর বাড়ির একাংশে। শ্রীমতী সেনগুপ্তা যখন কুমোর পাড়ার স্বর্গীয় ড. কানাইলাল রায়ের বাড়িতে থাকতেন তখন সেখানে বয়স্ক মহিলাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৬২/৬৩ খ্রীঃ তিনি "বয়স্কা নারীশিক্ষা কেন্দ্র" শুরু করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রটি প্রথমে শুরু হয়েছেন সরকার

বাজারের স্বদেশ সরকারের বাড়িতে। অপর্ণা তপাদার বারেন্দ্রগলিস্থ বাসভবন "ফুল্লশ্রী" সংলগ্ন একখণ্ড জমি দান করলে সেখানে মহিলা সমিতি একটি গৃহ নির্মাণ করে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে "বয়স্কা নারী শিক্ষা" কেন্দ্রটিতে শিক্ষাদান চলতে থাকে। এটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে আছে।

পরবর্তীকালে হালিশহরে আরো মহিলা সমিতি গঠিত হয়েছে। হালিশহর পৌরসভার পরিচালনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের যে কাজ শুরু হয়েছিল তাতে হালিশহরে বহু দরিদ্র নিরক্ষর মহিলা সাক্ষর হবার সুযোগ পেয়েছিল। সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলিতে সন্ধ্যায় মহিলারা এসে পড়াশুনা করতেন। হালিশহরেই নারী শিক্ষার অগ্রগতি নিশ্চয় হয়েছে তবে এখানে একটি মহিলা কলেজ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

তথ্য সংগ্রহ : ১৯৫৪ খ্রীঃ প্রকাশিত "কুমারহট্ট-হালিশহর উচ্চবিদ্যালয় শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ"—গুডউইল ফ্রেটারনিটি।

লেখক পরিচিতি : প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা, হালিশহর অন্নপূর্ণা বালিকা বিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট লেখিকা।

সৌজন্য : কিরণশশী জন্ম শতবর্ষ পত্রিকা (১৯৮০)

হালিশহরের ব্যক্তি/স্থান ঘিরে কিংবদন্তি এবং পরলোকচর্চা

এক ঃ বেড়া বাঁধার সময় স্বয়ং মা কালী একবার কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীর রূপ ধারণ করে রামপ্রসাদকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিল এ কাহিনী তো লোকের মুখে মুখে ঘোরে আজও।

দুই ঃ রামপ্রসাদ একদিন ভিক্ষার নাম করে বেড়িয়ে সাধন পীঠে মায়ের সাধনায় মগ্ন হয়ে পড়লে, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী যশোদা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে এক বৃদ্ধা চাল, ডাল প্রভৃতি এনে রামপ্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছে বলে যশোদাকে দিয়ে চলে যায়। রামপ্রসাদ বাড়ি ফিরলে সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়ে তাঁরা বুঝতে পারেন স্বয়ং মা কালী বৃদ্ধারূপ ধারণ করে তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে স্ত্রী যশোদা রামপ্রসাদের সাধনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জন্য বাইরে যেতে দিতেন না।

তিন ঃ কালীকাতলা বাজারের কাছে কয়েকজন গ্রামবাসী সেখানে তালগাছের নীচে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে এক সন্ন্যাসীকে বসে থাকতে দেখে। তারা লক্ষ্য করে ঐ তাল গাছে পদ্মফুল ফুটে আছে। পরবর্তীকালে ঐ সন্ন্যাসীর পরিচয় জেনে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সন্ন্যাসী হলেন জটিয়ারাম বাবাজী। আর কৃষ্ণবিগ্রহ হল শ্রীশ্রীরাসবিহারী জিউ।

চার ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় মন্বন্তরের প্রকোপ প্রশমিত করার জন্য রুদ্র ভৈরবীর পূজার প্রচলন হয়। জনশ্রুতি আছে কোন এক দৈবাগত সন্ন্যাসী হালিশহরে রুদ্র ভৈরবীর পূজা করার নির্দেশ দেয়।

পাঁচ ঃ হালিশহরের ঘোষাল গলিতে যে শীতলা মন্দির আছে সেখানে একটা মনসা গাছ ছিল। এর পূজারী গাছটি কাটবার পর স্বপ্নাদিষ্ট হলে সেখানে শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন হয়।

আবার শোনা যায় বসন্ত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করলে খাসবাটীর নিস্তারিণী গঙ্গোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে সেখানে শীতলাদেবীর পূজা গ্রহণ করেন।

ছয় ঃ মহিষাদলের রাজকুমার দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মত স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে হালিশহরে আসেন রাজমাতার সঙ্গে।

হালিশহরের গঙ্গাবক্ষে অবস্থানের সময় বৈদ্যপাড়ার এক কবিরাজ ঘটনাটি জানতে পেরে তাঁকে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তোলেন। রাজমাতা অর্থ পুরস্কার দিতে চাইলে সেই কবিরাজ তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে কবিরাজের ইচ্ছানুযায়ী বৈদ্যপাড়ায় তিনি দুটি শিব মন্দির নির্মাণ করে দেন।

সাত ঃ সাবর্ণ চৌধুরী বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী গঙ্গাস্নানের সময় জলের মধ্যে এক শিলার স্পর্শ পেতে থাকেন। একদিন স্বপ্নাদেশ পেয়ে এক অন্ধভাস্করকে দিয়ে সেই শিলা থেকে বুড়ো শিব, শামরায় এবং সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি নির্মাণ করান। মূর্তি নির্মাণ শেষ হলে সেই অন্ধ ভাস্কর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

আট ঃ রাণী রাসমণি স্বামী রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মা জগদম্বাকে পুজো দেবার জন্য কাশীর দিকে গঙ্গাপথে যাত্রাকালে দক্ষিণেশ্বরের কাছে মা জগদ্দম্বার স্বপ্নাদেশ পান—তুই এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা কবে আমাকে পূজা কর, কাশী যাবার প্রয়োজন নেই।

নয় ঃ নিগমানন্দ পরমহংস, পূর্বনাম নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, হালিশহরে খাসবাটী অঞ্চলে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুবালাকে বিবাহ করেন। দিনাজপুরে কর্মক্ষেত্রে থাকাকালীন কুতুবপুরে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অববহিত পরেই নলিনীকান্ত তাঁর কর্মস্থলে স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দেখতে পান। তখনও তিনি মৃত্যু সংবাদ পাননি। কিছুদিন পর বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ শুনে পরলোক সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর জীবনের মোড় অন্যখাতে বইতে শুরু করে।

দশ ঃ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী তাঁর 'জ্ঞানী গুরু' নামে বইয়ে 'ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিমত' নামে একটি ছোট্র প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত নিয়ে আলোচনা করে মনে একটু অশান্তি ভোগ করছিলেন। সেজন্য যেদিন প্রবন্ধটি ছাপা হয়, সেই দিন (১৩১৪ সালের ১৯ চৈত্র বুধবার রাত্রি দেড় ঘটিকার সময়) যোগনিদ্রার সাহায্যে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'আত্মা' আনয়ন তাঁর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হয়—

"**প্রঃ** *আপনি কেমন আছেন?*

উঃ সুখে আছি। পৌরাণিক ভাষায় স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি।

প্রঃ *আপনার আর জন্ম হইবে কি?*

উঃ ভোগান্তে জন্ম অবশ্যম্ভাবী।

প্রঃ *আপনার লিখিত 'ধর্মতত্ত্ব' বইখানা পড়িয়া আপনার নিজের ধর্মজ্ঞান ঠিক কারিতে পারি কি?*

উঃ না—না। আমি ধর্মোপোদেষ্টা গুরু বা ধর্মপ্রচারক নহি। সুতরাং কোন

ধর্মমত প্রচারও আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল এক শ্রেণীর লোকের হিন্দুধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। .... শিক্ষিক ব্যক্তির প্রকৃতি পর্যালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মধ্যে ধর্মব্যাখ্যা করিতে না পারিলে কেহই হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্মকে তাহাদের মুখরোচক করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, কুসংস্কার খণ্ডন বা স্থল বিশেষে শাস্ত্রভাগকে অগ্রাহ্য করিতে হইয়াছে। ...

প্র ঃ *আমি আপনার উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণে প্রতিবাদ প্রবন্ধটি ছাপা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি।*

উঃ প্রতিবাদ প্রবন্ধটি প্রচারিত হইলে সমাজের উপকার হইবে। ... আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় না বলিয়া আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূর হইল। নিশ্চিন্ত মনে যথাস্থানে গমন করিলাম।"

(সৌজন্য : বঙ্কিমচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়)

এগারো (ক) ঃ "একদিন এক রমণী রামপ্রসাদের বাড়িতে এসে বললেন—বাবা আমি অনেক দূর থেকে তোমার গান শুনতে এসেছি। সামান্য বেশ-ভূষার একজন অতি সাধারণ স্ত্রী লোক। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—মা তুমি বসো, আমি চট করে স্নান সেরে আসি। ফিরে এসে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে লেখা রয়েছে—বাবা, আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনতে এসেছিলুম, তোমার কথা মতো অপেক্ষা করতে না পেরে আমি আবার কাশী ফিরে গেলুম। এইবার তুমি আমার এখানে এসে গান শোনাবে।

লেখা পড়ে রামপ্রসাদ উদ্‌ভ্রান্তের মতো তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন এখুনিই আমাকে কাশী যেতে হবে। জলপথে সে পথ বড় দুষ্কর। পথে চোর-ডাকাত, দস্যু-তস্করের উপদ্রব। নদীর বিচিত্র গতি, ঝড়-ঝঞ্ঝা। তবু তিনি চেপে বসলেন নৌকায়। হালিশহরের ঘাট থেকে যাত্রা শুরু হলো।

এইবার দুটি মত আছে—একমতে রামপ্রসাদ কাশী গিয়েছিলেন। আর একমতে তিনি ত্রিবেণী পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন—তোমাকে কাশী যেতে হবে না। তুমি তোমার পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসেই গান শুনিও, আমি শুনতে পাবো।"

(খ) ঃ "রামপ্রসাদ একদিন পূজায় বসেছেন। হাতের কাছে যতরকমের ফুল ছিলো সব সাজিয়েছেন। ধূপ জ্বেলেছেন, হোম সাঙ্গ হয়েছে। হঠাৎ তার মনে হলো, পদ্ম চাই, মাকে আজ পদ্মফুলে পূজা করবো। একশ আট পদ্ম সাজিয়ে দেবো মায়ের চরণতলে। কিন্তু কোথায় পদ্ম। প্রসাদ শিশুর মতো কাঁদছেন—মা তুই সত্য, তুই সর্বনিয়ন্ত্রা, তোর ভেতরেই না জগৎ বিদ্ধৃত,

আমার বাসনা পূর্ণ করে দে মা। রাঙা চরণে রাঙা জবা দিয়েছি, এখন যে রাঙা পদ্ম দেবার সাধ হয়েছে মা। বলছেন আর কাঁদছেন, এমন সময় শুনলেন তাঁর ভেতরে মায়ের কণ্ঠস্বর—প্রসাদ, তুমি একটা কাজ করো, ওই যে বাড়ির বাইরে এককোণে ঐ যে ছোট গাছটি। ঐ গাছ থেকে পদ্মফুল নিয়ে এসো। প্রসাদ মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলেন, কোথায় সরোবর? কোথায় পদ্ম? এটা একটা গাব গাছ। গাব গাছে পদ্মফুল? কিন্তু মায়ের নির্দেশে প্রসাদ গাব গাছে উঠে পড়লেন। উঠে দেখছেন গাছের মাথায় শতশত পদ্মফুল ফুটে উঠছে। আনন্দে অধীর সাধক সাজিভরে ফুল তুলে নেমে এলেন নিচে। মায়ের পা ঢেকে দিলেন অজস্র পদ্মে।"

সৌজন্য : (ক, খ)—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২১-১০-২০০০
সংগ্রাহক : সম্পাদক, নগর পেরিয়ে

রামপ্রসাদ ভিটাতে অন্নকূট উৎসব। ছবি : রঘুনন্দন দে।

নজরুল গবেষণায় পথিকৃৎ হালিশহর

——————————— স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হালিশহরের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বিদেশের সীমানায় নজরুলকে যিনি ভিন্ন একমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন, তিনি হলেন কুমিল্লার চিনামুড়ী গ্রামের, বর্তমান হালিশহর নবনগরের নজরুল বিষয়ক গবেষক ড. বাঁধন সেনগুপ্ত।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে একবার কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কলকাতার ক্রীষ্টফার রোডের বাড়িতে চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিলেন বাঁধনবাবু। নজরুল তখন বাক্‌শক্তি রহিত। বাড়িতে পৌঁছে দেখেন উমাদেবী (কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী) মেঝেতে শুয়ে আছেন। বাথরুমে নজরুল। তিনি সটান সেখানে হাজির হয়ে কবিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসতেই রোমাঞ্চিত হলেন। মনে মনে স্থির করলেন যে তাঁর গবেষণার বিষয় হবে 'নজরুল'। কিন্তু কবির কোন দিকটা নিয়ে তিনি গবেষণা করবেন মনস্থির করতে পারছিলেন না। বাঁধনবাবুর বাবা ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। সেই সুবাদে মুজফ্‌ফর আহমেদ (কাকাবাবু) তাঁকে চিনতেন। কাকাবাবু তখন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। ছুটলেন বাঁধনবাবু তার কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ, উপদেশ নিতে। প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখ্য মুজফ্‌ফর আহমেদ ছিলেন নজরুলের বিশিষ্ট বন্ধুদের একজন। তিনি যে এ ব্যাপারে উৎসাহী হবেনই সে কথা বলাই বাহুল্য। নজরুলের যাবতীয় লেখালেখির ফাইলগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে তাঁর কাছে। তিনি বাঁধনবাবু সবরকমের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু বিষয় নির্বাচনে সঠিক দিশা দিতে পারলেন না। অবশেষে ছুটলেন অধ্যাপক গোপাল হালদারের কাছে। কলকাতা জি পি ও-র বড় ঘড়িটির নিচে দাঁড়িয়ে গোপাল হালদারের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর গবেষণার বিষয় নির্দিষ্ট হল —'নজরুলের কাব্যগীতি'।

এবার কাজ শুরু করার পালা। নানা বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে এই বিষয়ে। অনেকেই তাঁকে নিরুৎসাহ করেছেন যেহেতু তাঁর বিষয়টি ছিল নজরুল। আবার সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মানুষের কাছে পেয়েছেন উৎসাহ।

একদিন আপিসের সহকর্মী জয়ন্তী নিয়োগীর (মিঠু) এক আত্মীয় অধ্যাপক ডঃ সরোজকুমার দাসের সান্নিধ্যে এলেন। সরোজবাবু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য

ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বাঁধনবাবুকে অত্যন্ত উৎসাহ দেন। অবশেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষের অধীনে গবেষণার কাজ শুরু করেন। সময়টা ১৯৭৫ সাল। ১৯৭৬ সালে 'নজরুল কাব্যগীতি—বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ণ' শীর্ষক গবেষণার দরুন তিনি 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত হন। বাঁধনবাবুর গবেষণা বিষয়ে ডঃ অজিত ঘোষকে লেখা মুজফফ্‌র আহমেদের চিঠিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। এই চিঠিতে তিনি ডঃ ঘোষকে ছাত্রটির উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি নজরুলকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ লিখে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল ছাড়াও বাঁধন সেনগুপ্তর অন্যান্য গ্রন্থ ও কর্মকাণ্ডেরও পরিচয় দেওয়া হল।

(১) নজরুলের ছেলেবেলা (১৯৯৭)

(২) রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল (১৯৯৮)

(৩) কাজী নজরুল ইসলাম—তথ্যসূত্র গ্রন্থ ও গানের তালিকা (১৯৯৯)

(৪) আলোর উদ্যাম পথিক (২০০০)

(অধ্যাপক সুদীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথভাবে)

(৫) ঋত্বিক চলচ্চিত্র কথা (১৯৮২-সত্যজিৎ রায়ের ভূমিকা সহ)

(৬) বঙ্কিম রচনাবলী সমগ্র (১৯৮৩—ক্ষুদিরাম দাসের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পাদনা)

(৭) বঙ্কিম রচনাবলী সমগ্র (১৯৮৪—সম্পাদনা)

(৮) ইন্দুবালা (১৯৮৪—ইন্দুবালা নিজেই ভূমিকা লিখেছেন)

তিনি কিছু পত্রপত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন—

(১) এখন সংস্কৃতি (সাহিত্য বিষয়ক দ্বিমাসিক) ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ হয়েও বর্তমানে বন্ধ আছে। বাংলা সাহিত্যের দু একজন ছাড়া প্রায় সব বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক—অন্নদাশংকর থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ।

(২) অবসর (১৬ বছর সম্পাদনা) ঃ পত্রিকাটি এ জি বেঙ্গলের সাংস্কৃতিক মুখপত্র।

(৩) কুমারহট্ট হালিশহর ঃ সম্পাদনা (২য় পরিবর্তিত সংস্করণ ১৯৯৮, দি হালিশহর গুডউইল ফ্রেটারনিটি প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ)।

তাঁর প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা আটশোর মতো। 'দেশ' পত্রিকার প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় ১০ অক্টোবর ১৯৮১ সালে। এছাড়া পরিচয়, নন্দন, বারোমাস ইত্যাদি অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখে চলেছেন বাঁধনবাবু। তাঁর অনুবাদ

কবিতার সংখ্যা শ'খানেক। উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌথ উদ্যোগেও প্রকাশ হয়েছে কিছু কবিতা। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে তিনি আগ্রহীবোধ করেননি কখনোও। যদিও এটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বেতার এবং দূরদর্শনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। সেই ১৯৬৯ সাল থেকে বেতারে এবং ১৯৭৫ সাল থেকেই নিয়মিত অনুষ্ঠান করে. চলেছেন অবশ্যই বিষয় নজরুল। নজরুলের লেখা 'অগ্নিগিরি' নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি যেটি বেতারে সম্প্রচারিত হয়েছে।

তথ্যচিত্র করেছেন বাঁধনবাবু বেশ কয়েকটি।

সেগুলি হল ঃ

(১) দি ড্যান্সিং এ্যাঞ্জেল (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে নিয়ে)

(২) নেম ইজ্ ইন্দুবালা

(৩) কুমারহট্ট-হালিশহর।

নজরুল গবেষক এই সুবাদে তিনি বিদেশে গেছেন একাধিকবার। কখনও ঢাকা, কখনও আবার আমেরিকায়। ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল প্রসঙ্গে বক্তৃতা দেন। ১৯৯৭ সালে চট্টগ্রাম চলচ্চিত্র কেন্দ্রে (বাংলাদেশে) আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন তিনি। বিষয় ছিল ঃ ঋত্বিক ঘটক। ১৯৯৯ সালে আমেরিকায় 'A Centenery tribute to Centenerian Poet' শিরোনামে বক্তৃতা দেন। এছাড়া তিনি গেছেন জার্মানী এবং ইংল্যান্ডে। কবি নজরুলকে তুলে ধরেছেন বারবার বিশ্বের দরবারে।

চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী তাঁকে পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। হাতে তুলে দিয়েছেন স্মারক এবং পুরস্কার অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা। ১৯৯৩ সালে নবজাতক প্রকাশনা (কলকাতা) তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

(১) নজরুলের সামগ্রিক জীবনী এবং (২) বাংলাদেশে নজরুলের রাজনীতি এই গ্রন্থগুলির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তাঁর আগামী দিনের পরিকল্পনা।

লেখক পরিচিতি : প্রতিষ্ঠিত ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক

আরো তথ্যে হালিশহর

ঘাট

■ **রাসমনি ঘাট ঃ** রানী রাসমনির পিতৃভূমি গোলাবাড়ি অঞ্চলে এই ঘাটটি। একদা এই ঘাটে রাসমনি স্নান করার সময় তাঁর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাস তাঁকে বিয়ে করেছিল। রাসমনির ব্যবহৃত ঘাটটির কিছু ইঁটের অস্তিত্ব ছাড়া সবই জলে তলিয়ে গেছে।

■ **বকুলতলা ঘাট ঃ** ঘাটটি ৮৫নং বাস রাস্তার ধারে স্বামী নিগমানন্দ আশ্রমের পাশে অবস্থিত। বকুলতলা স্নানের ঘাটটিকে আশ্রম ঘাটও বলা হয়।

■ **শ্মশান ঘাট ঃ** ঘাটটি মূলত শবদাহ করার জন্য। নিগমানন্দ আশ্রমের পাশে ঘোষপাড়া রোডের ধারে এই ঘাটটি। হালিশহর পুরসভা কর্তৃক ১৯৯১ সালে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির উদ্বোধন করা হয়। এখন এখানে যথারীতি শবদাহ করা হয়।

■ **ডানলপ ঘাট ঃ** শ্মশান ঘাট ছেড়ে দু পা বাস রাস্তা ধরে এগোলেই ডানলপ ঘাট পড়বে। ঘাটটি মূলত খেয়া পারাপারের জন্য ব্যবহার করা হয়। ওপারে সাহাগঞ্জে ডানলপ রাবার ফ্যাক্টরি থাকার দরুন ঘাটের নাম হয় ডানলপ ঘাট। ঘাটটি বাঁধান নয় তবে একটি বাঁশের অস্থায়ী ঘাট আছে।

■ **রামপ্রসাদ ঘাট ঃ** হালিশহর পুলিশ ফাঁড়ির সামনে এই ঘাটটি অবস্থান করছে। কথিত আছে, সাধক রামপ্রসাদ মা কালীকে মাথায় নিয়ে এই ঘাটেই আত্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে হালিশহর পুরসভা কর্তৃক রামপ্রসাদ স্নানের ঘাটটি নির্মিত। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পুন্যার্থী এই ঘাটে স্নান করতে আসেন।

■ **বাঁধা ঘাট ঃ** রামপ্রসাদ স্নানের ঘাটের পরই বাঁধা ঘাটটি অবস্থিত। ১৮৮৮ সালে বিশিষ্ট সমাজসেবী কর্নেল কালীপদ গুপ্তর জননী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা দেবীর দ্বারা এই স্নানের ঘাটটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **সিদ্ধেশ্বরী ঘাট ঃ** কর্নেল কে পি গুপ্ত রোড যেখানে ঘোষপাড়া রোডের সঙ্গে মিলেছে অর্থাৎ বলিদাঘাটায় এই ঘাটটি অবস্থিত। ১৯৯৮ সালে হালিশহর পুরসভা সিদ্ধেশ্বরী স্নানের ঘাটটি তৈরি করে। ঘাটের পাশে ৩০০ বছরের সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির রয়েছে।

■ **খাসবাটী ঘাট ঃ** ঘোষপাড়া ৮৫ নং বাস রাস্তার ধারে খাসবাটী স্নানের ঘাটটি রয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে দামোদর ভট্টাচার্য ওরফে মন্মথনাথ ভট্টাচার্য তাঁর নিজ ব্যয়ে এলাকার মানুষের স্নানের সুবিধার্থে খাসবাটী স্নানের ঘাটটি নির্মান করেন। ঘাটটি বর্তমানে ধ্বংস প্রায়।

■ **সাধু ঘাট ঃ** বাণী মন্দির ও লালকুঠির মাঝামাঝি ৮৫ নং বাস রাস্তার পাশে অবস্থিত সাধুঘাট। সচ্চিদানন্দ গিরি নামে এক সাধু বাস করতেন এখানে। শোনা যায় তাঁর নামানুসারে এই নামকরণ। সচ্চিদানন্দ গিরি মহারাজ ঘাটের সিঁড়ির প্রথম ধাপের পাশে ১৩৭৮ সালের আশ্বিনে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঘাটের সিঁড়ি শেষ ধাপের দুই পাশে দুটি শিব মন্দির আছে।

■ **কোনা বিশালাক্ষ্মী ঘাট ঃ** ঘোষপাড়া বাসরাস্তার ধারে কোনা বিশালাক্ষ্মী ঘাটটি অবস্থিত। ঘাটের এক পাশে হুকুমচাঁদ মিলের ওয়াল অপর পাশে যোগানন্দ আশ্রম। ঘাটটিতে শিব ও শীতলা মন্দির আছে। ৩০-৩৫ বছর আগে হুকুমচাঁদ মিল কর্তৃপক্ষ ঘাটটি তৈরি করেন। অনেকে এই ঘাটকে জগন্নাথ ঘাটও বলে।

তথ্যসংগ্রহ : রঘুনন্দন দে—ফিচারধর্মী লেখক এবং আলোকচিত্রী।

বাজার

হালিশহর পৌর এলাকার বাজার ঃ হালিশহর পৌর এলাকার প্রায় লক্ষাধিক মানুষের বসবাস, সেই বসবাসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই পৌরএলাকার বিভিন্ন বাজার। এছাড়াও দুটি জুটমিল ও একটি পেপার মিলের শ্রমিকদের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সব বাজার।

■ **হুকুমচাঁদ বাজার ঃ** ১৯৩৫ সালে হুকুমচাঁদ বাজার স্থাপিত হয়। এই বাজারে স্থানীয় মিলের লোকেরা ছাড়াও হালিশহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ আসেন এই রাজারে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। এই রাজারটির প্রতিষ্ঠাতা এস্ সবরবতী। তারই পুত্র আবদুল গফফর পরিচালনা করছেন।

■ **কোনা কলোনী বাজার ঃ** কোনো কলোনী বাজার এই পৌর এলাকার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। এই বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতার পর। বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ এসে বসবাস শুরু করে গড়ে ওঠে কলোনী। আর এই সাথেই গড়ে ওঠে কোনো কলোনী বাজার আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে। বর্তমানে বাজারটির পরিচালনার দায়িত্বে কোনো কলোনী ব্যবসায়ী সমিতি।

■ **হালিশহর সরকার বাজার ঃ** আজ থেকে ৪০ বছর পূর্বে হালিশহর সরকার বাজার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বাজারটি ফণীভূষণ সরকার-এর জমিতেই গড়ে ওঠে এই বাজার। এটি জমজমাট বাজার। এখানে স্থানীয় বসবাসকারীরা বাজার আসেন। বর্তমানে বাজারটির পরিচালনার দায়িত্বে সরকার বাজার ব্যবসায়ী

সমিতি।

■ **চৌমাথা বাজার (খেজুরতলা বাজার) ঃ** হালিশহর স্টেশনকে কেন্দ্র কেন্দ্রে করে গড়ে উঠেছে হালিশহর চৌমাথা বাজার। এই বাজারের পূর্বে নাম ছিল খেজুরতলা বাজার।

■ **নতুন বাজার ঃ** পুরোনো বারুই পাড়ায় নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে ১০টির মতো দোকান নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বাজার।

■ **মল্লিকবাগ বাজার ঃ** স্বাধীনতার পরেই রাণীরাসমণি ঘাট রোডের পাশেই গড়ে ওঠে এই বাজার। নদীয়াজেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাজারে বিক্রি করতে আসেন এখানকার প্রায় সব ব্যবসায়ী। হালিশহর কাঁচরাপাড়ার অধিবাসীরা বাজারে আসেন প্রয়োজন মেটাতে। বর্তমানে মল্লিকবাগ বাজার সমিতি পরিচালনা করছেন। এই মল্লিকবাগ বাজারের পোশাকী নাম হয়েছে বাগমোড় বাজার।

■ **কালিকাতলা বকুলতলা বাজার ঃ** দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই গড়ে উঠেছে এই বাজার। এই বাজার প্রায় ৫০ বছরে পুরোনো। স্থানীয় মানুষরা এই বাজারে আসেন প্রয়োজন মেটাতে। (তথ্য সংগ্রহ : সন্দীপ লাহিড়ী)

দুশো বছরের উপর তিন দেবদেবী

হালিশহর পুরনো বাড়ুইপাড়ার ঠাকুরতলায় ব্রহ্মা, শীতলা ও রক্ষাকালী পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২১২ বছর ধরে। এই পুজোর বিশেষত্ব হল, একই দিনে তিন দেবদেবীর পুজো হয়ে থাকে। আবার একই দিনে নির্মিত, পুজো এবং বিসর্জন—এ পুজোর বৈশিষ্ট্য। পাড়ার প্রতি বাড়ি থেকে একজন করে মহিলাকে উপবাসে থাকতে হয়। মূর্তি নির্মাণকারী, বহনকারী, পুরোহিত এবং বলিসংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে পুজোর আগের দিন থেকে সংযমে থাকতে হয়।

হালিশহরের অসুখ-বিসুখ

Dr. S. P. Ganguly, D.M.S. (Cal), M.B.S.(Hom), Ex : Prof. D.N.De. Homoeopathy Medical College & Hospital, Ex : Director of Homoeopathy–Govt. Of W. B., Ex : Vice President–Council of Homoeopathy Govt. of W.B.

হালিশহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের মধ্যে কাশি, শ্বাসকষ্ট, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও শুষ্ক কাশি বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গাউট ও আর্থাইটিস রোগীও বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Sd/ *S. P. Ganguly*

সহায়ক পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হালিশহর

এটি একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। হালিশহর বাগমোড়ে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। প্রথম দিকে এখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। বর্তমানে নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে প্রায় ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১০ মাস এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ। একজন সম্পূর্ণ পুলিশ হতে গেলে যে সব প্রশিক্ষণ দরকার সবই এখানে দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে এ সি জয়দেব মিশ্র ও সি ভি আই জয়দেব কর্মকার।

কলকারখানা

■ **দি হুগলী মিলস্ প্রজেক্ট লিমিটেড :** হাজিনগরে অবস্থিত হুকুমচাঁদ জুট মিলটির বর্তমান নাম দি হুগলী মিলস্ প্রজেক্ট লিঃ। এটি হালিশহর পুরসভার অন্তর্গত। ১৯১৯ সালে মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয় বর্তমানে মিলের কর্মী সংখ্যা ১২ হাজার। পাট থেকে চটের থলে তৈরি হয়। বর্তমানে মিলটি বাজেরিয়া গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত।

■ **নৈহাটি জুট মিল :** নৈহাটি জুট মিল নাম হলেও এটি হালিশহর পুরসভার মধ্যে ১৯০৫ সালে মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **ইন্ডিয়ান পেপার পাল্প লিমিটেড :** মিলটি (আই পি পি) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৮ সালে। আগে বাঁশ, কাঠ, পুরানো কাপড় দিয়ে মণ্ড তৈরি করা হত। বর্তমানে শুধুমাত্র কাটিং পেপার দিয়ে মণ্ড তৈরি করে সেই মণ্ড থেকে কাগজ তৈরি করা হয়। এখানে প্রায় ৯০০ শ্রমিক আছে। মিলটি রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

■ **বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড (VSNL) :** পূর্ব ভারত সরকারের বেতার দূরভাষ্য কেন্দ্রটি (Wireless Centre) হল বর্তমানের বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড। প্রায় ২৫০ বিঘা জমির ওপর গড়ে ওঠে এই সরকারি সংস্থাটি হালিশহর তেঁতুল তলায়। বিদেশ সঞ্চার নিগমের অন্য নাম Global Mobile Satellite Communications Services. আঞ্চলিক কার্যালয় সল্টলেকে অবস্থিত। সংস্থার সদর দপ্তরটি বোম্বাইতে অবস্থিত। এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। মাইক্রো ওয়েভ এবং আপটিক্যাল ফাইবার কেবলের সাহায্যে হালিশহরের সঙ্গে আঞ্চলিক কার্যালয়কে যুক্ত করা হয়েছে। এখান থেকে খবর সল্টলেকে পাঠান হয় সেখান থেকে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

(তথ্যসূত্র : রঘুনন্দন দে)

হালিশহরের কাছে সতী

সমাচার দর্পণ—৫মে ১৮২৭। ‘‘হলিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক

ব্রাহ্মণের কন্যা ২২ বৎসর বয়স্কা নিজ পতির ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালে দূরবস্থা অবলোকন করিয়া চিত্ত আর্দ্র হইল ....।"

সম্পাদনায়

গৌরীপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা—১৪৪ বর্ষ হালিশহর উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা ১৯৯৮; ২০০তম জন্মজয়ন্তী রানী রাসমণি ১৪০০; ২৭৫তম জন্মজয়ন্তী সাধক রামপ্রসাদ ১৪০২; ১০০তম জন্মজয়ন্তী বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (১৯৮৭); ১০০তম জন্মজয়ন্তী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০৫; ১০০তম জন্মজয়ন্তী বনফুল ১৪০৬; শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৪০১। (তথ্যসূত্র : রঘুনন্দন দে)

অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথা থেকে

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্বামী অখণ্ডানন্দের (শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হালিশহরে এসেছিলেন। তিনি তাঁরস্মৃতি কথায় লিখেছেন—স্বর্গীয় গোলক শিরোমণি মহাশয়ের পুত্রগণের পুনঃপুনঃ আহ্বানে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ একবার হালিশহর পর্যন্ত আমাকে বেড়াইয়া আসিতে বলিলেন। হালিশহরে স্বর্গীয় শিরোমণি মহাশয়ের বাড়িতে গিয়া কয়েকদিন ছিলাম। মহামায়ার দুলাল—সিদ্ধ রামপ্রসাদের সাধনপীঠ দর্শনেরও প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র-কন্যাগণ আমাকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। তাহাদের আদর-যত্নের সীমা ছিল না।

পরে রামপ্রসাদের সাধন পীঠে গিয়া দেখিলাম, যে গাব গাছ হইতে তিনি ভাবের ঘোরে পদ্মফুল আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়াছিলেন, তাহা তখনও তাঁহার জীর্ণ চালার পাশেই রহিয়াছে। তখনও প্রতিবৎসর সেখানে কালিপূজা হইত। ত্রিবেণীতে মকরসংক্রান্তি স্নান করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলাম।

■ **শীতলা মন্দির :** ঘোষাল গলিতে যেখানে মনসাতলা ছিল সেখানেই গড়ে উঠেছে শীতলাদেবীর মন্দির। এই মনসাতলায় ছিল একটি মনসা গাছ। এই গাছটি কেটে ফেলেন মন্দিরের রসময় নামে এক পূজারী। তারপর তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে স্বপ্নদিষ্ট হয়ে সেখানে পূজার প্রচলন করেন।

■ **পবনতলা :** বারুইপাড়ায় পবনতলা অবস্থিত। বারোজীবী সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা হল পবন। তাদের জীবিকায় যাতে কোন অনিষ্ট না হয়, সে কারণেই তারা পবন দেবতার পূজা করে থাকে।

■ **রুদ্রভৈরবীতলা :** হালিশহরে রুদ্রভৈরবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময়। বাজারপাড়ায় এই রুদ্রভৈরবীকে প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এই স্থানকে

এখানকার মানুষ রুদ্রভৈরবীতলা বলে।

■ **গণেশমূর্তি ঃ** ডাঙাপাড়ায় শা পুকুর খনন করার সময় সেখান থেকে একটি গণেশমূর্তি পাওয়া যায়—প্রায় ২ফুট দীর্ঘ, পদ্মাসনে উপবিষ্ট। মূর্তিটি সম্ভবত দ্বাদশ/ত্রয়োদশ শতাব্দীর।

■ **পূষণ আশ্রম ঃ** এই আশ্রমটি স্থাপিত হয় ৮ পৌষ ১৪০০, হালিশহরের বাঁধা ঘাটে। এখানে নারায়ণ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা আছে। মুক্তেশ্বর মহারাজার ভক্তরা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রতিবছর ২৬ ডিসেম্বর নাগাদ বার্ষিক উৎসবে মহারাজ আসেন। এখানে নিত্য পূজা হয়। আর ভাগবত-গীতা, রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ হয়ে থাকে।

■ **পার্ক ঃ** হালিশহরে একটি পার্ক রয়েছে। নাম ক্রেগপার্ক। বর্তমানে এর নতুন নাম হয়েছে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী পার্ক।

■ **হালিশহরের হাঁড়ি ঃ** হালিশহরের হাঁড়ি হালিশহরের বাইরেও বিখ্যাত ছিল। বিভিন্ন হাটে নৌকা করে বিক্রির জন্য পাঠানো হত। এইসব হাঁড়ির মধ্যে তেজালো হাঁড়ি, লক্ষ্মী হাঁড়ি, তেলো হাঁড়ি উল্লেখযোগ্য।

■ **হালিশহরের 'ধুমো' কার্তিক ঃ** হালিশহরের সুপ্রাচীন 'ধুমো' কার্তিক পুজো ঘোষপাড়া রোডের 'ডানলপ ঘাট' বাসস্টপের পাশেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাড়ে আঠার ফুট উচ্চ এই মূর্তি। পাঁচটা শাল, ৬টা ধুতি পরানো হয় কার্তিককে। এর ভাসানপর্ব বর্ণময়। গঙ্গাতেই (বিচুলিঘাটে) প্রতিমা ভাসান হয়। (তথ্যসূত্র : প্রলয় ভট্টাচার্য)

■ **হালিশহরের অসুখ-বিসুখ (এ্যালোপাথ) ঃ** এখানে পেটের অসুখ, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রাদুর্ভাব রয়েছে। বিভিন্নপ্রকাশ চর্মরোগ এখানে দেখতে পাওয়া যায়। (ড. কে সি নন্দী, ঘোষপাড়ারোড, হালিশহর।)

■ **হালিশহরে মাস্টারদা সূর্য সেন ঃ** "বিপিনদাই আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে বললেন। মজা হল আমরা বিপিনদার কথায় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলাম। কিন্তু প্রয়াত ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের কথায় বিপিনদা কংগ্রেসে ভিড়ে গেলেন। বিধানসভায় একবার বিপিনদাকে দুকথা শুনিয়েছিলাম। বিপিনদার হালিশহরের বাড়িতে মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ...."

আজকালের প্রতিবেদকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে (১২-১১-১৯৮৯)
মাননীয় শ্রী প্রভাস রায় একথা জানান।

■ **হালিশহরের প্রকাশনা ঃ** "সেকালের কলকাতাই যে পড়াশোনার প্রাণকেন্দ্র ছিল তা নয়, .. মফঃস্বল শহরগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, **হালিশহর**, উত্তরপাড়া ও কাঁটালপাড়া...।"

(আজকাল ২৬-৪-১৯৯৮)

১৯১৩ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত হালিশহর হাইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৪৩।

রামপ্রসাদের শেষ গান

রামপ্রসাদ মায়ের মূর্তি মাথায় নিয়ে নাভী পর্যন্ত গঙ্গার জলে নেমে গেলেন। তারপর একটার পর একটা গান গাইতে গাইতে আরো জলের গভীরে গেলেন। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে তাঁর প্রাণ মিশে গেল অনাদি আত্মায়। তাঁর শেষ গানটি হল—

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
মা, এখন যেমন রাখলে সুখে,
তেন্নি সুখ কি পাছে।।
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমার
সাধি,
মা গো, ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি,
ডা'ন চক্ষু নাচে।।
আর যদি থাকিত ঠাঁই,
তোমারে সাধিতাম নাই,
মা গো, মা, দিয়ে আশা, কাটলে
পাশা,
তুলে দিয়ে গাছে।।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণায় জোর বড়,
মা গো ও মা, আমার দফা হ'ল রফা,
দক্ষিণা হইয়েছে।।

রামপ্রসাদের স্নানের ঘাট। ছবি : রঘুনন্দন দে

রামপ্রসাদের দাবার ছক ও ছড়ি
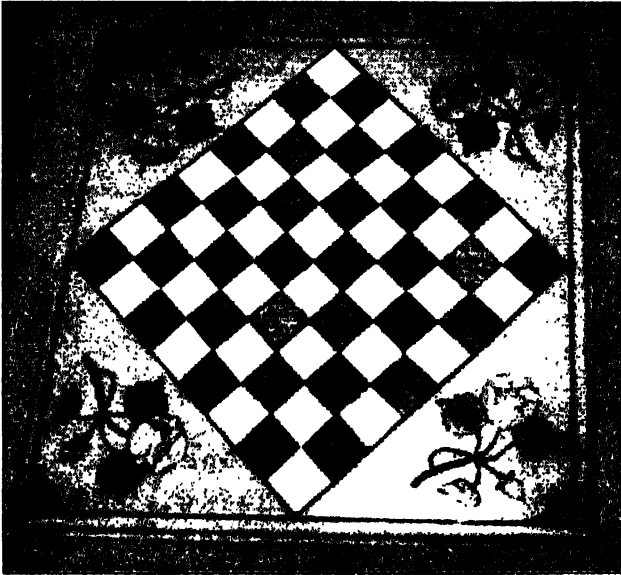
আত্মভোলা, ভবভোলা রামপ্রসাদ সেন সংসারী হলেও সংসারের তিনি খবর রাখতেন না। সংসার সংসারের নিয়মে চলবে। সাধক চলবেন মায়ের নিয়মে। সারাটা দিন হয় মায়ের মন্দিরে, না হয় পঞ্চমুণ্ডির আসনে। গানের উৎসধারা তাঁর কণ্ঠে। অগণিত ভক্ত, মিশুকে মজলিসী মানুষ ছিলেন। হয় গঙ্গার ধারে না হয় কোনও ভক্তের দালানে। স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন হালিশহরে এসেছেন। রামপ্রসাদের সহধর্মিণী তাঁকে বললেন, কী করে এই মানুষটিকে কিছুক্ষণ ঘরে আটকে রাখা যায়। মহারাজ বললে, নেশা ধরাতে হবে। কথায় আছে তাস, পাশা, দাবা এই তিন সর্বনাশা। আমি মহীশূর যাচ্ছি, সেখান থেকে এমন একটা জিনিস আমি এনে দেব যে জিনিস ছেড়ে ওঠা যাবে না।

মহারাজ মহীশূর থেকে নিয়ে এলেন একটি রাজকীয় শ্বেত পাথরের দাবার ছক। ঘুঁটিগুলোও শ্বেত পাথরের তৈরি, বিভিন্ন দেবদেবী ও নানা অসুরের মূর্তি। সে এক

অনবদ্য জিনিস।

রামপ্রসাদ সেই ছক দেখে শিশুর আনন্দে কয়েকদিন মাতোয়ার রইলেন। সবাই ভাবলেন, নেশা ধরেছে। সে নেশার পরিণতি কি হবে তাঁরা জানতেন না। একদিন সকলে দেখলেন, ছক আর ঘুঁটি সবই দিয়ে দিয়েছেন মা কালীকে, নে মা, নে মা, রাজার দেওয়া ছকে তোর চাল দে। যে চালে কেউ রাজা, কেউ ফকির। যে চালে কেউ সাধু, কেউ তস্কর, আয় মা দুজনে মিলে দাবা খেলি। পরের দিন দেখা গেল ছক আছে ঘুঁটি নেই। শ্বেতপাথরের চৌকো ছকটি হয়েছে পুষ্পপাত্র। তার ওপর রাশি রাশি জবাফুল। এক একটি ফুল তুলছেন আর মায়ের পায়ের পায়ে দিয়ে বলছেন, এই নে মা তোর ছেলের চাল, শেষ চালে কিস্তিমাত।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আবার মহীশুর যাবেন। রামপ্রসাদকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর আপনার জন্য কী আনব? সাধক বলেছিলেন, কী আর আনবেন মহারাজ, বৃদ্ধ বয়সে মানুষের তো আর একটা পায়ের দরকার হয়, আপনি একটা বাঁশের লাঠি আনবেন। মহারাজ নিয়ে এলেন বাঁশেরই মতো দেখতে কিন্তু বাঁশ নয় সুদৃশ্য একটি হাতির দাঁতের লাঠি।

রামপ্রসাদ লাঠি পেয়ে ভীষণ খুশি হয়ে বলেছিলেন, বা চমৎকার, বেশ আওয়াজ শুনে সাপখোপ পালাবে। বলেই বললেন, মহারাজ বাইরের সাপ তো পালাবে, ভিতরের ছটা সাপের কী হবে?

সেই ছক, সেই লাঠি শতাব্দীর পথ ধরে আজ চলে এসেছে কলকাতার এক আয়ুর্বেদাচার্যের মহান সংগ্রহে। কবিরাজ নির্মলচন্দ্র রায় সেই ছক ও ছড়ির অর্ধাংশ দেখাতে দেখাতে এই কাহিনী বললেন। ছড়ির অপর অংশের যিনি অধিকারী তিনিও থাকেন উত্তর কলকাতায়।

নির্মল চন্দ্র রায় কেন এই ছড়ি ও ছক পেলেন? রামপ্রসাদের বড় মেয়ে পরমেশ্বরী দেবী ছিলেন কবিরাজ মশাই-এর বৃদ্ধা প্রপিতামহী। সেই সূত্রেই তিনি বংশপরম্পরায় এই ছক ও ছড়ির অধিকারী।

সৌজন্যে : অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২১ অক্টোবর ২০০০

সাধক রামপ্রসাদ সেনের বংশ পঞ্জিকা
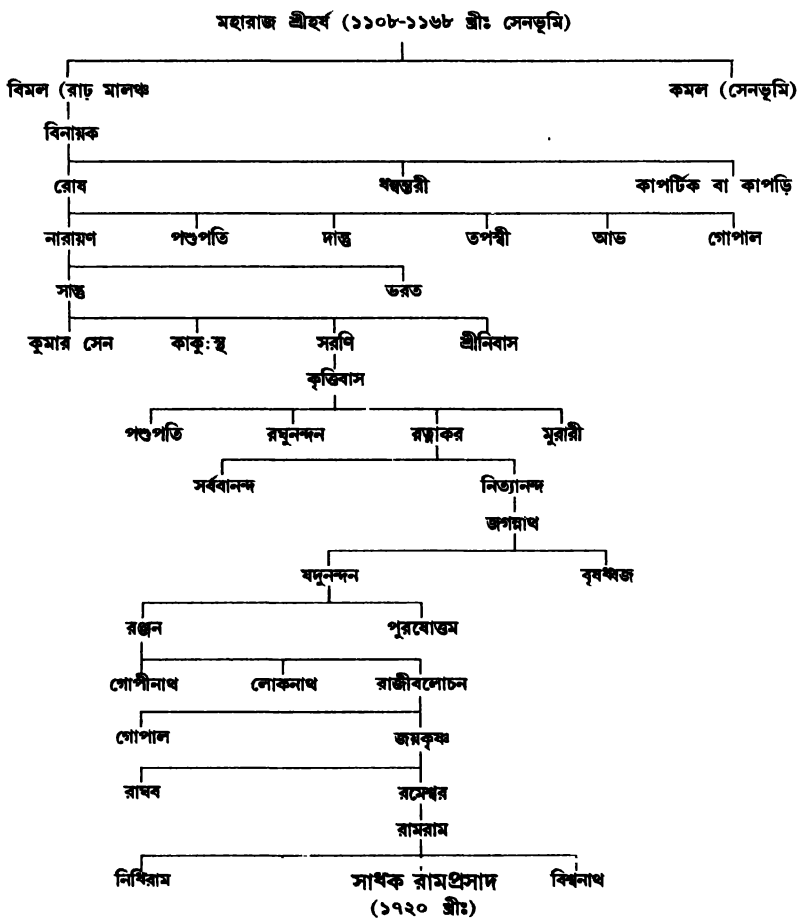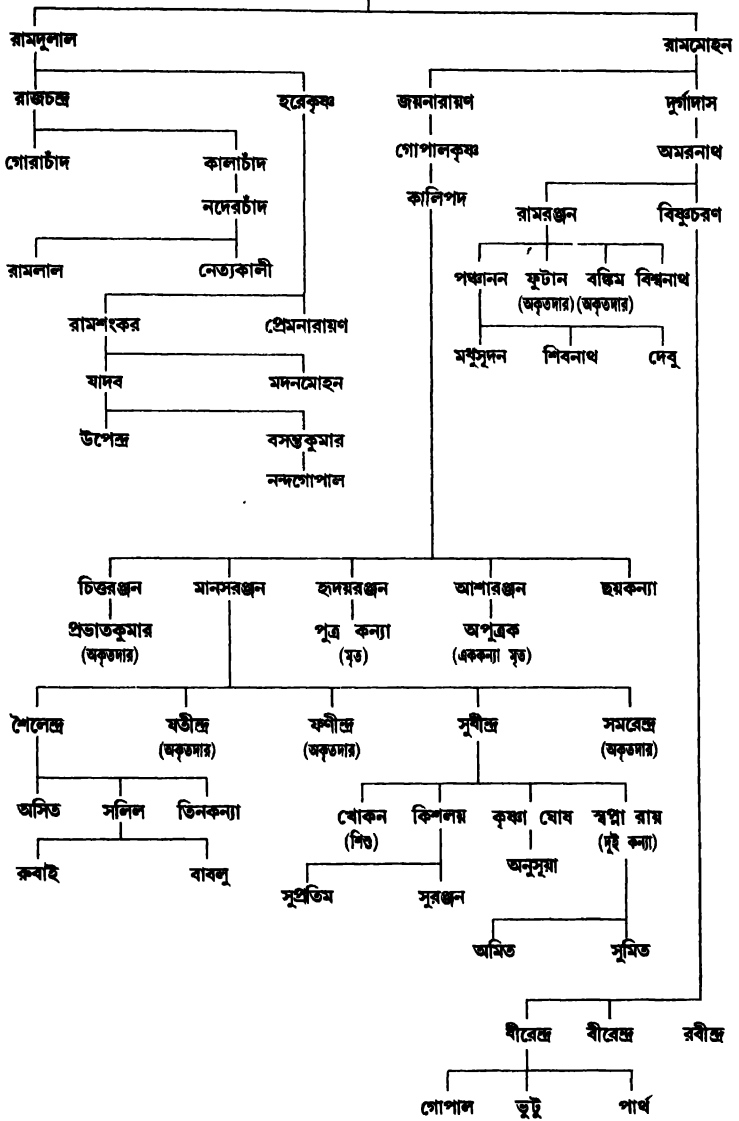
সৌজন্য : রামপ্রসাদ স্মারক, সম্পাদনা—সমীরণ দাশগুপ্ত ও রতনকুমার ঘোষ

হালিশহর পুরসভা

নৈহাটি পুরসভা থেকে পৃথক হয়ে ১৯০৩ সালের ১ জুলাই হালিশহর পুরসভা স্থাপিত হয়। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জোনস্ সাহেব। আর ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত। বর্তমানে এই পুরসভার পুরপ্রধান দীনবন্ধু [illegible]।

■ **১৯৯১ সালে জনগণনা অনুযায়ী**
(হালিশহর পুরসভার ওয়ার্ডভিত্তিক লোকসংখ্যা)

				SC		ST	
	Person	**M**	**F**	**M**	**F**	**M**	**F**
Ward-1	5,728	3,164	2,564	548	433	48	3
Ward-2	6,215	3,143	3,072	401	385	15	16
Ward-3	5,122	2,561	2,561	952	906	7	5
Ward-4	3,692	1,963	1,729	433	341	76	28
Ward-5	5,074	2,564	2,510	462	461	1	–
Ward-6	3,847	2,013	1,834	237	205	–	–
Ward-7	5,350	2,729	2,621	622	569	–	–
Ward-8	5,127	2,630	2,497	136	127	2	1
Ward-9	3,768	1,917	1,851	369	328	–	–
Ward-10	3,332	1,754	1,578	571	547	–	–
Ward-11	6,942	4,098	2,844	917	683	–	–
Ward-12	4,281	2,161	2,120	480	497	–	–
Ward-13	3,350	1,739	1,611	179	174	–	–
Ward-14	8,256	4,192	4,064	702	712	3	3
Ward-15	3,973	2,131	1,842	404	331	–	–
Ward-16	3,499	1,803	1,696	320	302	–	–
Ward-17	8,045	4,789	3,256	903	509	16	20
Ward-18	6,820	4,747	2,073	1,212	643	49	20

Ward-19	3,828	2,284	1,544	491	399	2	–
Ward-20	4,919	3,024	1,895	.429	245	2	–
Ward-21	5,529	3,198	2,331	887	637	–	–
Ward-22	7,331	4,435	2,896	1,503	998	5	–
Total	**1,14,208**	**63,039**	**50,989**	**13,158**	**10,432**	**226**	**96**

Census of India 1991, Series-26, W.B.

১৯১১ সালে হালিশহর পুরসভার লোকসংখ্যা ছিল ১৩,৪২৩ জন, আর ১৯৫১ সালে ছিল ৩৪,৬৬৬ জন।
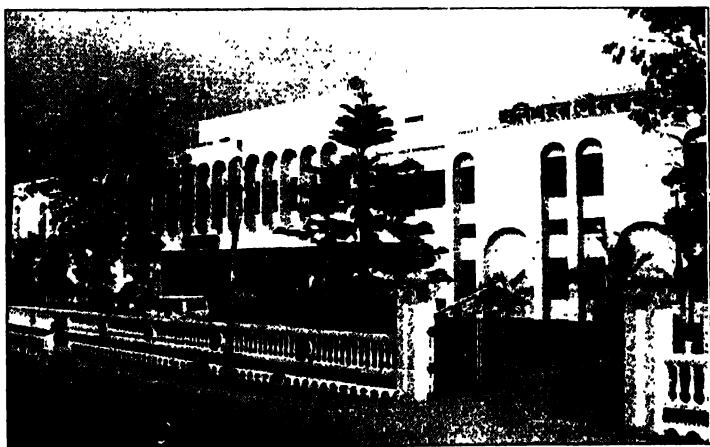
সৌজন্য : হালিশহর পুরসভার প্রতিবেদন সংক্রান্ত পুস্তিকা, ১১ এপ্রিল ২০০০

হালিশহরের পুরাকীর্তি

পরিতোষ দাস

মানুষ তার জীবনসংগ্রামের কঠিন বাস্তবতার পাশাপশি সৌন্দর্য চেতনার চর্চাকে গ্রহণ করেছে অসীম আগ্রহে। ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদরো সভ্যতার সময় থেকেই শিল্প সৃষ্টির এক বিশেষ লক্ষণ আমাদের সামনে এসেছে। সেই সময় শিল্পীরা তাদের শিল্পবোধকে রূপ দিয়েছে সহজলভ্য মাটির সাহায্যেই। পোড়ামাটির লোকশিল্পের সেই বিশেষ ধারাটি বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক রূপ পেয়েছে। হালিশহরও এর ব্যতিক্রম নয়।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হালিশহর বারেন্দ্রগলির শিবমন্দিরের কথাই ধরা যাক। টেরাকোটা নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরনো রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। ছাঁচ ব্যবহার প্রায় না করেই আধশুকনো টালির উপর নকশা খোদাই করেছেন শিল্পীরা। বারেন্দ্রগলির টেরাকোটা সজ্জায় দেখি নগর ভ্রমণে রাজা, শিকারির সঙ্গে বাঘের যুদ্ধ, বিদেশি বণিকের নৌকা ভ্রমণ প্রভৃতি। কেননা মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে গেছে। যদিও পুরাতত্ত্ব বিভাগ সম্প্রতি এটিকে সংরক্ষিত এলাকা বলে নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু সংরক্ষণের উদ্যোগ নেই। বারেন্দ্রগলির শিবমন্দিরের কয়েকটি টেরাকোটার কাজ।

রাজযাত্রা

বৃষবাহন

দ্বারপাল

লেখক পরিচিতি : আলোকচিত্রী। ছবি : পরিতোষ দাস

তৃতীয় অধ্যায়

ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কথা

সেকালের ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

কানাইপদ রায়

ইছাপুর[১] ছিল 'হাবেলী শহর পরগনা'র বারাসাত মহকুমার একটা অন্যতম গ্রাম। হান্টার 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থে বলেছেন—"Ichapur, the principal village in Havilishahr Fiscal Division, in Barasat Subdivision, is situated on the river side a short distance above Palta, and is the site of a large government powder manufactory." ১৮৫৮ সালে নবাবগঞ্জ ছিল বারাকপুর মহকুমার একটিমাত্র থানা। O'Malley তাঁর Bengal District Gazetteers–24 Parganas গ্রন্থে লিখেছেন, "১৮৬৯ খ্রীঃ উত্তর বারাকপুর পুরসভা ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত হলে নবাবগঞ্জে ছিল ৩টি ওয়ার্ড। আর ইছাপুরে ছিল ২টি ওয়ার্ড। নবাবগঞ্জের পুরসভার অফিস বাড়িটি সেখানকার জমিদার মণ্ডল পরিবারদের—The Municipal Office is at Nawabganj, the residence of the Mondal family of Zaminders." পুরসভার পাশদিয়ে দুটি প্রধান রাস্তা চলে গেছে। রাস্তাদুটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল জেলা বোর্ড। একটি গ্রান্ডট্র্যাঙ্ক রোড—কলকাতা থেকে এসে পলতার কাছে হুগলী নদী অতিক্রম করে চলে গেছে। অন্যটি গেছে বারাকপুর জি টি রোড থেকে বেড়িয়ে কাঁচরাপাড়ার দিকে। সেসময়ে নবাবগঞ্জে ঝুলনমেলা চলত ছয়দিন ধরে। আর গোষ্টাষ্টমি মেলা বসত একদিন। বাজার ছিল দুটি। একটি পুরসভার অন্যটি প্রাইভেট।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নবাবগঞ্জে ৩,৫৩৫টি বাড়ি ছিল। লোকসংখ্যা ছিল

১। 'ইছাপুর' নামের উৎপত্তি বিষয়ে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে কিছু যোগসূত্র পাওয়া যায়। 'ইছ' কথাটি বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া বৈষ্ণবশাস্ত্রে কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির অন্যতমা 'ইচ্ছাশক্তি'। ইছাপুরে বৈষ্ণবদের উপস্থিতি লক্ষ্য করে ইছাপুর নাম প্রসঙ্গে এরকম অনুমান হয়ত করা যায়। এবিষয়ে কেউ আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

২১,২১০ জন। ১৮৭২ খ্রীঃ মোট জনসংখ্যা ছিল ১৬,৫২৫ জন। এর মধ্যে হিন্দু পুঃ ৬,৬৩১, নারী ৬৭৫৭; মুসলমান পুঃ ১৬৪৬ নারী ১৪৬৭; খ্রীষ্টান পুঃ ১৪, নারী ৫; অন্যান্য পুঃ ৫।

■ প্রাচীন কাব্যে ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

চাঁদ সদাগরের সিংহলে বাণিজ্য যাত্রাকে উপলক্ষ করে বিপ্রদাস ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মনসাবিজয়' রচনা করেন। এই গ্রন্থে ইছাপুর এবং নবাবগঞ্জ এই প্রাচীন জনপদ দু'টির পরিচয় পাওয়া যায়।

"চাঁপদানি ডাইনে বামেতে **ইছাপুর**
বাহ্ বাহ্ বলি রাজা ডাকিছে প্রচুর।
বামে **বাঁকিবাজার**[১] বহিয়া যায় রঙ্গে
জমিন বহিয়া রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে।

১. বাঁকিবাজার বর্তমান নবাবগঞ্জ

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীমন্ত সাধুর সিংহল দ্বীপে বাণিজ্য যাত্রা উপলক্ষে লিখেছেন—

'ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতী সেই ঘাটে মেলা।
ইছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা।।'

গঙ্গার উৎস থেকে সাগরে মিশে যাওয়া পর্যন্ত পথের বিবরণ দিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর কাব্যে লেখেন—

সুরধুনী কাব্য—দীনবন্ধু মিত্র (১৮৭১)
মুলাযোড়, **ইছাপুর**, সশস্ত্র চাণক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়রঞ্জক।

■ নবাবগঞ্জের পূর্বনাম এবং কিভাবে তা হারিয়ে গেল

নবাবগঞ্জের পূর্বনাম যে 'বাঁকিবাজার' বিপ্রদাসের মনসাবিজয় কাব্যেই তা প্রথম পাওয়া যায় ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পূর্বে কোথাও বাঁকিবাজার নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁকিবাজার নাম সরে গিয়ে কিভাবে হলো নবাবগঞ্জ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নেদারল্যান্ডের ওস্টেন্ড কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিযোগী হয়ে ওঠে। ১৭২১/২২ খ্রীঃ নাগাদ ফ্লেমিশদের একটি জাহাজ চন্দননগরে পৌছায়। সেখানকার ফরাসীদের সাহায্যে জাহাজভর্তি মাল নিয়ে ফ্লেমিশ জাহাজ ইউরোপ ফেরার আগে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর

কাছে জাহাজের ক্যাপ্টেন ওস্টেন্ড কোম্পানিকে বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য করার অনুমতি চেয়ে আর্জি জানায়। ইংরেজদের প্রতিপক্ষ করার উদ্দেশ্যে নবাব সে আর্জি মঞ্জুর করে। গারুলিয়া এবং হুগলীর পূর্বতীরে পলতার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বাঁকিবাজার গ্রাম— একথা সেসময়ের বিবরণ থেকেই জানা যায়।

ফ্লেমিশ এবং ওলন্দাজেরা নেদারল্যান্ডের অধিবাসী হলেও তাঁদের মধ্যে বিরোধ ছিল। একে অপরকে সহ্য করতে পারতো না। বরানগরের ওলন্দাজেরা প্রথম থেকেই ওস্টেন্ড কোম্পানিকে ঈর্ষার চোখে দেখত। তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে এক হয়ে হুগলীর ফৌজদারকে ঘুষ দিয়ে নবাবের কাছে ওস্টেন্ড কোম্পানির বিপদ সম্পর্কে অভিযোগ জানালে নবাব একথায় তা বিশ্বাস করে কোম্পানি বন্ধ করার হুকুম জারি করল। কিন্তু কোম্পানির হুকুম অমান্য করায় ফৌজদার বাহিনী অবরোধ করে। তখন কোম্পানি তাঁর লোকজন নিয়ে মধ্যরাত্রে পালিয়ে ইউরোপের দিকে জাহাজে করে পাড়ি জমায়। কিছুদিনের মধ্যেই কোম্পানির এক প্রতিনিধি গোপনে প্রাইভেট মার্চেন্টদের সঙ্গে বাণিজ্য উপলক্ষে আবার আসে। কলকাতার ইংরেজি কোম্পানি এই বেআইনী কাজের জন্য ফ্লেমিশ জাহাজ দখল করে। একটা জাহাজকে বাঁকি বাজার ফ্যাক্টরিতে রেখে ছোট জাহাজটিকে কলকাতায় নিয়ে যায়। ১৭৪৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ফ্লেমিশরা বাঁকিবাজারে তাঁদের কোম্পানির কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। ওস্টেন্ড কোম্পানি উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঁকীবাজার নামটিও মুছে যায় আর আমরা পাই বর্তমান নবাবগঞ্জ। বাঁকিবাজারে ওস্টেন্ড কোম্পানীকে নিয়ে কিছু বিভ্রান্তির উল্লেখ রয়েছে—"There is considerable confusion about the Ostend Company in works that refer to the settlement at Bankibazar. The *Riyazy-s-Salatin* ascribes its estanlishment and defence to the Danes. Stewart, while stating that it was owned by the Ostend Company, calls it the German factory, and its defenders Germans. Mr. S. C. Hill in *Bengal in 1756-57*, though he refers in the body of his work to the Ostend company, enters it in the index as "the Emden Company or Prussian settlement", and speaks of the defence of Bankibazar by the Emders. There is similar confusion about the date of the capture of Bankibazar by the Mughals. Stewart gives the date as 1733, and Orme as 1744, while Alexander Hamilton, in *The New Account of the East Indies*, gives it as 1723. The last date must be accepted for Hamilton's book was published in 1727, and the whole affair

is attributed by the *Riyazu-s-Salatin* to the time of Murshid Kuli Khan, who died in 1725."

■ ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি : পুরানো দিনের কথা

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে প্রথম রাইফেল তৈরি হয় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। পুরানো বারুদ কারখানার জায়গার উপর এই ফ্যাক্টরি গড়ে ওঠে। এখানে বারুদ তৈরির কারখানা গড়ে তুলেছিলেন এ্যাসিস্টেন্ট সার্জেন ফারকুহার। এই জায়গাটির প্রকৃত মালিক ছিল ওলন্দাজেরা। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাইফেল ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ শুরু হলেও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এই ফ্যাক্টরিতে ২০৫০ জন লোক কাজ করত।

ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরির আজ যেরকম সুনাম ঠিক সেরকম সুনামের সঙ্গে প্রথম থেকেই রাইফেল উৎপাদন করত। ১৯০৮ খ্রীঃ ২৭ সেপ্টেম্বর স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় এখানকার রাইফেল নির্মাণের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়, ব্যবহারের আগে এই রাইফেলের ১৩২টা অংশের নির্মাণের জন্য কতরকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হত।

"...But after all the assembling has been completed, and the gauging and testing carried out, there remains the supreme trial on the range, and here the rifle is subjected to a test, from which it emerges a perfect service weapon, or is sent back to the factory for rectification. The men on the range are picked shots, winners at the principal rifle meeting in India, and the distances at which rifles are tested extend from 100 feet to 600 yards. An ingenious machine is provided at each distance, and on this the rifle is placed : telescopic sights are used, so that the error that might be present, even when a crack shot is firing, is eliminated. The ranges are all under cover; therefore no allowance is necessary for force or direction of the wind, or climatic conditions. In short, the rifle is placed in position under perfect conditions that can never be secured in the open ordinary occasions. The target if shown to a volunteer or regular shot would be his despair, for it is only two or three inches square, and all the shots fired must strike inside the marked space, or the weapon is

put aside as defective. If adjustments are posible, well and good : they are made, and the test begins once more from the beginning; if not, the rifle is finally rejected. But it may be taken for granted that once a rifle has passed this supreme test and is issued for service, it is a perfect article : not less so than if it were made in an old established English or Continental factory. Indeed, it is claimed at Ichapur that the guage or test standard there is far higher than that to be found in some European factories. In many of its part the limits of difference between the absolutely accurate and the actual are nil; in others a thousand part of an inch.

"Much also has been accomplished outside the factory proper. The park was extremely unhealthy in the first year or two through foundation digging and the absence of proper drainage. the latter, together with an excellent filtered water supply, was provided in 1905; the many small tanks have mostly been drained, and kerosine oil is used regualarly on the others. septic tank latrines are used in the factories, and lines for workmen have been provided between the Factories Park and the railway lines. This used to be the unhealthiest part of Ichapur : cholera was practically endemic; but since the land has been cleared and drained, and filtered water-suply introduced, cholera has disappeared."

■ শ্রীধর বংশীধর স্কুল এবং লর্ড রিপন

১৮৮২ খ্রীঃ বাংলার শিক্ষাবিভাগে ডিরেক্টর মিঃ এ ডব্লিউ ক্রফট স্কুল গৃহটির উদ্বোধন করেন। স্থানীয় মানুষদের অনুরোধে স্কুলটির নাম রাখা হয় "শ্রীধর বংশীধর স্কুল"। ১৮৮৩ খ্রীঃ ১০ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড রিপন স্কুলটির পরিদর্শনে আসলে তাঁর সম্মানে "শ্রীধর বংশীধর রিপন লাইব্রেরী" নামে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। রিপন লাইব্রেরীর জন্য তিনহাজার এবং বিশেষ পুরস্কার দেবার জন্য আরো তিনহাজার টাকা দান করেন। এই স্কুল থেকে যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয় তাঁকে দুবছরের জন্য মাসে ৫

টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়। রিপনের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য স্কুলে একটি প্রস্তরফলক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ছাত্রদের পুরস্কার দেবার পর লর্ড রিপন বক্তৃতা দেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় স্কুলটী পরিদর্শন করিতে পারিব। কিন্তু স্কুলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এখানে আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—কাউন্সিলের আইন সচিব, শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত রহিয়াছেন (হাস্যধ্বনি) ইহাতে আমি একেবারে হতভম্ব হইয়াছি। আমি যদি কাল জানিয়ে পারিতাম যে আমাকে এরূপ সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি সারারাত্রি জাগিয়া বক্তৃতা প্রস্তুত করিতাম (হাস্যধ্বনি)। শিক্ষা সম্বন্ধে আমি গত ৩০/৪০ বৎসর বাবৎ বক্তৃতা করিয়া আসিতেছি। শ্রোতৃগণ আমার মুখে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কাজেই আমি যদি আপনাদের আশানুরূপ বক্তৃতা করিতে না পারি, আশাকরি আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। বাবু শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মমডল এস্থানের শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করিয়া এই স্কুলটীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

লর্ড রিপনের ইংরাজি ভাষণের কিছু অংশ "..... Ladies and gentlemen,–I feel, and have felt ever since I first came to Barrackpore, a great interest in the other school which exists at Barrackpore. I am very fond of Barrackpore as a residence, and have always felt an interest in the school there which has been supported by many successive Viceroys, I know that it may be said that the establishment of this School here at Nawabgunj mauy interfere with the attendnace of the children at the Barrackpore school. Probably to some extent it has, but I am a friend to competition to education, I believe that it is a great advantage that a school established and supported by the Government should have in its immediate neighbourhood another school established and founded by private liberality to enter into competition with it, and keep it up to the mark (cheers).

১৮৮৪ খ্রীঃ ডিসেম্বরে লর্ড রিপনের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে স্কুল কমিটি থেকে বারাকপুর পার্কে যে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় তার উত্তরে রিপন

বলেন, "Gentlemen and you my young friends – I am very glad indeed to meet you once more in the Park, and I thank you very sincerely for the address which you have presented to me. As you are well aware, I have, ever since I have been in this country, taken a great interest in the subject of education in Barrackpore and its neighbourhood, and I have done what I could to promote that important object each year that I have visited this place. When the new school was established at Nawabganj there was some fear on the part of those specially interested in the Barrackpore School lest its existence might interfere with their prosperity, but nevertheless, believing as I did, that in a large population such as that which exists in this district there was ample room for two schools, and in spite of the strong interest, which I took in the Barrackpore school, I thought it my duty to give all the assistance in my power to the Nawabganj school which has been established and supported by the signal munificence of the two gentlemen, whom I see present, Babu Sridhar Mandal and Babu Bansidhar Mandal.

Sd./- *F. W. Latimer.*
9th December 1884.

"বন্ধুগণ! এই পার্কে আজ আর একবার আপনাদের সাক্ষাৎ পাইয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি; আপনারা আমাকে যে অভিনন্দন দিয়াছেন সেজন্য আপনাদিগকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা জানেন, আমি এদেশে আগমনাবধি বারাকপুরে ও নিকটবর্তী স্থানে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। প্রত্যেক বৎসর যখনই আমি এখানে আসিয়াছি, তখনই আমি এখানকার শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নবাবগঞ্জে যখন নূতন স্কুলটী প্রতিষ্ঠিত হয়; তখন অনেকের মনে ভয় হইয়াছিল যে, ইহার ফলে বারাকপুর স্কুলটীর উন্নতির ব্যাঘাত হইবে, কিন্তু বারাকপুরের ন্যায় বহু জনাকীর্ণ স্থানে দুইটী স্কুলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকায় কোন স্কুলের উন্নতির কোন

ব্যাঘাত হয় নাই। নবাবগঞ্জ স্কুলটীর জন্য সাহায্য করা আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এই স্কুলটী শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল এই দুই মহানুভবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, সুখের বিষয় আজ তাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন। আজ যে দুইটী স্কুলরেই কর্ত্তৃপক্ষ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আপনারা একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছেন; ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

এফ ডব্লিউ লাটিমার
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

■ নবাবগঞ্জে লর্ড মিন্টো

লর্ড মিন্টো ১৯০৬ খ্রীঃ ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বর্গীয় গোপীনাথ জিউঠাকুর ঠাকুরানীর মন্দির দেখতে আসেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হয়।

"লর্ড মিন্টো, লেডী মিন্টো, তাঁহাদের কন্যাগণ ও বড়লাটের পরিষদবর্গ মিলিটারী সেক্রেটারী ও এডিকং সমাব্যািহারে গত রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বাবু শ্রীধর ও বংশীধর মণ্ডলের ঠাকুরবাটী পরিদর্শন করেন। বাবু অদ্বৈতচরণ মণ্ডল তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। বড়লাট বাহাদুর ও অন্যান্য সকলে এই মন্দির দর্শনে পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। কৃষ্ণনগরের মৃন্ময় মূর্ত্তি সকলের উপর বড়লাটের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অভ্যর্থনায় বড়লাট যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্থানীয় লোকেরা বড়লাটের এই পরিদর্শনের স্মৃতি চিরকাল মনে রাখিবে।"

■ নবাবগঞ্জ থেকে কাঁটালিয়া—একটি রাস্তা

"নবাবগঞ্জে মণ্ডল বংশধরদের মধ্যে "ঁ বাঞ্ছারাম মণ্ডলের প্রপৌত্র ছিলেন ঁ পঞ্চানন মণ্ডলের পুত্র এবং ঁ রামগোপাল মণ্ডলের পুত্র স্বনামধন্য ঁরসময় মণ্ডল মহাশয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। চাউল, দাউল, কলাই, লবণ ও পাট ইত্যাদি নানা প্রকার দ্রব্যাদির বঙ্গের নানাস্থানে তাঁহার বিস্তৃত কারবার ছিল। তিনি হলধর, শ্রীধর, গঙ্গাধর এবং বংশীধব এই চারিপুত্র রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। অধ্যবসায়শীল ও পরদুঃখকাতর শ্রীধর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ১৭ ই মার্চ্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। হলধর ও গঙ্গাধর অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন; ফলে পরোপকারী শ্রীধর ও দানশীল বংশীধর কলিকাতায় ও বঙ্গের নানাস্থানে পিতার ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন।" ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বারাসাতের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার ইডেনের অনুরোধে শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল

বিশ হাজার টাকা খরচ করে নবাবগঞ্জ নদীর তীর থেকে কাঁটালিয়া তেলিনীপাড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে যে সৈন্যদল মোতায়ন ছিল সেই সৈন্য দলের অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি নিয়ে যাতায়াত করার জন্য রাস্তাটি নষ্ট হয়ে যায়। ভারতের প্রধান সেনাপতির কাছে ঘটনাটি জানানো হলেও তাঁরা এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি।

■ ইছাপুর খাল

১৮৭০ খ্রীঃ এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় "The Ichapur Khal, runs from the Hooghly at Ichapur into Bartti bil; five miles in length and nevigable throughout the year." ইছাপুর খালের আজকের পরিণতি একসময় ছিল না। সারা বছরই নৌকা চলত। এই খালের জোয়ারের জল তুলে রায়ফেল ফ্যাক্টরির কাজে লাগানোর চেষ্টা চালানো হয়েছিল। হাবেলি পরগণার সীমানার নির্ধারক হলো এই খাল। নদীয়ার কিছু অংশ, তারপর কাঁচরাপাড়া থেকে শুরু করে এই খাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল হাবেলি পরগণা। শোনা যায় শ্রীচৈতন্য এই খাল দিয়েই নৌকা পথে সাঁইবনে গিয়েছিলেন।

■ জি টি রোড

এই রোডটি হুগলী নদী অতিক্রম করে উত্তর ২৪ পরগণার পলতা ঘাট থেকে বারাকপুরেপর ওল্ড ক্যালকাটা রোড ধরে কলকাতায় পৌঁছেছে। হান্টারের লেখায় এই রাস্তাটির উল্লেখ আছে (১৮৭৫)— The Grand Trank Road from Calcutta to Barrackpore and Palta Ghat, where it crosses the river into Hugly District, 14 miles.

■ Ichapur Defence Estate (nm) লোকসংখ্যার বিবর্তন।

খ্রীঃ	1951	1961	1971	9181	1991
সংখ্যা	14,600	12,382	11,975	10,452	10,440

(ইছাপুর-নবাবগঞ্জ-পলতা'র ওয়ার্ডভিত্তিক লোকসংখ্যা)

				SC		ST	
	Person	M	F	M	F	M	F
Ward-1	2,724	1,479	1,245	277	177	58	74
Ward-2	5,785	3,006	2,779	40	33	71	47

Ward-3	7,881	4,025	3,856	1,196	1,153	141	118
Ward-4	4,655	2,569	2,086	259	160	3	3
Ward-5	6,094	3,135	2,959	396	395	189	163
Ward-6	4,486	2,335	2,151	164	130	19	11
Ward-7	5,582	2,902	2,680	190	165	–	–
Ward-8	6,113	3,362	2,751	690	604	16	7
Ward-9	4,061	2,126	1,935	145	131	–	–
Ward-10	6,256	3,313	2,943	403	391	–	–
Ward-11	10,095	5,165	4,930	1,462	1,403	7	7
Ward-12	3,049	1,586	1,463	98	86	–	–
Ward-13	1,999	1,037	962	287	272	4	3
Ward-14	879	462	417	147	138	–	–
Ward-15	3,304	1,758	1,546	715	661	–	15
Ward-16	1,891	967	924	256	277	5	3
Ward-17	3,523	1,813	1,710	100	84	15	3
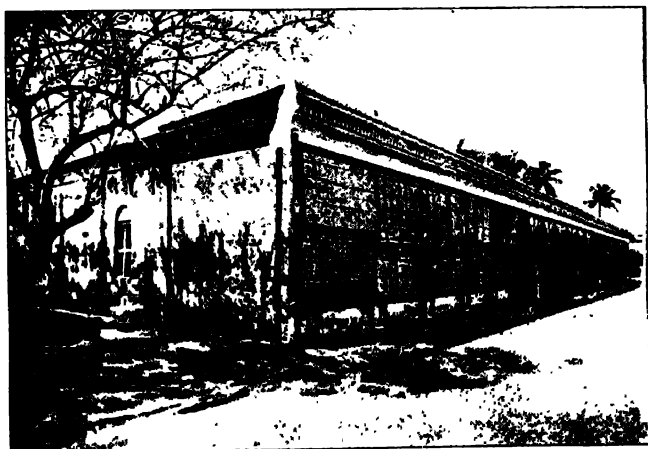
শ্রীশ্রীগোপীনাথজিউ ঠাকুর বাটী (১২৫৭ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত)

ঋণস্বীকার ঃ (১) বংশপরিচয় দশমখণ্ড শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত।
(২) Census of India 1991
(৩) A Statistical Account of Bengal, vol-1-1875, W.W. Hunter
(৪) 'মনসা বিজয়'—সুকুমার সেন সম্পাদিত

তথ্য ও কথকতায় ইছাপুর

প্রলয় ভট্টাচার্য

সে অনেককাল আগের কথা। ইছাপুর বিস্তৃত ছিল হাভেলি সহর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ইছাপুর খালপাড় পর্যন্ত। নানা নামে ইছাপুর পরিচিত—ইশাপুর-ইচ্ছাপুর-ইছাপুর। ইশাপুর নাম দেখে অনেকে বলে ফেলেন ঈশা খাঁ এর সঙ্গে সম্পর্কের কথা। আদৌ তা নয়। বারো ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ এই মুল্লুকের মালিক ছিলেন এটা মানা যায় না। তিনি ছিলেন পুববাংলার ময়মনসিংহের ভুঁইয়া; আকবরের সমসাময়িক। তাঁর সঙ্গে এ অঞ্চলের সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া ইছাপুর নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ১৪৯৫ সাল, 'মনসাবিজয়' কাব্যকাল থেকে। আর ঈশা খাঁ হলেন গিয়ে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। কাজেই ঈশা খাঁ-র সঙ্গে ইছাপুরের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি এল কীভাবে? বিদেশি মানুষ তার সুবিধার জন্য 'ইশাপুর' বলতেন; যেমন গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস্; মেদিনীপুর-মিড্‌নাপুর, বর্ধমান-বার্ডওয়ান তেমনই 'ইশাপুর'। আগে তো 'ইছাপুর' ছিলই, শ্বেতাঙ্গ শাসকের রাজ থেকে উচ্চারণ বদলে অফিসিয়াল কাগজপত্রে 'ইশাপুর' হয়ে যায়। এরজন্য ঈশা খাঁকে টেনে আনা অযৌক্তিক। আমরা 'ইছাপুর'কে 'ইছাপুর'ই বলব।

জয়চণ্ডী জঙ্গলের এলাকাভুক্ত ছিল এখনকার ইছাপুর। উত্তরে প্রাচীন নদী বন্দর নবহট্ট (নৈহাটি) থেকে দক্ষিণে বারাকপুরে কিছু জায়গাজুড়ে ছিল এই জঙ্গলের সীমানা। জয়চণ্ডী জঙ্গলের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল বর্তি বিল। ভাগীরথীর পুব তীর ছিল জনবসতিহীন। এরকম এক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে কাপালিক ও ডাকাতগোষ্ঠীর অবাধ বিচরণ ছিল। শক্তিদেবী 'জয়চণ্ডী' ছিল জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী, দেবীর নামে স্থানের নাম। ডাকাত দলের আরাধ্য দেবী ছিলের এই জয়চণ্ডী। দ্রুতগামী ছিপনৌকোর সাহায্যে ডাকাতরা ভাগীরথীর বুকে পণ্য ও যাত্রীবাহী জলযান লুঠ করে নোয়াই খাল বা মুক্তারপুরের খাল বা ইছাপুরের খাল ধরে অরণ্যাবৃত বর্তির বিলে আত্মগোপন করত। প্রয়োজন হলে আরও দূরে পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল যথেষ্ট।

বাংলা ভাষায় প্রথম 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের রচয়িতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ইছাপুর গ্রামের কোনো এক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত পণ্ডিতের শিক্ষকতা করে গিয়েছেন। সাহিত্যিক সমরেশ বসু ইছাপুর প্রতিরক্ষা কারখানায় ১.২৫ টাকা রোজ মজুরিতে চাকরি করেছেন কিছু সময়। লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামে বসবাস করতেন। বিপ্লবী

যতীনদাসের 'ইছাপুর' গ্রামের সঙ্গে কোনোরকম সংযোগ না থাকলেও, তাঁর পৈতৃক ভিটে এখানে ছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুচিত্রা মিত্রের পিতা সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ভিটেবাড়ি ছিল গঙ্গার পাশাপাশি। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম মাঝেরপাড়া দেবীতলা অঞ্চলে গোপনীয়ভাবে কিছুসময় বসবাস করেছিলেন। মল্লিকভিলায় উচ্চবিত্ত মল্লিক পরিবারের শিশিরকুমার মল্লিক 'নাইটহুড' স্যার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। চাকরিসূত্রে পালাসম্রাট ব্রজেন দে এবং যাত্রাপালার তুর্কি অভিনেতা রাখালরানী (রাখালচন্দ্র দাস) এখানেই তাঁদের শেষজীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯২ সালে ভারতবর্ষে প্রথম 'স্টিল' তৈরি হয় ইছাপুরে। এর আগে ১৮৭২ এ কাশীপুর কারখানার ''ডিপো অব গান শেল ফ্যাক্টরি' হিসেবে ইছাপুর এখনকার 'মেটাল স্টিল' ফ্যাক্টরির জায়গাকেই ব্যবহার করা হত। ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত যে রেললাইন পাতা আর রেলস্টেশন তৈরি হয়, তখনই রেলস্টেশন রূপে ইছাপুর পরিচিতি পায়। বর্তমানের ইছাপুর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত শহর।

■ **আদিবাসী পাড়ার নাচ .... ঠুমকি**

অস্ত্র ঃ বিষ মাখানো তীর, ধনুক।
নেশা ঃ হাড়িয়া, তাড়ি, মহুয়া।
বাদ্যযন্ত্র ঃ মাদল, ঢোল, বড় কর্তাল, নাগেরা।
উৎসব ঃ দোল, দশহরা-মূর্মা, সারহুল, টুসু, সোহরাই।
ভাষা ঃ কুড়ুক, সাদান। প্রথমটা সাধু, দ্বিতীয়টা চলিত।
ঠুম্‌কি ঃ 'সোহরাই'-তে যে সঙ্ঘবদ্ধ নাচ হয়, তারই নাম—'ঠুমকি'।

মন্ত্র

পুরোহিতকে বলা হয়—'পাহান'। ঘটে আমপল্লব, জল দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করেন ঃ 'জয় চালা; জয় সারনা'।

''জয় ছোটনাগপুর বুঢ়াবুঢ়ি
জয় পাসরি ভণ্ডারাত
বানজারি পারতা ইরগাও মহাদানিয়া।।''

গীত-কলি

কেতাই সুন্দর দিসেলা
ফুল রোপাল বাগিচা
চামেলি ফুলক বাগিচা

ওহে বাগিচা মে গ্যয়া ফুল তোড়াবো
ওহে বাগিচা মে গ্যয়া মালা বনাবো।

খো যা খো যাতে আলি
পুছা পুছাতে আলি
প্রভুকে ঘর কতই দুরারে
বারো বাছারে পারবন ঘুরিফিরি আওয়ায়রে
মরল মানুষা নাহি আওয়ায়রে
ও বল ওহি রে।।

লাল পাড় শাড়ি, লাল টিপ, মাথার খোঁপায় বাহারি পাতা আর কুইল গোঁজা (ময়ূরের পালক); হাতে পায়ে আলতার আলপনা, কানে লোলা, গলায় খাঁম্বিয়া, পায়ে মল্, হাতে ধরে আছে 'ঝালার'। সাজসজ্জায় সমবেত দল। ওঁরা গানের তালে তালে নাচছে; কখনও হাতে হাত ধরে সংঘবদ্ধবৃত্তে; কখনও বা কোমরে হাত রেখে ছন্দোময় পদক্ষেপে।

গত একশ বছর ধরে এঁরা উত্তর ২৪ পরগণার ইছাপুরের বাসিন্দা। দলবদ্ধভাবে থাকে পূর্ব মানিকতলার ২১ নম্বর রেলগেটের কাছে আদিবাসীপাড়ায়। এঁদের দেশবাড়ি বিহারের রাঁচি ছোটনাগপুর অঞ্চল। 'সোহরাই'তে ওদের যে নাচ হয় তাকেই বলে 'ঠুমকি'। কালীপুজোর রাতই এঁদের জাগরণ রাত। এটাই সোহরাই।

ফাগুনের দোল, সারহুল, দশহরা-মূর্মা, টুসু এঁদের প্রধান ও প্রিয় উৎসব। 'সারহুল' উৎসবে এঁদের কানুন বেশ কঠোর। সারা চৈত্রমাস কেউ কারও ঘরে খাবে না। নববর্ষে নতুন ফসলের পুজো করে এঁরা 'পরান্ন' গ্রহণ করে। গরু-বাছুর স্নান করিয়ে, গরুকে তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। বাড়ির যিনি বড় বউ তিনি নতুন কাপড় পরে গরুকে ধান দুর্বো দিয়ে বরণ করেন। পরে ভাত, ছোলা, মটর, কালো কলাই একসঙ্গে রান্না করে গরুকে খাওয়ান হয়। সারাবছর গরুকে দিয়ে কাজ করান হয়; সেইসব শ্রমের দিনগুলিকে সম্মান জানিয়ে এই একটি দিন গরুকে আদরযত্ন করা হয়। দুর্গাপুজোর শুরু থেকে দশমীর পরের দিন পর্যন্ত দশহরা মূর্মা উৎসব পালন হয়। সবার নতুন কাপড়-জামা পরতে হয়। এঁদের কোনো মূর্তি প্রথা নেই। 'সারনা' গাছ পুজো হয়। পুরোহিতকে বলা হয় 'পাহান'।

বাঙালি এলাকায় বসবাসের কারণে এঁরা আজ বাংলার উৎসবেও সামিল। একটা সময় 'ধাঙড়' শব্দে এঁদের পরিচিতি ছিল। শব্দটার অর্থ হল 'কাজের লোক'। শ্রমের কাজ সহজে পারত বলে কদর করত লোকে। এখন এরা বিভিন্ন কাজে নিজেদেরকে যুক্ত করেছে। যে ক'টি মেয়ে 'ঠুমকি' নেচে দেখাল তারা সকলেই স্কুল ছাত্রী; বাংলা

ভাষাতেই পড়ালেখা চলছে। কিন্তু যখন ওঁরা সাজসজ্জায় গীতবাদ্যে গানের কলির সঙ্গে নাচতে থাকে—তখন মনে হবেই মহুয়ার গন্ধে বাতাস মাতাল হয়েছে; চাঁদনীর আস্কারায় ভেসে যাওয়া এই রাতে নেশা ধরেছে ওঁদের লাস্যে। চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, বারাকপুর, শ্যামনগর ও ইছাপুর আনন্দমঠ অঞ্চলেও আদিবাসীপাড়া আছে; কিন্তু 'ঠুমকি' নৃত্যশৈলী কেবল আছে এই ২১ নম্বর রেলগেটের পাশে মেঠো বাড়ির বড় উঠোনে। নৃত্য তালিমের দিদি ভিনসারি তিরকি ও ভাই হারান সরদার একথা জানাচ্ছেন।

■ ইছাপুরের চতুষ্পাঠী

শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যালয় ঃ সাতপুরুষের নিঃশ্বাসে সিক্ত পূর্ববাংলার বরিশাল জেলার লক্ষ্মণকাঠি গ্রামের বাসিন্দা দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসেন এ বাংলায়। তাঁর নাম শ্রী প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য। 'গীতা-চণ্ডী-বিরাট' পাঠের তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য পুরুষ। তাঁর কণ্ঠে কাব্যসরস্বতী বিরাজ করত। দেশের বাড়িতেও পথঘাট তৈরি; পল্লীগঠন; পরহিতব্রত, সদানিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন শ্রী প্রিয়নাথ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ সাহিত্যভূষণ। কপর্দকশূন্য অবস্থায় আসলেন পশ্চিমবাংলায়। মাটি ছেড়ে আসলেন কিন্তু সংস্কার ছাড়তে পারলেন কোথায়! ইচ্ছা হল সংস্কৃত ভারতীর মন্দির গড়ার। ইছাপুর গ্রামের প্রান্তসীমায় এসে ঘর বাঁধলেন নতুন জীবনের আশায়। পিতার নামে গঠন করলেন এক আদর্শ পল্লী, নাম দিলেন "লক্ষ্মীনাথ কলোনী"।

পর্ণকুটিরে প্রাচীন ভারতের সুমহান চিত্র তুলে ধরতে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি চতুষ্পাঠী; দেশীয় ভাষায় যাকে বলা হয় "টোল"। নাম রাখলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কৃত বিদ্যালয়"। ইছাপুর অঞ্চলে এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র এই প্রথম। নর্থল্যান্ড উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী ব্রজেন্দ্রকুমার দে ও অন্য শিক্ষক শ্রী কালীদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হল এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও

১৯৫২ সালের ৪ ডিসেম্বর ৯ জন ছাত্র নিয়ে টোলের উদ্বোধন হয়। এই সময় থেকে ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল বহু ছাত্রছাত্রী এই চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেছেন। এখানকার বৈশিষ্ট্য এটাই যে দু'জন মুসলমান ছাত্র সাগ্রহে সংস্কৃত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন—একজন খাদেমুল ইসলাম, অন্যজন মহম্মদ ইদ্রিস।

১৯৯১ সালের ১৯ জুন পণ্ডিত প্রবর শ্রী প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়। তাঁর অবর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হয়নি। নানা গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয় মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য 'কুমারসম্ভব'-এর ছন্দোময় বাংলা অনুবাদ করে গিয়েছিলেন তা 'জাহ্নবী' পত্রিকায় প্রকাশও হত। 'বই' আকারে সে বাংলাকাব্য আজও অপ্রকাশিত। দুর্গাপুজো উপলক্ষে পণ্ডিতের

সমাবেশ ঘটত বাড়ির ঠাকুরদালানে। দুর্গাপ্রতিমার ব্যতিক্রমী লক্ষণীয় দিক হল ঃ দুর্গার ডানদিকে কার্তিক-সরস্বতী; বাঁয়ে লক্ষ্মী গণেশ। প্রচলিতের ভিন্ন দিক। তখনকার 'লক্ষ্মীনাথ কলোনী' আজকের লক্ষ্মীনাথ নগরে পরিচিত হচ্ছে।

চিত্রসুন্দরী চতুষ্পাঠী ঃ আজও চলছে এই চতুষ্পাঠী। ইছাপুর পূর্ব মানিকতলার 'যতীনগাও'-এর ঠিকানা। ১৯৫৩ সালের ২৭ জুন চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ। ফণি পণ্ডিতের বাড়িতেই বসে টোল। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের অনুদান প্রাপ্ত। পড়ান হয়—কাব্য ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, সাংখ্য, উপনিষদ। টোলের ১৯৫৪ সালের পরীক্ষার ফল—ভাটপাড়া কেন্দ্র, লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ আদ্য।

রোল নম্বর

(১৭) শ্রী বিশ্বনাথ সান্যাল—দ্বিতীয় বিভাগ

(১৮) বেঞ্জামিন রেজারিও—ঐ

(১৯) সুজিত কুমার চক্রবর্তী—ঐ

(২৩) তারকনাথ চক্রবর্তী—অনুত্তীর্ণ

(২৫) শ্রীধর ভট্টাচার্য—দ্বিতীয় বিভাগ।

এখানকার টোলে খ্রীষ্টধর্মী বেঞ্জামিন রেজারিও অধ্যয়ন করতেন—রেজাল্টে তারই উল্লেখ রয়েছে।

১৯৬৪ সালে মিলন সেন 'কাব্য উপাধি' পরীক্ষায় কলকাতা কেন্দ্রে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন; প্রতিবছর বিভিন্ন পরীক্ষায় উপাধিও দেওয়া হয়। ৪৭ বছর বয়সী টোলে, আজও ছাত্রের দেখা মেলে; 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ'-এর টোল পরিদর্শক কর্তৃক তিনবছর পর পর পুনর্নবীকরণ করা হয়। 'টোল' তৈরির সময় থেকে আজ পর্যন্ত তার খাতাপত্র হিসেবনিকেশ সবই যথাযথ নিয়মে চলছে, এই তথ্য প্রমাণ সহ দেখিয়েছিলেন ৮৩ বছর বয়সী অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রী ফণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়।

■ শতবর্ষ প্রাচীন মৃৎশিল্প

রুচিমান সুষমশিল্পে মৃৎশিল্প অনন্য। সনাতন গৌরব গাথায় মৃৎশিল্পের সমাদর বাংলা তথা ভারতবর্ষে অতুলনীয়। শৌখিন স্বচ্ছল মানুষের ড্রয়িংরুম, মুখর উৎসবের উপলক্ষে সাজান মাটির পুতুল ও বড় প্রতিমার যিনি কারিগর তিনি শ্রীহীন ঘরের মানুষ। সর্বজন উৎসবের নেপথ্যে আর আলোর পেছনে যার বসবাস। এই অবস্থা কেন! তার উত্তর খুঁজতে উত্তর ২৪ পরগণার এক মফস্বল শহর ইছাপুর গোয়ালাপাড়ার প্রাচীন কুমোর পাড়ার দশঘর কুমোরের জীবনালেখ্যই যথেষ্ট।

কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীদের সিজন্ ভাদ্র থেকে কার্তিক তিনমাস। কাঁচামালের দাম

মোটামুটি এরকম ঃ বাঁশ—১টা ৫০ টাকা; কাঠ ১৫০ টাকা কিউবিক, বিচুলি ৬০ টাকা মন, দড়ি ৪০ টাকা কিলো, পেরেক কিলো ২৫ টাকা, গঙ্গার মাটি ৮০০ টাকা এক লরি, এঁটেল মাটি ৬০০ টাকা, শোলা জরি ৫০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা; শ্রমিক মজুরি কম করে ৫০০ টাকা আর দু'বেলা খাওয়া।

প্রতিবছর কাঁচামালের দাম হুহু করে বাড়ছে। কারিগরের মজুরি চড়ছে। যে ক্রেতা সে প্রতিমার রূপ-রং-ঢং দেখছে, লাভ লোকসান পরখ করছে পরে কিনছে। ক্রেতা বিক্রেতার দোটানায় পণ্যে (প্রতিমা) লাভ দাঁড়াচ্ছে দশ পয়সায় আড়াই পয়সা, একশ টাকায় পঁচিশ টাকা। খদ্দের হাতছাড়া করে, কুমোরের ক্ষতি বই লাভ নেই। সেখানে কুমোরের ঘরে অর্থের থার্মোমিটারে মুনাফার পারদ চড়চড় করে কমতে কমতে কখনও ১০০ টাকায় ৮ টাকা এসে ঠেকছে সমবায়হীন মৃৎশিল্পীদের একক ঋণ স্বীকৃত নয়। টাকা লোপাট হবে ভেবে এরকম দায়িত্ব কোন সংস্থাই নিতে চায় না।

শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া গোয়ালাপাড়ায় মৃৎশিল্পীদের কোন সমবায় নেই। এখানে ১০ ঘর কুমোর; তার মধ্যে ৬ জন বেকার কুমোর এজন্য যে মাটির প্রতিমা বিক্রি ছাড়া এদের আর অন্যদিকে আয় নেই, ৩ জন চাকরিজীবী, এঁরাও সিজনে প্রতিমা বিক্রি করে থাকেন। এটা ওদের বাড়তি রোজগার। ১ ঘর আপাতত বন্ধ।

এখানকার এক অন্যতম মৃৎশিল্পী শংকর পালের সঙ্গে কথোপকথনে জানা যায় যে, বেশি টাকা নয়, মাত্র ২৫ হাজার টাকা বছরে কোন সংস্থা যদি ঋণ হিসেবে (বার্ষিক সুদ সঙ্গে) দেয় তবে ওদের অবস্থার অনেকখানি উত্তরণ ঘটবে। কেমন করে? জিজ্ঞেস করলে শংকর বলেন ঃ বৈশাখ মাসে ২৫ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে পেলে তখন থেকেই কাজ শুরু করা যাবে, টাকা যোগাড় করে কাজে হাত দেবো বা যত টাকা তত কাজ অর্থাৎ অল্প সময়ে কম টাকা যোগাড় হবে আর কম কাজ তৈরি হবে—এই মাথাব্যথা থাকবে না। নাহলে মফস্বলে মৃৎশিল্প রোজগারী জীবনধারনের শিল্প হিসেবে মৃত। অথচ দেখা যায় উৎসবকে ঘিরেই মৃৎশিল্পের উপস্থিতি; ছুটি অবকাশ আনন্দ। কিন্তু মহাজনের ঘরে চড়া সুদ দিয়ে জীবন চালাতে হয় মৃৎশিল্পীদের। তখন মনে হয় না সর্বজনীন উৎসবে প্রতিমার মুখ্য কারিগর শিল্পী, তিনি মাঙ্গলিক প্রদীপের আলোর নীচে মাথা গুঁজে কাঁদছেন।

■ নবাবগঞ্জের দুটি পারিবারিক পুজো

গঞ্জ ছিলই, ছিল বাণিজ্যের পসরা। গঞ্জের পাশ ঘেঁষেই বয়ে গেছে নাব্য নদী ভাগীরথী। মুরশিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদ থেকে এ পথে যাওয়ার সময় তাঁবু খাটালেন গঙ্গার পাড়ে; সিরাজদৌলা পর্যন্ত নবাবী আনাগোনা ছিল গঞ্জে। ইতিহাসের নিয়মেই নাম হয়ে গেল—নবাবগঞ্জ। ইছাপুরের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম এই নবাবগঞ্জ। এখানকার 'ভট্টাচার্য' বাড়ির দুর্গাপুজো ২৫০ বছরের পুরনো; আর স্বনামধন্য মণ্ডল

পরিবারের 'হরগৌরী' পুজো ১৬২ বছর বয়সী।

ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো

সুন্দরবন অঞ্চল থেকে গঙ্গাবক্ষে নৌকো করে আসত একধরনের 'গোলপাতা'; যা নবাবগঞ্জের গঙ্গাধারে বিচুলির সঙ্গে বিক্রি হত। 'ভট্টাচার্য' পরিবারের রামভদ্র তর্কালঙ্কার এই 'পাতা' দিয়েই বানালেন 'চণ্ডীমণ্ডপ'। শুরু হল টোল আর দুর্গোৎসব। নবাবগঞ্জের গোপাল ভট্টাচার্য লেন নামে চিহ্নিত হয়েছে এখন এই পাড়া। গোলপাতার চণ্ডীমণ্ডপ ব্যবসায়ীদের নিজস্ব উদ্যোগে পাকামণ্ডপ হয়। 'জাগ্রত' দেবী এস্থানে বিরাজ করেন বলে জনমানসে এর ভক্তিতুষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত।

এ পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা একচালা, চিত্রিত চালচিত্রে শোভমানা। হলুদ আর সোনালি রঙের মিশেলে দুর্গা; গণেশ লাল, অসুর নীলবর্ণ, মহিষের শুধু 'মাথা' থাকে; মাটির সাজে সজ্জিত সম্পূর্ণ প্রতিমা; কাপড় পরান হয় শুধুমাত্র 'নবপত্রিকা'য়। পুরোহিত-ঢাকি-কুমোর; পরম্পরা মেনে উপস্থিত হন। বোধনের দিন সন্ধের সময় মায়ের অস্ত্রসজ্জা ও ভক্তদানের স্বর্ণালঙ্কারের শোভায় 'মা' দিব্যময়ী হয়ে ওঠেন।

তিনদিনই 'বলি' হয়। নবমীতে ন'রকম বলি। ছাগ ও ফল সহ। সন্ধিপুজোয় বলি নেই। প্রথমে খিচুড়ি ভোগ পরে সাদা অন্নভোগ সঙ্গে তরকারি পায়েস ঘি ঘণ্ট ভাজা দই মিষ্টি থাকে। তিনদিনই এই দু'রকম ভোগের নিয়ম আছে। মহানবমীর দুপুরে পাড়া প্রতিবেশী বাড়ির আত্মীয়স্বজন সবাই একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারেন। 'মহাভোজ' নামে যা পরিচিত। ভাত-সুক্তো-ডাল-খিচুড়ি-তরকারি-তেঁতুলের টক-পাতলা টক দই আর বোঁদে দেওয়া হয়। প্রথম পাতে পড়ে 'মা'-কে নিবেদন করা ভোগের কিছু অংশ।

মহাষ্টমীর দিন সকাল থেকে গঙ্গা স্নান সেরে পুণ্যলোভাতুর 'মানত' করা ভক্তের দল দণ্ডী কেটে মণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হন। দেবীর উদ্দেশ্যে মানত পুজো এদিনটায় হয়ে থাকে। প্রচুর দান পড়ে। বাড়ির কেউই এই 'দান' গ্রহণ করেন না; পুরোহিতের প্রাপ্য হয় এ দান সামগ্রী।

মহাদশমীতে পুরোহিতের মাঙ্গলিক আচরণ ক্রিয়াকর্ম শেষ হলে প্রতিমা ঠাকুরদালান থেকে উঠোনে এনে রাখা হয়। বাড়ির মহিলারা প্রথমে বরণ করেন; পরে পাড়ার সব মহিলারা সিঁদুর খেলেন। বাঁশের দোলায় প্রতিমাকে কাঁধে চাপান পাড়ার ছেলেরা, ঢাকের বাদ্যিতে তখন করুণ সুর, পড়শীর চোখে ব্যথার অশ্রু ... শুরু একবছরের প্রতীক্ষা।

নবাবগঞ্জের মণ্ডলবাড়ির দুর্গাপুজো

নবাবগঞ্জের 'মণ্ডল' পরিবার বৈষ্ণব ধর্মাচারী। এঁরা সামাজিক হিতকর্মে ও ধর্মাচরণে স্বনামধন্য। এঁরা দুর্গপুজো বলেন না; বলেন—'হরগৌরী' পুজো। রথের দিন কাঠামো পুজো হয়ে প্রতিপদে 'ঘট' বসে নিত্যপুজো হয়। চালচিত্রে রামায়ণ মহাভারতের

যুদ্ধকাহিনী আঁকা। মণ্ডলদের নিজস্ব ঠাকুরদালানেই পুজো। প্রতিমা-সৌম্যমূর্তি; বাপের বাড়ি মেয়ে এসেছেন, সঙ্গে স্বামী-পুত্র-কন্যা। শিব ষাঁড়ের ওপরে বসে, শিবের ডান পায়ের কোলে গৌরী উপবিষ্ট; গৌরী দ্বিভূজা, দশভূজা নন। ডানদিকে লক্ষ্মী গণেশ; বাঁয়ে কার্তিক-সরস্বতী। এঁদের 'বলি' নেই। শাস্ত্রীয় নির্ঘণ্ট মেনে নিটুট আচারে মাতৃপুজো অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধিপুজোর পর ধুনো পোড়ান একটা প্রথা। কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা মণ্ডলরা মহাষ্টমীতে সকলে মিলিত হন।

মণ্ডল পরিবারের 'হরগৌরী' ভাসান পর্ব উল্লেখ্য দর্শনীয় বিষয়। দুই নৌকোর মাঝখানে দড়ির মাচায় বসান হয় প্রতিমা। গঙ্গা পরিক্রমা করবার পর ফাঁস আলগা করে প্রতিমাকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। বহু দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে নবাবগঞ্জের গঙ্গাপাড়ে। ঠাকুরমণ্ডপে শান্তিজল নিয়ে সিদ্ধি মুড়ি ছোলা মিষ্টি মুখ করে, কোলাকুলিতে শেষ হয় উৎসবপর্ব।

■ দেবীতলার শ্মশানে 'সুষমাময়ী' মাতৃবন্দনা

ৗ' ব্রহ্ম, জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি—"

'কালী' শুধু কলকাত্তাওয়ালী নয়; 'কাল'-কে কলন করেছেন বলেই তিনি 'কালী'। বঙ্গের কোণে কোণে তাঁর মহিমা বিস্তৃত। ইছাপুর দেবীতলা শ্মশানে দীপাবলির পর অঘ্রান মাসের অমাবস্যা তিথিতে 'শ্মশানকালী' বন্দনা প্রতিবছরই ভক্তি ও আন্তরিকতায় অনুষ্ঠিত হয়। 'হায়ন' কথার অর্থ বছর। আদ্যিকালে অগ্রহায়ণ মাস ছিল বঙ্গাব্দ শুরুর মাস। এখন বঙ্গাব্দের অষ্টম মাস—অগ্রহায়ণ; চলতি কথায় 'অঘ্রান'। এ মাসের নাম মার্গশীর্ষ। হেমন্ত ঋতু শুরু হয় এমাস থেকেই। প্রকৃতিতে 'সুষমাময়ী'। করালবদনা, ঘোরা মা, নন; শান্ত-বাৎসল্যময়ী মা; নগর কল্যাণে কল্যাণময়ী জননী। শ্মশানের স্থাপিত বেদীমূলে প্রতিমা বসান হয়। পুজো শুরুর প্রেক্ষাপট এইরকম সকালে চণ্ডীপাঠ সন্ধেয় গঙ্গা থেকে পুণ্যঘট উত্তোলন, চক্ষুদান, শিবাভোগের মধ্যে দিয়েই দেবীর আধ্যাত্মিক বন্দনা হয়। পুজোর নির্দিষ্ট কোন কমিটি না থাকলেও উৎসাহী মানুষ সমবেত আয়োজনে এই মাতৃবন্দনা করে থাকেন। ডোমবরণ, শ্মশানবন্দনা, দরিদ্রনারায়ণ সেবা আর অনেক মানুষের স্বেচ্ছাশ্রম উপস্থিতি এই পুজোর একটা বিশেষ দিক।

ইছাপুর স্টেশন থেকে পশ্চিমে ৩০ মিনিটের পথ হাঁটলেই মাঝেরপাড়া যতীনদাস রোড ধরে দেবীতলা শ্মশানে পৌঁছান যায়; পাশেই গঙ্গা ওপারে ভদ্রেশ্বর। এ পর্যন্ত যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের আত্মার শান্তি কামনাই পুজোর অন্যতম চেতনা বলে ভাবা হয়।

■ চড়কতলায় শীতলার চড়ক ও মেলা

ইছাপুর স্টোরবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে পূর্বদিকে বারোয়ারিতলা-গোয়ালাপাড়ার

ভেতর দিয়ে কুমোরপাড়ার পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা গেছে 'খাল' এর সোজাসুজি। এ পথে হাঁটলে রেল ব্রিজের নীচ দিয়ে পৌছানো যায় ব্রাহ্মণপাড়া-বিধানপল্লী-চড়কতলা-কমলপুর হয়ে কল্যাণী এক্সপ্রেস রাস্তায়। এখানকার চড়কতলায় আছে মা শীতলার মন্দির ও বিগ্রহ। চৈত্রের গাজন-নীল-চড়ক নয়। প্রতিবছর এখানে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমদিনে গ্রাম দেবতা শীতলার বার্ষিক পুজো সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য-মেলা বসে রাস্তাজুড়ে। এক সপ্তাহের মেলা। আশপাশের গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজনের সমাগমে পণ্য পসরা ক্রেতা-বিক্রেতার হাঁকাহাঁকিতে "মেলা" জমে ওঠে।

■ শব্দশিল্পী

অনুপ মুখোপাধ্যায় ঃ শব্দের শরীরে অর্থময় ইন্দ্রিয়ের এক রণিত ব্যক্তিত্ব শ্রী অনুপ মুখোপাধ্যায়। বাড়ি ইছাপুর-কমলগড় দেবীতলা রোডে। এবছর জাতীয় চলচ্চিত্রে শ্রেষ্ঠ শব্দযন্ত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি ('উত্তরা' ছবি, পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত) সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের বাসিন্দা অনুপ 'পুনে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট্' থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশোনা করে ১৯৭৪ এ শব্দযন্ত্রী হিসেবে ফার্স্টক্লাস সার্টিফিকেট পান। কাজের সূত্রে মুম্বই, মাদ্রাজ, কটক ঘুরে এলেন কলকাতায়। কলকাতা দূরদর্শন, 'রূপায়ন' ছুঁয়ে /এম এফ ডি সি' তে যোগ দেন। কাজ করলেন সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' ছবিতে। 'আগন্তুক' পর্যন্ত শব্দযন্ত্রী ছিলেন তিনি। 'সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট্—এ 'ডিন' পদে দু'বছর শিক্ষকের চাকরি করবার পর; এখন তিনি 'চ্যানেল এইট' এ ডিজিটাল সাউন্ড নিয়ে কাজ করছেন। স্রষ্টার তন্ময়তায় সৃষ্টির নতুন দিশায় তাঁর গবেষণা চলছে।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর 'উত্তরা' চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কৃত হলেও, জাতীয় চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করা 'পারমিতার একদিন', 'বাড়িওয়ালি', 'মনসুর মিঞার ঘোড়া', 'গুণ্ডা' এই পাঁচটি ছবিরই শব্দশিল্পী ছিলেন অনুপ মুখোপাধ্যায়। সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত অনুপবাবু রোজ সকালে ইছাপুরের বাড়ি থেকে রওনা হন কলকাতার উদ্দেশে ভিড় ট্রেনে আরও পাঁচ যাত্রীবান্ধবের সঙ্গে।

■ ভাস্করশিল্পী

সুনীল দাস ঃ পেশায় শিক্ষক, পরিচিতিতে ভাস্কর। শিল্পী সুনীল দাসের জন্ম ইছাপুর ব্রাহ্মণপাড়ায়। কলকাতার 'ইন্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ড্রাফট্ম্যানশিপ' থেকে পাশ করে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ('৭৭-'৭৯) 'অ্যাডভান্স্ স্টাডিজ ইনকালপ্চার' এ স্কলারশিপ। একক প্রদর্শনী কলকাতায় প্রথম করেন ১৯৭৯ সালে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। সেই শুরু। থেমে থাকেননি সুনীল কোথাও।

তাঁর পাড়ারই এক অজগলির পুকুর পাড়ে ছিমছাম স্টুডিও। আপনমনের মাধুরী

মিশিয়ে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একের পর এক বিমূর্ত ভাবনাচিন্তাকে রূপের অবয়বে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি।

প্রদর্শনী করেছেন কলকাতা, দিল্লির নানা জায়গায়। পুরস্কৃত হয়েছেন রাজ্য অ্যাকাডেমি থেকে, অল ইন্ডিয়া স্কালপট্‌র ক্যাম্প নয়াদিল্লি, টাটা ক্যাম্প, আর ১৯৯৯ সালের সুরেন্দ্রপল অ্যাওয়ার্ড। তাঁর ভাস্কর্য রয়েছে নয়াদিল্লির ন্যাশানাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্ট, চণ্ডিগড় পাঞ্জাব মিউজিয়াম, নয়াদিল্লি ললিতকলা অ্যাকাডেমি, বিড়লা অ্যাকাডেমি, কলকাতা আর জার্মানী সহ অন্য অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। বর্তমানে তিনি 'সোসাইটি অব কনটেমপোরারি আর্টিস্ট' কলকাতার সভ্য। তাঁর ভাস্কর্য নিয়ে কলকাতার নামী ঐতিহ্যশালী পত্রিকা প্রচ্ছদও করেছেন। ভাটপাড়ার অমরকৃষ্ণ পাঠশালাতে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত তিনি।

■ নবাবগঞ্জের ঘাট

গাজী ঘাট ঃ উত্তর দিক থেকে বললে নবাবগঞ্জে এটি গঙ্গার প্রথম ঘাট। নাম গাজী ঘাট। গাজী পীরের সমাধি রয়েছে এখানে। এটা স্নানের ঘাট। অনেক আগে ষষ্ঠীতলা এলাকার সব প্রতিমা এখানে ভাসান দেওয়া হত।

বিশ্বাস ঘাট ঃ শাঁখারী পাড়া, হরিদাস পাল স্ট্রিট সরাসরি এসেছে স্ট্র্যান্ড রোডে। এই ঘাটের নাম বিশ্বাস ঘাট। স্নানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আগে এর নাম ছিল 'জগন্নাথ ঘাট' কারণ ঘাটের মন্দিরে জগন্নাথ বিগ্রহ ছিল; এখন রাধাগোবিন্দের মূর্তি স্থাপিত হয়েছে।

ফেরি ঘাট ঃ নবাবগঞ্জ গ্রন্থাগারের প্রায় সামনেই এর অবস্থান। এপার-ওপার ফেরি যোগাযোগের ঘাট। ১৯৮০-'৮৫ সালের মধ্যে ভটভটি চালু হয় পারাপারের জন্য।

মণ্ডল ঘাট ঃ শ্রীধর বংশীধর রাস্তা শেষ হয়ে স্ট্র্যান্ড রাস্তার ওপরেই এ ঘাট। স্নানের ঘাট। উত্তর বারাকপুর পুরসভা ও নোয়াপাড়া থানার তত্ত্বাবধানে বড় প্রতিমার ভাসান এখানেই হয়ে থাকে।

কালী ঘাট ঃ স্নানের ঘাট। এর অন্য নাম মহেন্দ্র সাহার ঘাট। ওপরে কালীমন্দির রয়েছে। পাশেই শ্মশান।

রায়বাগান ঘাট ঃ রায়বাগান-ময়রাপাড়ার সোজাসুজি স্নানের ঘাট।

শীতলাতলা ঘাট ঃ পলতার দিকে এই ঘাট, শীতলা মন্দির থাকাতে নাম হয়েছে শীতলা ঘাট।

দেবীতলা শ্মশান ঘাট ঃ উত্তর বারাকপুর পুরসভার অধীন এই ঘাট। শ্মশানের লাগোয়াই স্নানের ঘাট। দাহ করবার কাঠ ঘরের পাশেই উঁচু ছাদ বিশিষ্ট তিনটি পাকা শবদাহের জায়গা। অদূরে শ্মশানকালীর বেদী। এখানেই রয়েছে পালা সম্রাট

ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র পূত স্মৃতি স্তম্ভ। লেখা আছে বাংলার গৌরব, শিক্ষাবিদ, লোকনাট্যগুরু ব্রজেন দে'র কথা।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে গঙ্গায় জল বেড়ে যাওয়ায় এসব জায়গা প্লাবিত হয়। 'দাহ' বন্ধ থাকে কিছুদিন।

ক্ষুদিরাম বসু খেয়াঘাট ঃ পারাপারের ঘাট। পাকাপাকিভাবে উদ্বোধন হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে। '৯০ সাল থেকে এখানে ভটভটি সার্ভিস চালু হয়। ওপারে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি ঘাট। ভাড়া ৮০ পয়সা বি ভি এস ও আর এন এস ইটখোলার সৌজন্যে দালান ঘর আর বসবার জায়গা তৈরি হয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্লাবনে গঙ্গায় জল বেড়ে এখানকার অনেক জায়গা প্লাবিত হয়। বহু মানুষ ঘর ছাড়া। পিচরাস্তা 'দেবীক্ষেত্র' পর্যন্ত জল উঠে আসে। ক' দিনের জন্য অনিয়মিতভাবে ভটভটি ওখান থেকেই ছাড়ে।

■ বাজার

নবাবগঞ্জ বাজার ঃ গাজীতলা থেকে শুরু নবাবগঞ্জ পুরনো লাইব্রেরী বাড়ির পেছনে বেশ বড়, বাঁধান স্থায়ী ঘরের 'বাজার' এটি। এটাই ইছাপুরের সবচাইতে পুরনো বাজার।

পুরনো লাইন বাজার ঃ ইছাপুর স্টেশন লাগোয়া পশ্চিমে রাইফেল কারখানা অব্দি সটান লম্বা বাজার এটি। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেশ বড়সড় বিকেলের বাজার। গঙ্গার মাছ, চেনা অচেনা মাছের ভিড় এ বাজারে। অন্য পসরাও রয়েছে সমান্তালে।

স্টোর বাজার ঃ পুরনো 'হেলেন মার্কেট' এখনকার নতুন বাজার বা স্টোর বাজার। সকালের বাজার। প্রায় ২০০ দোকান। মাছ আম, আনারসের আড়ত রয়েছে। ফ্যাক্টরির স্টোর থেকে শুরু করে হাসপাতালের মুখে এসে শেষ হয়েছে বাজারটি। লক্ষ্মী, কালীপুজো বেশ জাঁকজমক করে হয়। বসে বাউল, কবিগান, যাত্রার আসর। এছাড়াও রয়েছে বাদামতলা বাজার। জি টি রোডে বাদামতলা বাসস্ট্যান্ডের কাছে।

■ অ্যাডভেঞ্চার

ভূপর্যটক বিমল দে ঃ তাঁর নামের আগে যোগ হয়েছে একটি তাৎপর্যময় শব্দ 'গ্লোব ট্রটার'। ক্লাস নাইনে পড়বার সময় বাড়ি থেকে পালিয়ে তিব্বত গিয়েছিলেন। প্রথমে নবাবগঞ্জ পরে স্থায়ীভাবে সূর্যনগর দেবীতলায় বসবাস দে পরিবারের। ছোটখাটো চেহারার অধিকারী বিমল দে কৈশোরে পাড়ার প্যান্ডেলে ধুনুচি নাচে বরাবরই প্রথম; তেরোটা ধুনুচি নিয়ে তাঁর নাচ সকলকে অবাক বানিয়ে দিত। সাঁতার, ব্রতচারী, প্যারেডেও তিনি ছিলেন মধ্যমনি।

দাদার ভাঙা সাইকেল নিয়ে প্রথম পাড়ি দিয়েছিলেন ডায়মণ্ডহারবার ফ্রেজারগঞ্জ। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণের উদ্দেশে বের হন। পথশ্রম, ক্লান্তি,

অর্থাভাব সবকিছুকে জয় করেও তাঁর লক্ষ্যে তিনি অবিচল ছিলেন। আন্তর্জাতিক নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিকসনের কাছে থেকে। ইছাপুর অনুশীলনীর শিশু ক্রীড়া বিভাগের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। চাকরি করতেন সুইজারল্যান্ডে ইউনেসকোর সদরদপ্তরে। এখন অবসরপ্রাপ্ত বিমল দে'র বয়স ৬০। স্থায়ীভাবে আছেন জেনিভাতে। বিয়ে করেছেন ওখানকারই অধিবাসী সুইস স্কিইংয়ে চ্যাম্পিয়ন মারলিন গ্র্যানজিনকে; এখন তিনি 'দেবী দে' নামে পরিচিত। ভগবদপ্রেমে বিশ্বাসী, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত, নিরামিশাষী, স্বল্পাহারী দে দম্পতি।

জীবনের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নময় কাহিনীকে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর লেখা বইতে। বিমল দে-র 'সুদুরের পিয়াসী' (৭ খণ্ড), 'সূর্যপ্রণাম', 'মহাতীর্থে শেষযাত্রী' বইগুলি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার চিরকালীন ফসল। (তথ্যসূত্র ঃ চিত্তরঞ্জন দে)

■ পর্বতারোহন

নবাবগঞ্জে পর্বতারোহনের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে—নাম Nawabgang Mountain Lovers. এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রথম তাঁরা যে পর্বতারোহনে যায় সেটি হল Sandakphu in Darjeeling (West Bengal) ২০০০ খ্রীঃ তাঁদের কর্মসূচিতে ছিল Central Garhwal Himalaya Expedition Mt. Deoban (6855 M) & Kagbhusand (5830M) in Chamoli District, U.P. এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হলেন ডাঃ অজয় কুমার ঘোষ।

■ 'আনন্দমঠ' কবে থেকে

১৯৫৩ সালে ঢাকা শহরের রাজনীতিক অনিল রায়ের স্ত্রী লীলা রায়ের নেতৃত্বে 'আনন্দমঠ' কলোনী তৈরি হয়। নামকরণ করেন রায় দম্পতি-ই। ইস্টল্যান্ড, কণ্ঠাধার থেকে উদ্বাস্তু-রা চলে আসতে থাকেন এখানে। '৬০ সালের পর পরই লোকবসতি বেড়ে ওঠে। রাস্তাঘাট পাকা হয়।

সরকারি জমি ছিল এই 'আনন্দমঠ'। লীলা রায় 'অকল্যান্ড' এর মাধ্যমে এই জমি বিতরণ করেন। ৭০০ করে টাকা দেওয়া হয়েছিল পরিবার পিছু। '৬৫ থেকে '৭০ সালের মধ্যে বিদ্যুতের বাতি আসে। সম্মিলনী, হরিসভা, দীপায়ন ক্লাব তৈরি হয়। নানা জনসংযোগ ও গঠনমূলক কৃতকর্মে এক বিশেষ জায়গা নিয়ে আজকের আনন্দমঠ।

আনন্দমঠের অদূরেই ছড়িয়ে আছে সুকান্তপল্লী, শ্রীনগর, রামনগর। লকগেটের কাছে বামনপুর, প্রান্তিক, পূর্বাশা, ইন্দ্রপুরী এসকল পাড়ার নবজন্ম ঘটে।

■ এশিয়াড

১৯৯০ সালে বেজিং এশিয়াডে কবাডিতে সোনা জয় করেন ইছাপুর সোঁদলা পাড়ার

সেখ আনজার আলি। 'উত্তর ২৪ পরগণার ইছাপুর খো-খো কবাডি ক্লাবের উদযোগে বেজিং এশিয়ান গেমস-এ ভারতীয় কবাডি দলের বাংলার একমাত্র সদস্য সেখ আনজার আলিকে এক গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় ইছাপুর রাজকৃষ্ণ সিনেমা হলে।'

('কলকাতা' ২২-১০-৯০)

■ ইছাপুর নর্থল্যান্ড হাইস্কুল

১৯৪৫ সালে ৭ জানুয়ারি 'ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চ ইংরাজিং বিদ্যালয়'টির প্রতিষ্ঠা দিবস। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নাম 'ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয়। ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে আপামর জনসাধারণ যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করছে, সেই উন্মাদনার দিনে ইছাপুর অডর্ন্যান্স ফ্যাক্টরির কর্মী ও পরিচালকবৃন্দের প্রচেষ্টায় নর্থল্যান্ডে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ ও বিদেশে বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের স্মৃতির মণিকোঠায় এই বিদ্যালয়টি আজও উজ্জ্বল। এই বিদ্যালয়টি ১৯৪৫-১৯৭৭ পর্যন্ত অডর্ন্যান্স ফ্যাক্টরির পরিচালনাধীনে ছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি দিত অডর্ন্যান্স বোর্ড। শিক্ষক মহাশয়েরা পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বেতন কাঠামো অপেক্ষা বেশি বেতন পেতেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত কো-এডুকেশন বিদ্যালয় ছিল। ১৯৫১ সালে বালিকা বিভাগ স্থাপিত হয়—যা কালক্রমে 'ইছাপুর গার্লস হাইস্কুল নামে পরিচিত।

■ সরস্বতীপুজো

পৌরাণিক পালা, মেলা গান, নাটক, ক্যুইজ, শঙ্খ বাজানো প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো, এইসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ইছাপুরের সরস্বতী পুজো একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। জাঁকজমকে ইছাপুরের সরস্বতী পুজোর নাম-ডাক বিগত ত্রিশ বছর ধরেই। পুজোর সংখ্যা প্রায় ১৫০। আনন্দমঠ, নবাবগঞ্জ, মাঝেরপাড়া-নর্থল্যান্ড-এ বিস্তৃত অঞ্চল জুড়েই পুজো। প্যান্ডেল-আলো-মূর্তিসজ্জা এই ত্রয়ী সম্মিলনেই ইছাপুরের পুজো।

■ 'পদ্মশ্রী' পেলেন কে সি ব্যানার্জি

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। ইছাপুর রাইফেল কারখানার যুদ্ধ উপযোগী 'রাইফেল' সাপ্লাই ছিল গুণগত উৎকর্ষে অনন্য। তখন কারখানার জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন কে সি ব্যানার্জি। পুরো নাম কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' সম্মানে সম্মানিত করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' খেতাব হাতে পান।

■ লাইসেন্স পাওয়া প্রথম টেকনিকাল স্কুল

ইছাপুর স্টেশন রোডের ওপরে রয়েছে—"ও টি এস" বা 'অর্ডন্যান্স টেকনিক্যাল স্কুল'। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটিই প্রথম লাইসেন্স প্রাপ্ত টেকনিকাল স্কুল বলে মর্যাদা পেয়ে আসছে। ১৯২৫ সালে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। স্কুল শুরু হয় ১৯২৬ থেকে।

ওয়ার্কশপ হিসেবে আরম্ভ হয় ১৯৪২ থেকে। প্রতিবছরই রাইফেল ও মেটাল ফ্যাক্টরি কারিগরী শিক্ষনবিস চেয়ে বিজ্ঞাপন দেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচিত হন। যাঁরা নির্বাচিত হলেন, তাঁদের এখানে হাতে কলমে কাজ শেখান হয়ে থাকে।

■ দি পার্ক

উত্তর দক্ষিণে দুই কেন্দ্র সরকারের কারখানাকে ভাগ করে দিয়েছে 'ইছাপুর খাল'। দক্ষিণে মেটাল, উত্তরে রাইফেল। ইছাপুর খাল ৮ কিলোমিটার বয়ে গিয়েছে গঙ্গা থেকে এঁকেবেঁকে গঞ্জের গা ঘেঁষে বরতি বিলে। পুরনো মানুষেরা বলেন, এই খালে নৌকো করে ওঁরা বরযাত্রী বা আত্মীয়, বাড়ি যেতেন বারাসাত নীলগঞ্জের দিকে।

পার্কে এখন আর যে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না প্রতিরক্ষার কারণে। আগে ছিল অবাধ যাতায়াত। সোজা পথে নবাবগঞ্জ।

পার্কে একটা সুড়ঙ্গ ছিল যা গঙ্গাতীর পর্যন্ত; ছিল একটা ফাঁসির মঞ্চ, ইওরোপীয়ান ক্লাব। এখন হয়েছে ইছাপুর ক্লাব। একটা বিরাট গল্ফ কোর্স ছিল। প্রতি শনি রবিবার সাহেবরা ছুটিতে এখানে খেলতে আসতেন। সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট... বিলিয়ার্ড.. স্নুকার বোর্ড সবই, আছে, একটা 'বার', একটা লাইব্রেরি। তৈরি হয়েছে বিরাট এক ক্রীড়াঙ্গন নাম 'মেটাল স্পোর্টস কমপ্লেক্স'—তৈরি হয় ১৯৮২ সালে। ৪০০ মিটার দৌড়ের ট্রাক আছে। ফ্যাক্টরি স্পোর্টস ছাড়া জেলা স্তরের ফুটবলের জন্য অনুমতির ভিত্তিতে ওখানকার ছাড়পত্র পাওয়া যায়।

এখনকার পার্কে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, নবোদয় বিদ্যালয়, কোয়ার্টার, হাসপাতাল, ক্যান্টিন রয়েছে। স্থায়ী পুজো মণ্ডপ রয়েছে। দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে ১৯৫২ সাল থেকে। এখনও যাত্রাপালা পুজোর সময় হয়ে থাকে।

পুরানো কথকতায় ইছাপুর

"আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,.."

ইছাপুর স্টেশন। পুবে আনন্দমঠ, পশ্চিমে নবাবগঞ্জ, উত্তরে দেবীতলা-মাঝেরপাড়া-নর্থল্যান্ড, দক্ষিণে কণ্ঠাধার-ঘুসিপাড়া-পলতা। স্টেশনরোড ধরে হাঁটলে ডানদিকে পুরনো লাইন বাজার, বাঁয়ে অর্ডন্যান্স ক্লাব (১৯২৮), রাইফেল ফ্যাক্টরি স্কুল (১৯২১)। সোজা এলে ঘোষপাড়া রোড রিজিওনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (R.T.I) আগে বলা হত এ টি এস (অম্বরনাথ ট্রেনিং স্কিম), গ্রাম্য ইছাপুরে এই জায়গায় ছিল জংলীমাঠ, ডোবাখানা। কণ্ঠাধারের পথে পড়ত ডানদিকে কাঁটাতারের বেড়া, পার্ক, কোয়ার্টার... মসজিদ, খাটাল, চারতলা বাড়ি। বাদামতলার নাম ছিল ফাঁসিডাঙা। বাদামগাছের

ঘনসারি। এর ভেতরের রাস্তায় নিউলাইট সিনেমা হল। সবচেয়ে পুরনো শো হল, বর্তমানে বন্ধ। তখন টিকিটের দাম ছিল ২৫ পয়সা। পেছনের বাঁশবাগানে ডায়নামো চলত। শাল খুঁটি, টিনের বেড়া, বসবার লম্বা বেঞ্চ এই নিয়ে ছিল সিনেমা হল। বাদামতলা থেকে পলতার পথে ঠাঙাড়ে বাহিনীর বিপদ ছিল। আবার এখনকার নবাবগঞ্জের মধ্যে দিয়ে যে রাস্তায় বাস চলে সেই রাস্তায় ধিরু ডাকাতের বসবাস ছিল, সদরবাজার পর্যন্ত ছিল তাঁর এলাকা। এ পথেই ছিল সাহেবদের সিনেমা হল—"রেজিমেন্টাল সিনেমা হল", বাইরে ইংরেজি সিনেমার চার্ট ঝোলান থাকত, একমাস বা ১৫ দিনে ১৫ টা 'মুভি' দেখান হত।

ঘোষপাড়া রাস্তার ওপর ঘুসিপাড়ায়, লালকুঠির আগে, যে রেললাইন পাতা আর মরচে ধরা ক্রসিং গেট দেখা যায়, সে পথে ব্রিটিশরা রেলচড়ে রেসকোর্সে আসত, এর পাশেই এরোড্রোম। শোনা যায় ধিরু ডাকাত তার লুণ্ঠিত ধন এই এলাকাতেই গোপনে রেখে দিত। এরোড্রোম তৈরির সময় তা কিছু কিছু উদ্ধারও হয়েছিল। এ রাস্তাতেই শঙ্খশিল্পের যাবতীয় উপকরণ ও সাজঘর রয়েছে। আধা পিচ, আধা খোয়া ইঁট রাস্তা ছিল জি পি রোড। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির চলাচল ছিল। 'আর টি আই' এখন যেখানে, সেখানে দেখা যেত তেঁতুল-তাল-নানা গাছের সারি। ধোপারা এখানে কাপড় কাচত। একটা ডোবা আর কতগুলি চৌবাচ্চার মত ছিল; ঘোড়া এখান থেকে জল খেত। রাইফেল গেট পর্যন্ত এরকমই ছিল। লাইন বাজার বসত বেলা চারটের পর; দোকান ছিল খুবই কম। শাক সব্জি, মাছ, মাংস মুদি সদাই সবই পাওয়া যেত; '৪৮, '৪৯ সাল নাগাদ বাজার দর ছিল খাসির মাংস কেজি ২.৫০ টাকা; রুইমাছ ১.২৫-১.৫০ টাকা। তখন ট্রেন ভাড়া ছিল ইছাপুর-শিয়ালদা ৬ আনা।

ছাইগাদা, ছোটখাটো জঞ্জালের পাহাড়; সুরকি কল রাস্তা ছেড়ে 'ইছাপুর খাল'। 'খাল' পার হয়ে এলেই মেটাল গেট। ১৯৪৫-এ জাপানী বোমা পড়ে গোয়ালা পাড়ায়। তারপর স্টোরবাজার; কো-অপারেটিভ স্টোরের গায়েই নতুন বাজার। যার নাম ছিল 'হেলেনমার্কেট'; সকালে বাজার বসত। ধুনুরি-সেলুন-মাছ-সবজি দোকান ছিল। তারকাটায় ঘেরা ছিল বাজার। গুইরাম নাড়ুর বাড়িতেই ছিল 'কুবের ব্যাঙ্ক'। এখনকার যে স্টেট ব্যাঙ্ক সেই জায়গার লাগোয়াই ছিল 'আওয়ার হিন্দু হোটেল'। পুলিশ ফাঁড়ির কাছেই ছিল—দোতলা মেসবাড়ি, এর কেয়ারটেকার ছিলেন কালী স্যাকরা। পাশেই কবিরাজী ঘর; রাস্তার ওপারে কেষ্ট সাধুখাঁর বসতবাড়ি। এরপরেই ছিল ডোবা। বাপুজী কলোনী তখনও কেউ বলত না, বলত বড়বেরের জঙ্গল। একটা সরু রাস্তা ছিল। সকাল সন্ধেতে আদিবাসী লোকজনদের চলাচল করতে দেখা যেত। ১৯৫০ সালে টিনে লিখে নামকরণ করা হয় 'বাপুজী বাস্তুহারা কলোনী'।

এখনকার লিচুবাগান এলাকার নাম ছিল তাড়িখানা। এই তাড়িখানায় একটা সিনেমা হলও তৈরি হয়েছিল। 'ছায়াকায়া' নাম দেওয়া হলেও সেটি চালু হতে পারেনি।

বড়রাস্তার পাশে কালীতলা বলি যেটাকে ওই জায়গা দেখাশোনা করতেন শেখ হেদায়েত মিস্ত্রি। রাস্তার অপরপারে ছিল শ্যামসোহাগী নামে এক বারবণিতার আস্তানা। তারপরই মানিকতলা; মানিকপীরের দরগা আছে বলেই অমন নাম। খানাখন্দ, বাঁশ, শিরীষ গাছ, ছায়াছায়া পথ পুবে গেছে এখনকার পশ্চিম মানিকতলায়। বাঁয়ে ডানে দেবপল্লী, যতীনগাঁও, মজুমদারপাড়া, বৌদ্ধপল্লী, কুমোরপাড়া, আদিবাসীপাড়া তারপর ২১ নম্বর রেলগেট, পেরোলেই আজকের মায়াপল্লী। তখন ছিল শুনশান, ঝিল আর ধানী জমি, মাঝে সরু মেঠো রাস্তা। মিত্রদের বাড়ি, ঝিলপাড়ে ক্ষুদিরামপল্লী নাম পায়নি তখনও, ছিল মিলিটারি ব্যারাক। '৬৫ সালে একটি বিমান গোত্তা খেয়ে পড়ে এই মায়াপল্লীতে, পাইলটের নাম ছিল ফিলিপ; উনি মারা গেছিলেন।

ইছাপুর পুলিশ ফাঁড়ির বাঁদিক রাস্তা ঘোষপাড়া রাস্তা ছেড়ে নামলেই যতীনদাস রোড; বাঁয়ে নর্থল্যান্ড, ডানদিকে সাধুখাঁদের বাড়ি পুকুর... মাঝের পাড়া রাস্তা ... বিস্তীর্ণ এলাকা ছুঁয়ে সোজা গঙ্গা বরাবার। সাধুখাঁদের বাড়িতে ছিল রবীন্দ্রপাঠাগার (বর্তমান অনুশীলনী), যতীন দাস রোড ডানদিকে মায়া স্টোর্স হয়ে 'অনুশীলনী' পাশ দিয়ে সোজা এসেছে মল্লিকপাড়া বরাবর; মানিকতলা থেকে প্রসারিত পশ্চিম মানিকতলা রাস্তায় জুড়েছে এই যতীন দাস রোড। এই গোটা এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে লিচু বাগান, চান্দা সাহেবের বাগান, মল্লিক পাড়া, মানিকতলার বেশ খানিকটা অঞ্চল। মানিকতলা জলট্যাঙ্ক এলাকায় অনেক জমি ছিল মাদার বক্স নামে এক ব্যক্তির। চান্দার ভুট্টাবাগানে বসেছিল অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্ট গান। মিলিটারিরা ওতপেতে বসে থাকতো যুদ্ধ বিমানের আশায়। দশভূজা মন্দিরের রাস্তায় পড়ত বড় বড় মেহগনি গাছ, ফ্যাক্টরির দেয়াল, গেট কিছুই ছিল না। খ্যাদার বাগান মল্লিকাভিলা বা মালির বাগান নামগুলি ছিল এরকম, মাটিয়া নামে একজন মালি এই বাগান দেখভাল করতেন। নর্থল্যান্ড ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। নিউনর্থল্যান্ড ছিল সব খোলার ছাদের কোয়ার্টার, পণ্ডিতের চায়ের দোকান, ময়মনসিংহের চায়ের দোকান। নর্থল্যান্ডের ছাদ ছিল টালির, হেড মাস্টার্স কোয়ার্টারের প্রথম বাসিন্দা ছিলেন ব্রজেন দে। এখনকার মেটাল গেট চলতি কথায় মাঝেরপাড়ার ছোট গেট দিয়ে ঢুকতেই বাঁহাতে বুড়ির পুকুর, নর্থল্যান্ডে অনেকগুলি পুকুর। খালসাপুকুর, চড়কপুকুর, গাবতলা পুকুর, জোহাসাহেবের পুকুর। নর্থল্যান্ডে '৫০-'৬০ সাল নাগাদ পুজোমণ্ডপের ওখানে রথের মেলা বসত; রাসও অনুষ্ঠিত হত। কাঠের ছোট বড় 'রথ' রাস্তায় বেরোত। লোকজন জগন্নাথ দর্শন করত। 'রাস' বিগ্রহ আজও বড়রাস্তামুখী যতীনদাস রোডের চক্রবর্তী বাড়িতে পূজিত হয়ে আসছে। ১৯৩৮ সাল থেকে নর্থল্যান্ডে দুর্গাপুজো শুরু, কর্মময়তায় এ পুজো এখনও ইছাপুরে সেরা। যাত্রা ব্যায়াম প্রদর্শনী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত, এখন এসব আর হয় না। শুধু মনোরঞ্জনের মেলাটাই আছে। ডানদিকে কনডেম্‌ড কোয়ার্টার বা নিউনর্থল্যান্ড মাঝখানের রাস্তাই ছিল বিভাজন

রেখা। নিউনর্থল্যান্ডের কোয়ার্টারকে বলা হত কুলি কোয়ার্টার; নর্থল্যান্ডের কোয়ার্টারের নাম ছিল বাবু কোয়ার্টার। ডাকঘরের ওপরে ছিল ম্যাকিউলিয়াম লাইব্রেরী। সাহেব ম্যাকিউলিয়াম ছিলেন মেটাল ফ্যাক্টরির অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার। ইছাপুরের নাট্যচর্চার মহড়া এখানেই অনুষ্ঠিত হত। হাসপাতাল কোয়ার্টারের জায়গায় ছিল নারকেল বাগান।

এখনকার 'ওয়াচ টাওয়ার' ছোট গেট থেকে প্রায় গঙ্গা পর্যন্ত ছিল কন্‌ডেমড কোয়ার্টার। জে কে এল, এস, এম এই ছিল ব্লক নাম। মাঝে বড় পুকুর-এর পাশেই বিপ্লবী যতীনদাসের পৈতৃকভিটে। মঙ্গলচণ্ডী বাড়ি, শিবমন্দির, শ্মশান ঘাট, ডোম, নাপিত, জেলে পরিবারের বসতি ছিল গঙ্গার পাশাপাশি। ফেরি চলাচাল প্রায় ছিল না বললেই চলে। 'বি ভি এস' ইটখোলা রাস্তা ধরে সোজা এলে দেখা যেত 'দেবীক্ষেত্র'; এখান থেকে ডানদিকে রাস্তা যতীন দাস পাঠশালা (রাজেন্দ্র বিদ্যামন্দির) সোজা এলে পুকুরপাড়ে মেসবাড়ি।

দুর্গাপুজো হত বিদ্যামন্দির সংলগ্ন কলুবাড়িতে, ঝাড়লণ্ঠন জ্বলত, পঞ্চাননতলা (যতীনদদাস ক্লাব) বা বাবাঠাকুরতলায় দুর্গাপুজো হত। পচা খালের ওপরে ছিল বাঁশের পোল। গাবগাছের জঙ্গলে ভর্তি ছিল অঞ্চল। রাজ্য সরকার এদিকটায় জেলেদের বসবাস করবার জন্য জায়গা দিয়েছিল তখন নামকরণ হয়েছিল 'ঝল্লমল্ল কলোনী'। এই কলোনী এখনকার 'ডি-ক্যাম্প'। আরও উত্তরে এগোলে পড়ত 'গ্রেজিং ল্যান্ড' ঘাস জন্মাত বলে অমন নাম।

রাজেন্দ্র বিদ্যামন্দিরের রাস্তা ধরে পুবে এলে তেমাথার মোড়। পাশে দেবীতলা পুজোমণ্ডপ, আগে বলা হত ভুট্টামাঠ। এই রাস্তার নাম মাদল ডাঙা রোড। উত্তরে সূর্যনগর ছাড়িয়ে এলে ঘন শালগাছের বন, পরবর্তীকালে এর নাম হয় শালবাগান। এর শেষ হতেই—গারুলিয়ার মাঠ এখনকার লেনিননগরের শুরু এখান থেকেই ধানমাঠ পুকুর জলা জায়গায় পরিপূর্ণ; মাঝে খালের রাস্তা ধানীজমি... কবরখানা।

লক্ষ্মীনাথ কলোনী (এখন 'নগর') যেখানে শেষ সেই জলের ট্যাঙ্ক থেকে লেনিননগরের মধ্যে দিয়ে সোজা বাবুঘাট (গারুলিয়া) অব্দি চলেছে "বিশফুট রাস্তা' এই রাস্তা দিয়ে নোয়াপাড়া-গারুলিয়া-ইছাপুর শহরের যেকোন জায়গায় চলে যাওয়া যায়। জনবসতি দোকানপাট-রাজনীতির কড়চা -পুজো পার্বনে লেনিননগর এখন সরগরম। কাজের ক্ষেত্র থাকায় বন কেটে বসত বসল। গড়ে উঠল নতুন নতুন পাড়া। '৫২ সাল থেকে ৮৫ নম্বর বাস চলাচল করছে ঘোষপাড়া রাস্তা দিয়ে বারাকপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি। সরকারের রাজনীতির দরকার থাকলেও নেতৃত্বের কচকচানি চলেছে ভুতুড়ে কারণে সরকারি বাস চলেনি। ট্রাফিক ব্যবস্থাও বেহাল। '৮৪, '৮৫ সাল নাগাদ অটো রিক্সা পথে নেমেছে। মাঝে মাঝে মিটার ট্যাক্সি, ট্রেকারেরও দেখা মেলে। ফ্যাক্টরির ছুটি, আর স্কুল বসার ঘণ্টায় ইছাপুরের রাস্তা যেন জনসমুদ্রের গণ ঐকতান। আশপাশের

মিল কারখানার চুল্লির ধোঁয়া অনেককাল নিভে গেলেও সে নিয়ে বক্তাদের কোন মাথাব্যথা টের পাওয়া যায় না আজও। ইছাপুরের ব্যবসাও যে জোরদার চলছে তা বলা চলে না। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অতীত গৌরব থেকে বিচ্যুতির পথে। নির্দিষ্ট কোন মঞ্চ নেই। ওয়ার্কশপ-ই মঞ্চ, তাতেই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষের অল্প ভাল রাখার প্রয়াস। শেয়ার-ক্যুরিয়ার-ফ্যাক্স-ফোন-টু হুইলার এরই মাঝে ফ্যাক্টরির টিফিন সময়ে হোম সার্ভিসকারীদের সাইকেলে খাবার নিয়ে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া; সবই আছে। '৯০-'৯২ সালে ঘর আলো করে ঢুকে পড়েছে টিভির কেবল্ চ্যানেল।

■ খেলাধুলোয় ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ হলো ইছাপুরের ডাক পরিচিতি। খেলাধুলোর নান্দীপাঠে বিশেষ করে ফুটবলের বৃত্তে একজনের কথা না বললে ইছাপুরের ফুটবলের উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায়, তিনি হলেন—'বেনারসী'। ইছাপুর রেলস্টেশনে তিনি কুলিগিরি করতেন, হিন্দিবলয়ের মানুষ হয়েও ফুটবল ভক্তে তিনি বাঙালি। দেদার পয়সা খরচ করতেন, স্কুলে স্কুলে ঘুরে ফুটবল টিমের সেরা খেলোয়াড়টিকে বেছে নিতেন—চার ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতায় উত্তীর্ণ 'টিম' খেলতে যেত 'টুর্ণামেন্ট'। চব্বিশ পরগণা জুড়ে তাঁর নাম পরিচিত হয়েছিল—'বেনারসীর টিম'। সেই সময়ে যে ফুটবলার বেনারসীর দলে সুযোগ পেত না, তার ফুটবল দক্ষতা নিয়ে সংশয় দেখা দিত জনমনে। টিম জিতলে বেনারসী আহ্লাদে আটখানা হতেন, হারলে ভেঙে পড়তেন শিশুর মতো। খেলোয়াড়দের খাইয়ে দিতেন জিতলে—তখনরকার সময়ের কোল্ড ড্রিংক্স, দামি পেন মিলত প্রত্যেক খেলোয়াড়ের। মুখে বসন্তের দাগ, খাকি হাফ প্যান্ট, লাল ইউনিফর্ম, খালি পায়ে বেনারসী হাজির হতেন মাঠে মাঠে, জহুরে চোখ চিনে নিত রত্নটিকে। এই বেনারসী স্বর্গত অনেকদিন।

গোটা ইছাপুর বৃত্তে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে ইছাপুর অনুশীলনী, টাউন ক্লাব, ভ্রাতৃসংঘ, জলি ক্লাব, গোপীনাথ উল্লেখযোগ্য নাম। অনুশীলনী আর গোপীনাথ এই দুটি ক্লাবের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পও নিয়মিত চলছে।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত 'বি' ডিভিশান জেলা ভলিবল লিগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে 'এ' ডিভিশানে খেলল 'অনুশীলনী' যাঁদের নাম বলতে হয় তারা হলেন—গোপাল মারিক, সুকুমার খান, মৌনীশ বাগচী, সুজিত ব্যানার্জি, গোবিন্দ ঘোষ, রথীন চক্রবর্তী আরও অনেকে। অ্যাথলেটিক্স স্পোর্টসে ১৯৫০ সাল স্মরণীয়। দৌড়বিদ অজয় ঘোষ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে শিরোপা পেলেন 'ফাস্টম্যান ইন্ ডিফেন্স'। সাইকেল রেসে মহম্মদ আমিন; দৌড়, লংজাম্প, হাফস্টেপ, রিলে রেসে রতন চ্যাটার্জি, কিরণ চ্যাটার্জি, গোপাল পাল, অজিত দাস, মনোরঞ্জন বর্ধন, শটপুট ক্রীড়ায় এককড়ি ভট্টাচার্যর নাম স্মরণীয়।

মহিলা বিভাগের স্পোর্টসে '৫২ থেকে '৫৮ সাল পর্যন্ত বেলা ঘোষ ছিলেন এক

শীর্ষস্থানের অধিকারী।

ইছাপুরের দশভূজা ব্যায়াম সমিতি যা এখন অনুশীলনীর ব্যায়াম বিভাগে পরিণত, তাতে চলত কুস্তি, জিমন্যাসটিক, জুডো, লাঠি ও ছুরি খেলা। সুনীল ব্যানার্জি, অনিল নাগ কুস্তি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান।

জেলা রেফারির বিষয়ে বলতে গেলে মনে আসবেই সুনীল সেনের কথা। পরবর্তীকালে জয়ন্ত চক্রবর্তী, অরূপ চক্রবর্তী (ফিফা) ও দেবাশিস রায়চৌধুরি জেলা রেফারির ভূমিকায় দায়িত্ব পালনে কৃতিত্বের অধিকারী।

ইছাপুরের ফুটবলে সে সময়ে দিকপাল ছিলেন (৫২ সাল) কানু শীল, সতীশ বণিক, সনৎ দাস, তপন দত্ত, বিমল নিয়োগী, নবকুমার পাল, নন্দদুলাল ঘোষ, সাধন চক্রবর্তী, হারাধন দাস, সুনীল ব্যানার্জি, দেবব্রত চ্যাটার্জি, রতন চ্যাটার্জি, কিরণ চ্যাটার্জি, রঞ্জিত ব্যানার্জি, দিলীপ ঘোষাল প্রমুখ। নর্থল্যান্ডে গড়ে উঠেছিল— 'ম্যাঙ্গো গ্রুপ ফুটবল ক্লাব'; এছাড়াও ছিল তখনকার ভিক্টোরিয়া ক্লাব, এন সি সি; বন্ধুমহল প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এসব ক্লাব উঠে যায়। নির্ভীক সংঘ, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং এখনও ভাল খেলোয়াড় তৈরিতে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। ইছাপুর থেকে কলকাতার নামজাদা তথা ভারতের হয়ে এশিয়াড ফুটবলে অংশগ্রহণকারীরাও রয়েছেন। ১৯৮০-র দশকে সরল গাঙ্গুলি, সুব্রত অধিকরী, সুবীর বিশ্বাস, কৃষ্ণাজী রাও, অলোক মুখার্জি এঁদের কথা তো সকলেরই জানা। বর্তমান সময়ে ইছাপুরের মুখ উজ্জ্বল করেছেন—কুমারেশ ভাওয়াল, অভিজিৎ মান্না, গোবিন্দ রাজবংশী, কাজল ভট্টাচার্য, সুদীপ মল্লিক, অমর পাইন, দেবরাজ রায়—এঁদের নাম মনে পড়ছে। যদি অন্য ক্লাব সংগঠন বা খেলোয়াড়ের নাম বাদ গিয়ে থাকে, অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করা হবে।

ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কথা না বললেই নয়। সীমিত ওভারের একদিবসীয় টানা একমাসের টেনিস বলে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, শীতকালে ইছাপুরের এক উত্তাপময় ঘটনা। এত আকর্ষক, উত্তেজক, যে বলে বোঝানো যাবে না। দূর-দূরান্তের টিম এই আসরের জন্য অপেক্ষা করে। মিনি সল্টলেক (গঙ্গার চর পড়া জমিতে) গ্রাউন্ড আর লেনিন নগর মাঠে আলাদা আলাদা প্রতিযোগিতা চলে।

■ বিশ্বশুক মিলন মঠ

ইছাপুর কণ্ঠাধার চুনারীপাড়ায় এখনকার শুকদেব সরণিতে আছে এই মঠ। ঠাকুর শ্রী শুকদেব ব্রহ্মচারীর নামেই এই মঠ। বেললাইনের পাশ বরাবর এই মঠ। সাধন-ভজন, উৎসব অনুষ্ঠান, জনহিতকর কাজকর্মের মধ্য দিয়ে এঁরা চলেছেন।

(কৃতজ্ঞতা ঃ শ্রীসন্তোষ দে, অরুণ ভট্টচার্য, মৌনীশ বাগচী, পীযূষ চক্রবর্তী।)

লেখক পরিচিতি : লেখক ও প্যালিনড্রোমিস্ট

সঙ্গীতচর্চায় ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

তুহিন বিশ্বাস

সুর ও ছন্দকে কোন পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না। হৃদয়ের গভীর গোপন স্থান থেকে যে সুরের উৎপত্তি তার ব্যাপ্তি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পরাধীনতার গ্লানি যখন এদেশের মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য যখন দিকে দিকে স্বরাজের আগুন জ্বলছিল, তখনও বিদ্রোহের গানের সাথে সাথে শাস্ত্রীয় ও লঘু সঙ্গীতের চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। আলোচ্য অংশে আমি ইছাপুর নবাবগঞ্জ অঞ্চলের সঙ্গীতচর্চার কথাই বলব।

আনুমানিক ১৯১০ সালে। এই সময় এই অঞ্চলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন জীবনকৃষ্ণ মল্লিক ও তাঁর সহোদর মোহনচাঁদ মল্লিক এবং ডাঃ আমোদলাল মারিক। জীবনবাবু ছিলেন ধ্রুপদীয়া, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমতাবোধ। সহোদর মোহনচাঁদ বাবু ছিলেন সেতার বাদক। এদিকে ডাঃ আমোদলাল মারিখ ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গাইতেন। তিনি এলাহিবক্স খাঁ ও দানীবাবুর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীমতী আঙুরবালার সঙ্গে গানের রেকর্ডও করেছিলেন। তখনকার দিনে গানের স্কুল ছিল না বললেই চলে। এই অঞ্চলে ভট্টাচার্যপাড়ার পাশে গোয়ালাপাড়ার বাসিন্দা বনমালী ঘোষ ১৯৩৪ সালে নিজের বাড়িতে "সঙ্গীত সঞ্জন" নামে একটি গানের স্কুল স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক শিল্পী সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুনীল কুমার নিয়োগী। নারায়ণ রাও যোশীর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। 'সঙ্গীতসঞ্জনের' অন্যতম উদ্যোক্তা আভাশচন্দ্র নিয়োগী খুব ভালো প্রাচীন বাংলা গান এবং টপ্পা গাইতেন। এই প্রতিষ্ঠানের অপর এক ছাত্র ছিলেন বৃন্দাবন কুণ্ডু। বৃন্দাবনবাবু পরে এ টি কাননের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং রামকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে পুরাতনী গান শেখেন। তিনি ১৯৬০ সালে "সুরশ্রী সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র" নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন ও বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন। আজীবন সঙ্গীতের পূজারী বৃন্দাবনবাবু পরলোক গমন করার পর তাঁর কন্যা মিতালী নন্দী "সুরশ্রী সঙ্গীত শিক্ষা" কেন্দ্রের পরিচালনার ভার নেন।

নবাবগঞ্জ শাঁখারী পাড়ার বাসিন্দা জগবন্ধু ঘোষ ছিলেন একজন সঙ্গীত রসিক। তিনি ১৯৪০ সালে রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে নবাবগঞ্জে নিয়ে আসেন। রাজেনবাবু

প্রতি রবিবার বিকালে ভট্টাচার্য পাড়ায় শ্রীশচন্দ্র ঘোষের বাড়ির বৈঠকখানায় এসে গান শেখাতেন, জগবন্দু ঘোষ, বটকৃষ্ণ দাস, মুক্তোরাম ভাঙ্গর প্রমুখদের। এদের সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করতেন চণ্ডীচরণ অধিকারী। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁরা সঙ্গীত চর্চা করতেন।

বনমালীবাবু আবার কিছুদিন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেন। রাজেন্দ্রবাবু প্রতি রবিবার, আগে বনমালীবাবুর বাড়ি ও তারপর শ্রীশবাবুর বাড়ি আসতেন। এই সময়ে যাত্রা, থিয়েটারের গান ও সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রায় সরস্বতীবন্দনা গানের একটা জোয়ার দেখা যায়। ১৯৬৪ সালে "সঙ্গ ীত সঞ্জন" বন্ধ হয়ে যায়।

তবলাবাদক রমেশচন্দ্র হাজরার কন্যা স্বাতী হাজরা বেশ কিছু কাল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, ভজন ও রাগপ্রধান গানের তালিম নিয়েছিলেন। এরপর প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখেন। রাগ-রাগীনির বিস্তার ও ভাবের মুর্ছনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় স্বাতী হাজরার মধ্যে।

সুরের সঙ্গে তালের যে কি নিবিড় সম্পর্ক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পুনরায় একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাওয়া যায় তাল সাম্রাজ্যের এক মুকুটহীন রাজা গোষ্ঠ বিহারী রায়কে। গোষ্ঠবাবু ছিলেন নবাবগঞ্জ রায়বাগান নিবাসী। তালের যাদুকর গোষ্ঠবাবু বহু নামী দামী ওস্তাদ ও গায়কদের সঙ্গে তবলা ও পাখোয়াজ বাজিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বড়ে গোলাম আলি, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কৃষ্ণদাস ঘোষ, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রমুখ। এইচ এম ভি ও বেতারের সঙ্গেও তিনি বেশ কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। তাঁর কন্যা চম্পা রায় "গোষ্ঠবিহারী রায় স্মৃতি সঙ্গীত শিক্ষায়তন" নামে একটি গানের স্কুল স্থাপন করেন। গোষ্ঠবাবুর সুযোগ্য ছাত্র ও জামাতা অমল কুমার মিত্র বর্তমানে একজন বিশিষ্ট তবলা বাদক ও শিক্ষক। তাঁর অপর এক ছাত্র রমেশচন্দ্র হাজরা, লক্ষণ মেমোরিয়াল কলেজের তবলায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। রমেশবাবু শুধুমাত্র তবলাবাদকই নন, তিনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতানুরাগী। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর গভীর অনুরাগ। লক্ষণ মেমোরিয়াল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সুকুমার বোস। তিনি আনুমানিক ১৯৪৫ সাল নাগাদ এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। সুকুমারবাবু লক্ষণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে সেতার শিখেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, রাধেশ্যাম নিয়োগী, রমেশ হাজরা প্রমুখেরা শিক্ষকতা করতেন। বছর তিনেক আগে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

ইছাপুর অঞ্চলের বিখ্যাত সঙ্গীত স্কুল বলে পরিচিত "শিল্পী সংঘ"। ১৯৬১ সালে এর জন্ম। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নৃত্য, লঘু সঙ্গীত ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষার এক পীঠস্থান বলে

পরিচিত এই শিল্পী সংঘ। অনেক বিশিষ্ট শিল্পী এখানে শিক্ষা দান করেছেন। খেয়াল ও ঠুমরী শিল্পী সুনীল কুমার নিয়োগী এই প্রতিষ্ঠানের বহুদিন অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমানে আছেন খেয়াল, ঠুমরী, রাগপ্রধান, ভজন ও টপ্পা গানে অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া আছেন সুগমসঙ্গীতে প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্যামগোপাল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী ভারতী দে সরকার, শ্রীমতী অর্চনা সরকার, নজরুল গীতিতে ও আধুনিকে দূর্গা ভট্টাচার্য, গীটারে বিলাস দাস তবলায় শচীন সাবুই ও উমা পান এবং অমল মিত্র। এছাড়া নৃত্যে প্রদীপ্ত নিয়োগী, অমল নিয়োগী, সৃজন কুমার ও স্বপ্না ঘোষ।

এছাড়া এই অঞ্চলে সঙ্গীতের কয়েকটি স্কুল বা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সুর পঞ্চম" এবং ইছাপুর আনন্দমঠ অঞ্চলের "তান তরঙ্গম" ও "ওংকার সঙ্গীত একাডেমী"। ইছাপুর দেবীতলা অঞ্চলে "সঙ্গীতা" ও "সুরশ্রী" আর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত "শাস্ত্রীয় সঙ্গীতমণ্ডলী" এবং ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত মেধা সন্ধান সংস্থা "উন্মীল"। এই সকল সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অরূপ মুখোপাধ্যায়, তপনরঞ্জন দাস, অশোক দত্ত, দীপক চক্রবর্তী, মনোজ চক্রবর্তী, মদনমোহন সাহা, মধুসূদন পাল, অশ্রুকণা পাল, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শচীন সাবুই, অনাথ দেব, ঋষিকেশ মিত্র, রথীন ভট্টাচার্য, প্রণব গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ আচার্য, তাপসকুমার রায়চৌধুরী, শ্রমণা রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। এরা সকলেই সুর ও ছন্দের পূজারী।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতমণ্ডলীর মদনমোহন সাহা, নবাবগঞ্জ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট সেতার ও এসরাজ শিল্পী। ইনি প্রথম জীবনে শিবনারায়ণ সাউ, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ আলি আহমেদ, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিক্ষা নেন। বর্তমানে অজয় সিংহরায়ের কাছে শিক্ষাধীনে রয়েছেন।

এরপর আসা যাক মধুসূদন পালের কাছে। তিনি প্রথমে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে হারমোনিয়াম শিখেছেন। পরে ওস্তাদ সাগিরুদ্দিনের কাছে এবং বর্তমানে পণ্ডিত বাচ্চালাল মিশ্রের কাছে সারেঙ্গী শিক্ষারত। শ্রীমতী অশ্রুকণা পাল খেয়াল, ঠুমরী, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান, ভজন প্রভৃতি গান পরিবেশন করে থাকেন।

"তান তরঙ্গম" স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অশোক দত্ত। তবলাবাদক তপনরঞ্জন দাস প্রতিষ্ঠা করেন "সুর পঞ্চম" নামে একটি স্কুল। ওংকার সঙ্গীত একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা দীপক চক্রবর্তী ১৯৯১ সালে ধ্রুপদ নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি সুনীল নিয়োগীর কাছে খেয়াস ও তারপর রবীন্দ্রভারতী সুধামুকুল রায় ও নিমাই চাঁদ বড়াল কাছে ধ্রুপদ শেখেন। বর্তমানে তিনি আমিনুদ্দিন ডাগরের কাছে শিক্ষারত। সহোদর মনোজ চক্রবর্তী তালবাদ্য শেখেন I.T.C র পণ্ডিত চন্দ্রভান এবং রবীন্দ্রভারতীর হারাধন

পালের কাছে। এবারে আসা যাক 'উন্মীল' প্রসঙ্গে। বিনয় কৃষ্ণ আচার্যের প্রয়াসেই এই অঞ্চলের সঙ্গীতের উৎসাহ দানের একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান সফল। নবীন সঙ্গীত মেধা সন্ধান সংস্থাটির নাম "উন্মীল"। এই সংস্থা প্রতি বৎসর নরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য স্মৃতি সঙ্গীত বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক তাপসকুমার রায়চৌধুরী।

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেবীতলায় প্রতিষ্ঠা করেন "সংগীতা" সংগীত শিক্ষাকেন্দ্র। বেতার শিল্পী হরপ্রসাদবাবু আধুনিক, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আধুনিক গানের আর এক শিল্পী অরূপ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন "সুরশ্রী" সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্র। এছাড়া এই অঞ্চলের অপর একটি সংস্থার নাম "নবাবগঞ্জ কালচারাল ফোরাম"। এই ফোরাম নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে থাকে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ২৫ বৈশাখের প্রভাতফেরী অনুষ্ঠান। বিগত কয়েক বৎসর এই অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। লক্ষ্ণৌ ঘরানার নিশীকান্তবাবু ৪০ দশকে বিশিষ্ট খেয়াল ও ঠুমরীর শিল্পী ছিলেন। এই শিল্পীর মৃত্যুর দিনও ছিল সঙ্গীতময়। বরণীয় শিল্পীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে গান গাইতে গাইতে হঠাৎ-ই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই তিনি সুরোলোকের মায়াজাল ছেড়ে পরলোকের পথে পাড়ি দেন।

শৈলেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে পরিচিত ছিলেন ৬০ এর দশকে। ইনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। বর্তমানের সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার কল্যাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অগ্রজ ছিলেন।

লঘু সঙ্গীত বা বাংলাগানের ক্ষেত্রে বর্তমানে কয়েক জন শিল্পীকে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরূপ মুখোপাধ্যায়, প্রমীল কর, সুদীপ দাস, গৈরিকা চন্দ, নিমাই বৈরাগী প্রমুখেরা। শিল্পী প্রমীল কর ও সুদীপ দাস একসময় বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিলেন। বর্তমানে বিশিষ্ট কৌতুকগীতির শিল্পী দ্বীপেন মুখোপাধ্যায় একসময় এ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। এছাড়া বংশীবাদক হিসাবে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি বেতার ও দূরদর্শনে অনুষ্ঠান করেছেন। আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে বর্তমানে যে সমস্ত গীতিকার ও সুরকার কিছুটা স্বকীয়তার ছাপ রাখতে চেষ্টা করছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুরকার কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, অরূপ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুনীল কুণ্ডু প্রমুখ। গীতিকার হিসাবে পাওয়া যায় প্রফুল্ল নিয়োগী, প্রলয় রায়, চঞ্চল প্রামাণিক, শঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখদের।

আরো তথ্যের অভাবে হয়তো কিছু শিল্পী ও সংস্থার নাম বাদ পড়েছে তাদের কাছে এই নিবন্ধের লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার

নবাবগঞ্জ ঝুলন মেলা ও রাধাগোবিন্দ জিউমন্দির

—হিমাংশু দে

নবাবগঞ্জ ঝুলন মেলা ইছাপুরের এক বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এই মেলা বসে। আবালবৃদ্ধবনিতা, ব্যবসায়ী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর মানুষ মেলায় মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মণ্ডলবাড়ির দুই ভাই শ্রীধর মণ্ডল ও বংশীধর মণ্ডল ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে।

সমীক্ষা করে এবং ঐ পরিবারের নৃসিংহ নারায়ণ মণ্ডলের কাছ থেকে জানা যায়—তখন এলাকায় যে সমস্ত মানুষজন ছিল তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, জনমজুর গোছের। এইসব লোকেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে প্রসারিত করার জন্য লোক শিক্ষার্থে বিশেষ করে মহাভারত ও রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও ঘটনার সচিত্র বর্ণনা প্রদর্শন করে বোঝানোর জন্য কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পী এনে মানুষের সমান কিংবা তদপেক্ষা অধিক উচ্চতার মৃতমূর্তি তৈরি করান মণ্ডল পরিবারের লোকেরা। যেমন, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্র হরণ, শ্রীরামচন্দ্রের স্বর্ণমৃগের পেছনে দৌড় ও শেষে মৃগের মারিচ রূপ ধারণ এবং আরো অনেক কিছু। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ভীম ও দুঃশাসনের মল্লযুদ্ধ এবং দুঃশাসনের বুক চিরে রক্ত পান। দুর্যোধনের সঙ্গে গদাযুদ্ধে এবং তার উরুভঙ্গ।

বিপুল ভীড় হত মেলায়। কর্তৃপক্ষ ছাড়াও পুলিশ আর স্কাউটরা এই মেলার ভীড়কে নিয়ন্ত্রণ করতেন। মেলাটি বসতো মূল ঠাকুর বাড়ির বহির্ভাগের রাস্তার দু'পাশ দিয়ে সারিসারি দোকান ও পসরা নিয়ে। দুই দিকের ছাদের নীচে প্রায় দেড়শো মাটির পুতুল ছিল এই রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাকে চরিত্রায়িক করার জন্য। এই মেলা দেখতে একসময় দূরদূরান্ত থেকে লোক আসতো। প্রসঙ্গত একটি বিশেষ ঘটনার কথা বললেন, নৃসিংহবাবু। তখন ইংরেজ শাসনের রমরমা বাজার। ভাইসরয় বড়লার্ট লর্ড মিন্টো মেলা দেখে খুশী হয়ে বারাসাত ফিরে যান এবং স্ত্রীকে মেলার দৃশ্যাবলী বর্ণনা করে শোনান। ভাইসরয়ের স্ত্রী খুশি হন যারপরনাই। তিনি বায়না ধরেন মেলা দেখবেন। বাধ্য হয়ে বেশ কিছুদিনপর বড়লাট সস্ত্রীক আসেন মেলা দেখতে। খোঁজ নিয়ে জানেন মেলার স্থায়িত্বকাল

শেষ—এ ভাঙ্গনের পালা। গোষ্টমণ্ডপে পূজা হত খুব ধুমধামের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ি থেকে কৃষ্ণবলরাম নগর পরিক্রমা করার পর গোষ্ঠমণ্ডপে রাখা হতো। গোষ্ঠমণ্ডপের সামনে যুগলকুঠী। এখানে রাখা হত রাধাকে। দ্বিপ্রহরে কৃষ্ণকে নিয়ে যাওয়া হত যুগলকুঠী। মিলন হত রাধাকৃষ্ণের। যুগল মিলন। এই কারণেই এই কুঠীর নাম যুগল কুটীর। বলরাম থাকতেন গোষ্ঠমণ্ডপে। মণ্ডপের সামনে যাত্রা হত সারারাত ধরে। সারারাত জেগে বলরাম যাত্রা দেখতেন। পরদিন ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত বলরামকে।

এই সমস্ত ঘটনা যখন শেষ তখন বড়লাটের স্ত্রী মেলা দেখতে এলেন। সময়টা ১৯০৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। অগত্যা নতুন মণ্ডপ সাজিয়ে, ভাঙ্গা মেলা বসানো হয়। আবার পূজো হয়।

সেকালে মেলা বলতে নবাবগঞ্জ কালীতলা থেকে গঙ্গাতীরের ঘাট পর্যন্ত। এই দূরত্ব ছিল প্রায় এক কিলোমিটার। পরবর্তীকালে ঘাট থেকে বর্তমান মণ্ডলবাড়ির পাশে গঙ্গাপাড়ের রাস্তা ধরে সোজা ফ্যাক্টরি গেট পর্যন্ত এবং কালীমন্দির থেকে সোজা পূর্ব দিকে এগিয়ে নিউলাইট সিনেমা হলের দিকে মেলার দৈর্ঘ্য প্রসারিত।

এই মেলা এবং প্রদর্শনীর অস্তিত্ব ১৯৯৩তেও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। ১৯৯৪তে ভারী বর্ষা হয়। তখন থেকে শোনা যায় মণ্ডপে ভাঙ্গন ধরে। ভীম এবং দুঃশাসনের ওপর ভেঙ্গে পড়ে মণ্ডপে সংলগ্ন বহিঃবারান্দার ছাদ। দুঃশাসনের শায়িত দেহটি চাপা পড়ে কিন্তু ভীমের ঋজু দেহটি অক্ষত থেকে যায়। শোনা যায়, হাত পা একটু ছড়ে গেছে এই যা। বর্তমানে এইসব অতিকায় পুতুলগুলির একটিও নেই।

কালীমন্দিরের অনতিদূরে ছিল পুতুলনাচের মঞ্চ। ইংরেজ শাসনের শেষে যখন দেশীয় নেতার শাসন শুরু হয়, তখন ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব মজে যেতে থাকে যুগের অগ্রগতির ধারায়—সিনেমা, টিভি বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের চাপে।

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রার সাজসজ্জা

(১) যুগল সজ্জা. (২) অষ্টসখির শিবিকায় শ্রীকৃষ্ণ, (৩) গোষ্ঠে রাখাল রাজা, (৪) কালিয়া দমন, (৫) রাইরাজা, কৃষ্ণ কোটাল, (৬) নৌকা বিলাস, (৭) মানভঞ্জন (শ্রী রাধিকার)

রাধাগোবিন্দ জিউমন্দির

ঠাকুর বাড়ি বলতে ঝুলনতলা গোপীনাথ জিউ ঠাকুর বাড়িকেই বোঝায়। ১৮৪৫

সালে এটার নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। সঙ্গে একটি অনাথ আলয়ও ছিল।

ঠাকুর দালান বলতে গোপীনাথ জিউ ঠাকুর বাড়ির পাশের রাধা গোবিন্দ জিউ ঠাকুর বাড়িকে বোঝায়। সম্পত্তির আয় থেকেই মন্দির সেবা, ঠাকুর বাড়ি পরিচালনা, অনাথ সেবা ইত্যাদি করা হত। এখন অনাথ সেবা বন্ধ হয়ে গেছে। মণ্ডলদের উত্তর পুরুষরাই এই সবের তত্ত্বাবধায়ক।

স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রী পরেশ সাহার পূর্ব পুরুষরা চন্দননগরের বাসিন্দা ছিলেন। একসময় তারা সেখান থেকে নবাবগঞ্জে আসেন স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে। পরেশ সাহার পিতা হীরালাল সাহা ও মাতুল মহেন্দ্রনাথ সাহা। দাসুমনি দাসী হল মহেন্দ্র সাহার স্ত্রী। অত্যন্ত ধর্মপরায়না। অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং অবদান ছিল। এই মহিলাই রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।
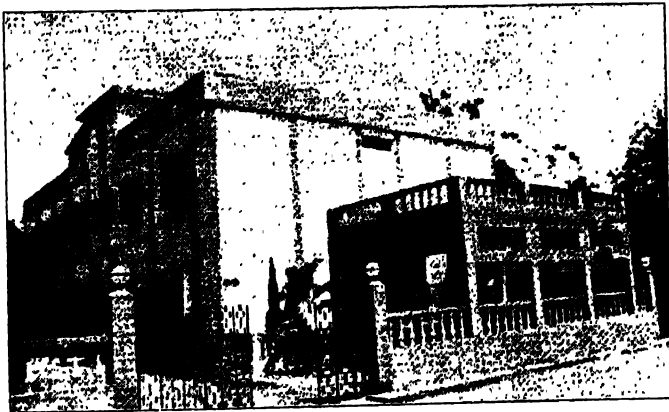
Jamini Bhusan Memorial Maternity Hospital
Courtesy : A Bulletin–North Barrackpore Municipality (1996)

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট কবি ও পত্রিকা সম্পাদক

যাত্রাশিল্প

রাখালরানী—*বাবুলাল দাস*

১৯৭৩ সাল, ২৬ সেপ্টেম্বর। কলকাতা রনজি স্টেডিয়ামে (ইনডোর) পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক আয়োজিত প্রথম যাত্রা উৎসব। বিপুল আয়োজন। প্রবীণ যাত্রাশিল্পী, পালাকার তথা কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার উত্তাল ঢেউ উঠল—"এই সেই রাখালরানী"। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত, সুদৃঢ় অথচ বিনম্র স্বভাবের বৃদ্ধ মানুষটি আস্তে আস্তে মঞ্চের উপর উঠে এলেন। হুড়মুড় করে চারিদিক থেকে আলোকচিত্রীরা পজিশন্ নিতে উঠল। দর্শকরা হৈ হৈ করে উঠল রাখালরানীকে ভাল করে দেখার জন্য। যাত্রা উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল। ঐ পুস্তকে রাখাল চন্দ্র দাসের পঁচিশ/তিরিশ বয়সের নারী চরিত্রে মেক আপ নেওয়া একটি ছবি ছাপা হয়েছিল। নিচে ছিল ক্যাপ্শান্—"একটি ঘটনা ঃ অভিনয় চলাকালীন এর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে চা বাগানের বিদেশি ম্যানেজার লাঠিয়াল দিয়ে এঁকে নিজের বাংলোয় তুলে আনার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এর বর্তমান চেহারা সংবর্ধনার ছবি দেখুন।" একজন পুরুষ মানুষ অভিনয়কালে নিজেকে নারী হিসেবে দর্শকমহলে প্রতিষ্ঠিত করার মত যে দুরূহ কাজটি আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার সপক্ষে উপরের ঘটনাই যথেষ্ট।

"দিনের বেলা অবসর পেলেই মেয়েদের আচরণ অভ্যেস করতাম, আর রাত্রে লক্ষ্য করতাম প্রতিষ্ঠিত পুরুষ রাণীদের অভিনয় ধারা।" রাখালরানী অন্য ছেলেদের সঙ্গে হাডুডু খেলতেন, নৌকা বাইতেন, গাছে চড়তেন। সে সময়ে তিনি হয়ে যেতেন শ্রীমান রাখাল দাস। পুরুষ ও নারী সত্তার দ্বন্দ্ব অভিনয় থেকে অবসর না নেওয়া পর্যন্ত রাখালরানীর হৃদয়কে আলোড়িত করেছে. আসরে উঠলে যে রাখালরানী হয়ে উঠতেন লক্ষ্মী, কুবেণী, চম্পা, চামেলী, অর্চনা—তিনিই পালার পর স্বাস্থ্যবান শ্রীযুক্ত রাখাল দাস হয়ে যেতেন। সৌভাগ্যবশতঃ রাখাল দাস রাখালরাণী হয়ে মেয়েদের শুধু অনুকরণই করেননি, করেছেন বিশ্লেষণ।

রাখালরানী যে সময়ে অভিনয় জগতে খ্যাতির শীর্ষে, ঠিক সেই সময়ে তিনি অভিনয়জগৎ থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করেন। তখনও তাঁর অভিনয় করার যথেষ্ট

ক্ষমতা ছিল,—তা সত্ত্বেও তিনি অভিনয় থেকে চির বিদায় নেন কেননা, যাত্রায় তখন মহিলা শিল্পীরা আসতে শুরু করেছেন। রাখালরানী বুঝেছিলেন আজ না হয় কাল তাঁকে সরে যেতেই হবে। রাজা দেবিদাস পালায় সর্বজয়ার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল রাখালরানীর নটীর জীবন। সর্বজয়ার বেদনার্ত বিদায় গ্রহণের মত রাখালরানী বিদায় নিলেন যাত্রাজগৎ থেকে। যাবার সময় সর্বজয়ার সংলাপই যেন বলে গেলেন যাত্রাজগৎকে উদ্দেশ্য করে "সেবার ভার নিয়েছিলাম। এতদিনের মধ্যে একবারও সে ভার ত্যাগ করিনি। আজ আমি চলে যাচ্ছি।"

৩৬ বছরের অভিনয় জীবনের শেষে এসে তিনি দেখলেন, যাত্রাজগৎ তাঁর জন্য জমা রেখেছে শুধুমাত্র দারিদ্র। মুদির দোকানে কাজ করেছেন, বাদাম ভাজা বিক্রি করেছেন। এরপর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হলেন বেলেঘাটা আই. জি হাসপাতালে। যমে মানুষে টানাটানি করে প্রাণে বেঁচে গেলেন। আবার শুধু হল জীবিকার খোঁজ। এইভাবে ভাসতে ভাসতে অদম্য রাখালরানী ইছাপুরে এলেন। ইছাপুর নর্থল্যান্ড স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে। রাখালবাবু'র চেহারা দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন প্রায়। এই কি তার পালার কুবেণী, স্বর্ণময়ী, বেগম, রানী, মণীষা, সর্বজয়া? বিস্ময়ের ঘোর কাটল রাখালবাবু যখন তাঁর কাছে আসার কারণটুকু বললেন—তাঁর অধীনে যে কোনও একটি চাকরী। রাখালবাবু'র ফর্মাল এডুকেশনাল্ যোগ্যতা নেই। এই অবস্থায় দপ্তরী'র কাজ ছাড়া তাঁকে কিই বা দেওয়া যায়! রাখালরানী হয়ে গেলেন ইছাপুর নর্থল্যান্ড স্কুলের কর্মী। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর তারিখে রাখালরাণী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সৌজন্য : সুকান্ত '৯৮ বইমেলা সংখ্যা

■ ব্রজেন্দ্রকুমার দে (পালা সম্রাট)

(জন্ম ঃ ১-২-১৯০৭, মৃত্যু ঃ ১২-৩-১৯৭৬)

বিশিষ্ট যাত্রাপালা লেখক। বাড়ি ইছাপুর দেবীতলা। ব্রজেন্দ্রকুমার ইছাপুর নর্থল্যান্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর লেখা যাত্রাপালাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'চাঁদের মেয়ে', 'বাঙালী', 'কোহিনুর', 'সোনাইদিঘি' প্রভৃতি।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে কবিতাও লিখতেন—"রবি-প্রশস্তি"

কত মহারথী কত সম্রাট করেছ দিগ্বিজয়,

বাঁধিয়া এনেছে রথের চাকায় লুণ্ঠিত গজ হয়।

তুমি কর নাই কোন দেশ জয়, বাঁধিয়া আন নি বন্দী,

অসির আঘাতে অরি শির নিতে কর নাই অভিসন্ধি।

■ সুজন চন্দ'র লেখা থেকে (অংশবিশেষ)

"..... সঙ্গীতের সঙ্গে সংগতি রেখে নাটক ও পালাগানের উৎকর্ষ সাধনেও এই অঞ্চলে কতিপয় মানুষ অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রয়াত ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, বলাইচন্দ্র ঘোষ, মাখন সুর, কেষ্ট নিয়োগী, বিমলেন্দু দাস, বিশ্বনাথ সুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোপীনাথ নাট্যসংস্থার ছত্রছায়ায় থেকে এঁরা ঝুলনের সময় এবং অন্যান্য সময়ে সুন্দর-সুন্দর নাটক উপহার দিতেন। এগুলি মূলত ছিল পৌরাণিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক পালা।

পলতা মহালক্ষ্মী কটন মিলের সংলগ্ন মাঠে প্রায় যাত্রা এবং নাটক অভিনীত হতো। কখনও নিজেরা অভিনয় করতেন, কখনও আবার বাইরে থেকে দল ভাড়া করে আনা হতো। সেবাগ্রাম, আনন্দমঠেও বিভিন্ন সময়ে নাটক মঞ্চস্থ হতো। পুরুষরাই তখন নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আনন্দমঠে একসময় বিভূতি দাস, হরি চ্যাটার্জি, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অমূল্যরতন পাল, অনিল গোস্বামী, শান্তনু সান্যাল, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, প্রমোদরঞ্জন দে, নিখিল সরকার প্রমুখ উচ্চস্তরের অভিনেতা ছিলেন। শীতলা নাট্যসংস্থা বেশকিছু ভালো নাটক উপহার দিয়েছেন। বাংলা নাট্যজগতের উজ্জ্বল তারকা পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে এই এলাকারই মানুষ। বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ যাত্রার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। এককালে থিয়েটারের প্রসঙ্গ উঠলেই যাঁর নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরত সেই গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই অঞ্চলেরই মানুষ। আজ বাংলা যাত্রা জগতে যাঁরা স্বীয় প্রতিভায় উজ্জ্বল তাঁদের মধ্যে এই অঞ্চলের বেলা সরকার এবং তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য। দীপেন মুখোপাধ্যায় এবং সুশীল দাস কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়ে নিজেদের স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছেন।

সৌজন্য : উত্তর বারাকপুর পৌরসভা ১২৫ বর্ষপূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটি, স্মরণিকা।

আরও তথ্যে ইছাপুর-নবাবগঞ্জ

■ নবাবগঞ্জে শ্রীধর-বংশীধর রোডের উপর দুটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির রয়েছে—গোপীনাথ জিউ মন্দির, ১২৫৭ বঙ্গাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীধর-বংশীধর মণ্ডল; এবং রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির ১৩২৭ বঙ্গাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন দাশুমনি দাসী। নবাবগঞ্জে গঙ্গার ধারে রয়েছে শ্যামসুন্দর মন্দির। এছাড়া গঙ্গার ধারে রয়েছে দাশুমনি দাসী প্রতিষ্ঠিত কালীয় শিব মন্দির। এখানে কোন উৎসব হয় না, নিত্য পূজা ছাড়া। আরও আছে বুড়ো শিব মন্দির ও ষষ্ঠীতলা।

■ ইছাপুরে রয়েছে মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়। ঠিকানা ঃ চড়কতলা, ইছাপুর। এর সভাপতি আশিসকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদিকা ও প্রতিষ্ঠাত্রী—শ্রীমতি শংকরী ঘোষ।

(তথ্যসংগ্রহ ঃ কল্যাণ মুখোপাধ্যায়)

পত্র-পত্রিকা—সম্পাদক

ইছাপুর নবাবগঞ্জে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হলো প্রতিচ্ছবি—ভোলা ঘোষ ও পরেশ চক্রবর্তী; টাউনক্লাব— অমর চৌধুরি; সূর্যবীজ—কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী ও অসীম ত্রিবেদি; শহরতলী—নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়; পদাতিক—শ্যামল সাহা; নচিকেতা—উৎপল ত্রিবেদি; নিরীক্ষণ—জয়দেব ভট্টাচার্য; আবহ—রঞ্জিত বণিক; বৈশাখী—উৎপল সরকার; পটভূমি—হিমাংশু দে ও রনজিৎ বণিক; আগামী—জ্যোতিপ্রকাশ সাহা; কুহেলিকা—সুব্রত চট্টোপাধ্যায়; নবাবী—উৎপল সরকার; বিশে একুশে—দীপক জোয়ারদার; মাসিক বিচিত্রা— প্রশান্ত সেনগুপ্ত ও অমর রায়; পথিক—উৎপল ত্রিবেদি; অন্যকলম—হিমাংশু দে; অন্যভূমি—উৎপল সরকার; কবিতার কাগজ—এককড়ি ভট্টাচার্য।

(তথ্যসংগ্রহ ঃ হিমাংশু দে, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়)

উপাসনালয়, সুইমিং সেন্টার, স্কুল

ইছাপুরের জনবসতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বার

প্রভৃতি।

মন্দির ঃ ইছাপুর অঞ্চলে শিবমন্দির, কালীমন্দির, শনিমন্দির দেখতে পাওয়া যায়। এখানে রয়েছে শ্রী রাধা-গোবিন্দের মন্দির। ইছাপুরের মানিকতলা অঞ্চলে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জিউ ও শ্রীশ্রী গৌরগোপালগদাধর জিউ আশ্রম নিত্য পূজা-অর্চনা ছাড়াও রাস পূর্ণিমা, ঝুলন, দোলযাত্রা উপলক্ষে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

মসজিদ ঃ কণ্ঠাধার এলাকায় ১নং মসজিদ, ২নং মসদিজ ও ৩নং মসজিদ, ইছাপুর সোঁদলাপাড়া ট্যাঙ্ক এলাকায় মসজিদ রয়েছে।

গির্জা ঃ ইছাপুরের মাত্র একটি গির্জা আছে, নয়াপাড়া এলাকায়, নাম অ্যাসেমব্লি অফ নো গড চার্জ।

গুরুদ্বার ঃ ইছাপুরে শিখ ধর্মাবলম্বীদের ২টি গুরুদ্বারের কথা জানা যায়। একটি গোয়ালাপাড়ায়, অপরটি রেল স্টেশনের কাছে। বর্তমানে গোয়ালাপাড়ার গুরুদ্বার বহুদিন ধরে বন্ধ আছে।

সেবাসংঘ ঃ ইছাপুর ফাঁড়ির পিছনের দিকে অবস্থিত 'রামকৃষ্ণ সেবাসংঘ'। এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

নোয়াপাড়া সুইমিং সেন্টার

এই সুইমিং সেন্টারের যাত্রা শুরু ১৯৮৫ সাল থেকে। একঝাঁক 'কোনি' সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়ে আশিস সরকার ও প্রসেনজিৎ সরকার শুরু করেন সাঁতার প্রশিক্ষণ, কোচ অশোক পাল। প্রতিবছর আয়োজিত হতে থাকে সারাবাংলা প্রতিযোগিতা। ক্লাব কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত এলাকা করে সুইমিং পুল তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতির অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বহু প্রতিকুলতা সত্ত্বেও এই সুইমিং সেন্টারের সাঁতারুরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার পেয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদে ৮১ কিলোমিটার দীর্ঘ সন্তরণ প্রতিযোগিতা থেকে এবছর পদক পেয়েছেন শম্ভু মণ্ডল ও কনক বিশ্বাস।

ইছাপুর গার্লস হাইস্কুল

ইছাপুরের স্ত্রী শিক্ষা প্রসারকল্পে গঠিত হয় ইছাপুর গার্লস হাইস্কুল। ১৯৩৬ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি মাঝেরপাড়ায় চড়কপুকুরের ধারে তৈরি হয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়। সেসময় রাখালবাবু নামে এক ভদ্রলোক ওই জমিটি স্কুল বাড়ি তৈরির জন্য স্কুল কমিটির কাছে বিক্রি করেন বলে জানা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৪৫ সালে নতুন করে ৩জন শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ৬টি ক্লাস শুরু হয়। এসময় প্রধান শিক্ষিকা নিযুক্ত হলেন সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়। ছাত্রী সংখ্যা বাড়তে থাকে। মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির পোস্ট অফিসে দোতলার ঘর ভাড়া করে ক্লাস হতে থাকে। এরপর আরোও তিনটি ক্লাস খোলা হয়। এসময় শিক্ষিকাদের মাইনে

দেওয়া হতো কমিটি মেম্বারদের নিজেদের পকেট থেকে।

এরপর জুনিয়ার স্কুলটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করার জন্য কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির চেষ্টায় মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরির অনুমতি নিয়ে ও সরকারি অনুমোদন নিয়ে ১৯৫২ সালে নর্থল্যান্ড এলাকায় স্কুল তৈরি হয়। এসময় প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য। ১৯৫৪ সাল নাগাদ মধ্যশিক্ষা পর্যদের অনুমোদন লাভ করে স্কুলটি ইছাপুর গার্লস স্কুল নামে পরিচিত হয়। ১৯৬৫ সালে কলা ও বিজ্ঞান শাখা এবং ১৯৬৭ সালে গৃহবিজ্ঞান শাখাসহ একাদশ শ্রেণী স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৭৯ সালে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগ সহ দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলে পরিগণিত হয়।

শ্রী আশুতোষ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির একমাত্র পুত্র বিভূকিঙ্কর ইছাপুর ফাঁড়ির বিপরীতে খালসা পুকুরে ডুবে মারা গেলে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রী আশুতোষ ঘোষ স্কুলবাড়ি নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে তৈরি হয় বিভূকিঙ্কর পাঠশালা। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। স্কুল এ আর পি সেন্টারে পরিণত হয়। স্কুল অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৪৫ সাল নাগাদ স্কুল পুরোপুরি চালু হয়। ১৯৫৬ সালে সেকেন্ড ক্লাস জুনিয়ার হিসেবে, তারপর ফোর্থ ক্লাস জুনিয়ার হিসেবে স্কুল শুরু হয়। ১৯৫৯ সালে মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৬৫-তে উচ্চমাধ্যমিক পড়ানোর অধিকার লাভ করে। স্কুল বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ খোলার অনুমতি পায়। ১৯৭৬ সালে শুরু হয় দ্বাদশশ্রেণী। ১৯৯৫ সাল থেকে বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগসহ উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়।

তথ্য সংগ্রাহক : পত্রালি গুহ

শ্রীধর বংশীধর হাইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা (১৯১৩)

১৯১৩ সালে ৩১ মার্চ নবাবগঞ্জ শ্রীধর বংশীধর হাইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪২জন।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর

■ সেকালের বারাকপুরের চিড়িয়াখানা—১৮০ বছর আগেকার সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন

সমাচার দর্পন

২৫ অগষ্ট ১৮২১ । ১১ ভাদ্র ১২২৮

চাণক — মোকাম চাণকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানাদেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্তু আছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য বোধ না হয় এমতলোক নাই যেহেতুক সকল দেশে সকল নাই। ঐ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এতদ্দেশীয় দুই তিনপ্রকার আছে ও অন্য ২ দেশীয় নীলসা নামে একপ্রকার হরিণ আছে সে ঘটকের মত উচ্চ ও অতি দুর্ব্বিৃত্ত ও অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং শ্বেতবর্ণ একপ্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। চট্টগ্রাম নিকটস্থ পার্ব্বতীয় চারিপাঁচ গরু আছে তাহার দিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না। সে গরু অত্যুচ্চ ও কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহৎ শৃঙ্গ অদ্ভুতাকার দেখা যায়। এবং ইংগ্লন্ডীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর অতিশয় সুখস্পর্শ। ব্রাঘ্র চারিপাঁচ প্রকারের দশ বারোটা আছে তাহার মধ্যে একস্থানে এক কৃষ্ণবর্ণ ব্রাঘ্র আছে। আর এক স্থানে এইদেশীয় বৃহৎ তিনটে ব্রাঘ্র থাকে। অন্য এক স্থানে এক ব্রাঘ্র আছে তাহার গায় গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন।

একস্থানে সিংহের স্ত্রীপুরুষ দুই আছে তাহার বয়স দেড় বৎসর সে পাণ্ডুবর্ণ নির্ম্মল শরীর তাহার লাঙ্গুল গোলাঙ্গুলাকৃতি কিন্তু অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহাদের কথানুসারে সে চলে। ছোট২ চারি পাঁচ ব্রাঘ্র আছে তাহার মধ্যে একটা ব্রাঘ্র সে খোলাসা ও মনুষ্যের দ্বেষ করে না ও সে মনুষ্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। এবং শুনা যায় শ্রীশ্রীযুত যখন সীকার দেখেন তখন ঐ ব্রাঘ্র সীকার করে। দুই তিনটা স্যাগস আছে তাহারা খাটে শয়ন করে তাহাদের শরীরে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাঙ্গরু নামে নবহলন্ডীয় এক জন্তু সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে ছোট জাতি একটা ও অন্যস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখে দুই পা অতি ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল ও পশ্চাদের দুইপা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে

পায়ে তিনটা নখ। সেই জন্তুর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভ হইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গর্ভে প্রবিষ্ট হয় সেকথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষঃস্থল অবধি তলপেট পর্যন্ত একটা থৈলীর মতো আছে তাহার স্তনও সেই থৈলীতে আবৃত ঐ বাচ্ছা সেই থৈলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা মত বাহির হইয়া থাকে। সে হউক সে অতি আশ্চর্য বটে এমত কোন জন্তুর নাই।

আর দুই তিনটা জন্তু উটের মতো আকৃতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান। আর এক গণ্ডারের বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খড়্গ প্রকাশ রূপে অদ্যাপি ওঠে নাই কিন্তু নখুদ হইয়াছে সে অতি শান্ত অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয়। তাহার শরীরে লোম নাই ও অতি কঠিন শরীর। আর গর্দ্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে সে পীত বর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর লোকে কহে যে ঐ ঘোড়া একদিনের মধ্যে পঞ্চাশ ক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ কদ্যাপি তাহার উপরে সওয়ার হয়নাই। এবং তিন চারি পাঁচ ভালুক ও দুই তিন প্রকার বানর ও দুই তিন প্রকার বিড়াল আছে। এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি কোমল তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহার গলা অতি দীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মতো তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিয়া মারে আর নবহলণ্ডীয় একপ্রকার হংস আছে সে নীল বর্ণ ও তাহার ওষ্ঠ রক্তবর্ণ ও সে অতি মনোহর আর নূতন ২ অনেক ২ প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম সকল জানা নাই।

■ पहली गोली बिन्दी तिवारी ने चालाई थी

गत पहली जनवरी बैरकपुर के भगत सिंह पार्क में एक मासिक पत्रिका 'सामाजिक न्याय समाचार' के लोकार्पण के वक्त बैरकपुर छावनी के अध्यक्ष माननीय ब्रिगेडियर एस. चौधरी जी ने, जहां मुख्यातिथि भारतीय भाषा परिषद के डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय जी भी मौजूद थे, सभी को यह कहकर चौंका दिया कि १८५७ के मंगल पांडेय के पहले इसी बैरकपुर में बिंदी तिवारी ने १८२५ में आजादी के लिये पहली गोली चलाई। वो थी (तिवारी) बैरकपुर छावनी के एक फौजी (सिपाही) थे। वैसे बैरकपुर स्थित 'रेसकोर्स' के पास बिंदा बाबा का अभी भी मंदिर है जो बिंदी तिवारी थे, जहां स्थाई रूप से पुजारी नियुक्त है। उस मंदिर से संलग्न एक बजरंगबली का भी मंदिर है।

मैने ब्रिगडियर एस. चौधरी से मिलकर साक्षात्कार के जरिये पूरी कथा सरकारी दस्तावेज के अनुसार सुनी और टेप रिकार्डर में टेप किया ताकि कोइ भी शब्द या प्रसंग छूट ना जाये और लिख डाला। बात

१८२४ की है। उस वक्त बैरकपुर में तीन नेटिव इनफेंट्री की बटालियन इंडियन ग्रुप के नाम से जानी जाती थी। सारी फौज ईस्ट यू.पी. और बिहार की थी, जिसमें अधिकतर संख्या ब्राह्मणों की थी। इसके बाद राजपूत भी कुछ थे और कुछ मुस्लिम भी थे।

१३/१०/१८२४ को तीनों इनफेंट्री को जिन्हें कोर कहा जाता था, को आदेश दिया गया कि सभी को 'चिटगांव' मार्च करना है। उस समय फौजियों के दिमाग में एक बात यह थी कि उनकी कुछ प्रथानुसार जैसे वे 'ब्रह्मपुत्र' नदी के उस पार जायेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जायेगा। वो लोग ये मांग कर बैठे कि अगर हमें जाना ही पड़ेगा तो हमलोगों को बैल और बैलगाड़ियां मुहैया करायी जाये, क्योंकि उन दिनों फौजियों को बैल और बौलगाड़ियां खरीदनी पड़ती थीं। उन्होनें यह भी मांग की कि हमारा 'नैकसाथ' (पीठ पर लादने वाला थैला) जिनके लिये उनकी तनख्वाह से दो रूपये के हिसाब से काटा गया था (उन दिनों दो रूपये एक मायने रखता था) उन्हें तथा नैकसाथ सरकारी खर्चे से मिलना चाहिए। अंग्रेज इन हिन्दुस्तानी सिपाहियों के प्रति इतने लापरवाह रहते थे कि उनकी छोटी-छोटी लापरवाही सैनिकों की विद्रोह पर ले आई और अंग्रेज आदत के मुताबिक आदेश पर आदेश दिये जा रहे थे। ये फौजी उन आदेशों को मानने से इनकार कर रहे थे, इनमें सक्रिय्य भूमिका ४७ नेटिव इनफेंट्री की थी और उनमें एक सिपाी था 'बिंदी तिवारी।' उन्होंने यह कह दिया कि हमलोग १३ नहीं २३ अक्टूबर को जायेंगे तो उनके कमांडिंग अफसर ने उन्हें ४०००/- (चार हजार) रूपये बैल और बैलगाड़ी खरीदने के लिये दिये, लेकिन दूसरा सावाल यह उठा कि बैलगाड़ी चलाने वाला भी होना चाहिए? अपनी मांग पूरी न होने के वजह से इनलोगों ने जाने से इनकार कर दिया। यह सब अंग्रेजों के लापरवाही के कारण हुआ। ऐसी हालत में गवर्नर (राज्यपाल) उन दिनों बैरकपुर के गवर्नर हाउस में रहते थें। यह गवर्नर हाउस बैरकपुर में आज भी है और आज के गवर्नर (पश्चिम बंगाल के) भी कभी कभी आकर थोड़ी देर के लिये रहते हैं। ये सारी बातें गवर्नर के कान नें गयी, तो उन्होने कमांडर इन चीफ मेजर जनरल डालवेल को समस्याओं से निपटने के लिये कहा। इधर इन तीनों बटालियनों ने ३०/१०/१८२४ को जाने से बिलकुल इनकार कर दिया तो खलबली मंच गयी। डालवेल ने दमदम जहां इनका तोपखाना था, से तोपखाना बटालियन मंगा ली

और कलकत्ता से एक बटालियन जो पलता जा रही थी, बुला लिया गया और भी एक बटालियन बुला लीं गयी। उन्हें बैरकपुर लाट बगान में रखा गया राजभवन के पास और बांकी फौजें बैरकपुर बेस अस्पताल के पास रखी गयी। तोपखाना अरदली बाजार के पास एयरफोर्स के सामने रखा गया। तब अचानक हुआ यह कि उसी तोपखाने से एकाएक फायर होना शुरू हो गया। इस समय वहां के अफसर तो थे ही नहीं, क्योंकि अफसर विद्रोहियों के डर से इधर उधर भाग गये थे और इस तरह तोपखाने के हमले से वाहर से आई फौजें भागने लगीं। कुछ सैनिक तो पास के हुगली नदी में भागते हुए डूबकर मर गये।

कुछ ही दिन बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह के लिये इनके विरूद्ध 'कोर्ट मार्शल' बिठा दिया। बारह विद्रोही सैनिकों को फांसी का आदेश दिया गया और बाकी को जेल की सजा हुई। बाद में दो साल बाद जेल वाले कैदियों की सजां माफ हो गयी और ३/११/१८२४ को उन बारह जनों में एक सिपाही के नाम की गड़बड़ी के बजह से ११ सिपाहियों (हिन्दुस्तानी) को कटघरा वनाकर बैरकपुर पैरेड ग्राउंड में फांसी लगा दी गयी और सबकी लाशें पास के हुगली नदी में फेंक दी गयीं। बाद में उस तोपखाने वाले विद्रोह की अंग्रेजों ने अच्छी तरह तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ३१/१०/१८२४ से १/११/१८२४ तक दो दिनों तक जो चार्ज संभाल रहा था, वह सिर्फ एक प्लेन सिपाही ही था और वह दे दिन का अपनी मर्जानुसार कमांडिंग अफसर बन गया था। उसका नाम था बिंदी तिवारी। यह विद्रोह था। जिस अंग्रेज अफसर ने इस केस की तह तक खोज की उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये विद्रोह गलत नहीं था, क्योंकि ३१/१०/१८२४ को विद्रोहियों ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र दिया था जिसका सारांश यह है कि 'हमारा जनेऊ (जिन्हें वो तुनुर कहते थे) बहुत पुराना हो गया है, तीन धागों के गंदा होने के बावजूद हम पहनना चाहते हैं।' कहने का तात्पर्य यह था कि आप हमारे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। पहले तो लफड़ा था 'बैल की सवारी का' दूसरी और हमें तो नाव पर सफर करने को कहा जा रहा था।

३/११/१८२४ को सभी ११ जनों को तो फांसी हो गयी थी। सिर्फ बिन्दी तिवारी भाग गये थे। अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी कि जो उस भागे सिपाही को पकड़ेगा उसे सरकार की ओर से १० (दस) रूपये इनाम मिलेगा। (उन दिनों दस रूपये की एक अलग हैसियत होती थी)।

उसी बीच ७/११/१८२४ को रात के वक्त बिंदी तिवारी अपने एक साथी से मिलने आया। किसी ने यह भेद जाहिर कर दिया। और बिंदी तिवारी पकड़े गये। उससे पूछा गया कि अपने दो दिन तक कमांड का भार संभाला था। तिवारी जी ने हां कहकर स्विकार किया। सभी को तो मामूली फांसी हुई थी, लेकिन बिंदी तिवारी को जंजोरों में जकड़ कर फांसी लगायी और बाकी बागियों को नसीहत देने के लिए फांसी का कटघरा पूरा का पूरा उखाड़कर लाश सहित, जहां फिलहाल बिन्दी तिवारी उर्फ बिन्दा बाबा का मंदिर है वहां सामने रास्ते पर लगा दिया गया। रिकार्ड के अनुसार दो महीने तक उनकी लाश चील कैवे खाते रहे।

इसी बीच भारतीय सिपाहियों ने उन्दें शहीद घोषित कर दिया। रात को चुपके चुपके वे सिपाही वहां फूल, माला आदि रख आते थे, कभी कभी अगरबत्ती वगैरह भी जला जाते थे,। अंत में अंग्रजों ने देखा कि अब विद्रोह दूसरा रंग ले सकता है, तब झटपट उन्होंने लाश को पास के हुगली नदी में फेंकवा दिया। ये सारी बातें लिखित एवं सरकारी रिकार्ड में है। लेकिन स्थानीय लोगों में बिंदी तिवारी उर्फ बिंदा बाबा के प्रति एक किंवदंती है कि फांसी के बाद विदाबाबा की आत्मा बहुत महकती रही। अंग्रेजों को भी काफी सताती रही। अंत में यूपी से बिन्दाबाबा की माताजी को बुलाकर जब उनका श्राद्ध वगैरह किया गया, तब जाकर उनकी आत्मा शांत हुई और उसी समय भारतीय फौजियों द्वारा उनकी मंदिर की स्थापना हुई। मूर्ति लगी। यह मंदिर आज भी है, विंदाबाबा पूजे जा रहे हैं। लोगों की वहां मनौतियां भी पूरी होती हैं। कुछ ने तो अपने बच्चे का मुंडन भी वहां उस मंदिर में करा दिया है।

बैरकपुर छावनी का यह पहला विद्रोह था। यह भारतवर्ष में पहला विद्रोह माना जाना चाहिए। क्योंकि बिन्दी तिवारी से मंगल पांडे प्रेरित होकर विद्रोह किये १८५७ में। आज विंदाबाबा का नाम बैरकपुर में ही लोग जानते है। जबकि पूरे हिन्दुस्तान को जानना चाहिए था। यह घटना इतिहास में अविदित ही रह गयी है। बैरकपुर की इसी बलिदानी मिट्टी से १८५७ की ज्वलायें धधकीं। मंगल पांडे पैदा हुए। बैरकपुर में ही राष्ट्रगुरू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जन्मे, बैरकपुर सबडिवीजन में बंदेमातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र बाबू का जन्म हुआ। इससे प्रेरित होकर पूरे भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक शहीद पैदा हुए और हंस हंस कर

फांसी पर झूले। अंत में १५ अगस्त १९४७ को हम आजाद हो गये और क्रांतिकारियों और पूरे देशभक्त सपूतों के लिये बैरकपुर बन्दनीय बन गया।

कैलाश बैरकपुरी

Courtesy–विश्वमित्र २६ जनवरी १९९७

■ বারাকপুরের বুকে "ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার আর্কাইভস্ অব্ ইন্ডিয়া"

প্রতীক রায়

বারাকপুর স্টেশন থেকে দুই-আড়াই কিলোমিটার দূরে 'ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার আর্কাইভস্ অব্ ইন্ডিয়া'—ভারতের সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র, নাট্যমঞ্চ ও আনুষঙ্গিক শিল্পকলার সংগ্রহশালা। কেবলমাত্র সংগ্রহশালাই নয়, প্রায় দশ বিঘা জায়গার উপর কমুনিটি হল, পাঠাগার, প্রদর্শনী কক্ষ, গবেষণাগার, মিনিয়েচার থিয়েটার, অংকন বিভাগ, জনসংযোগ বিভাগ। এছাড়াও যে-সমস্ত শিল্প-কর্মীরা গবেষণা করবেন তাদের জন্য অস্থায়ী আবাস, খেলাধূলার স্থান, হোটেল। অর্থাৎ শিল্প জগতের সংশ্লিষ্ট মানুষদের জন্য একটি আলাদা জগৎ। জাতির শিল্প-সংস্কৃতির 'নালন্দা'।

হ্যাঁ,—এই রকমই একটি বিশাল পরিকল্পনা ১৯৫৬ সালে তৈরী করা হয়েছিল তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের শিল্পকলার ধারক-বাহক-প্রচারক 'সংস্কৃতি-পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে। মুলতঃ সে-সময়ের শিল্প-সংস্কৃতির অদ্বিতীয় বাংলা মুখপাত্র 'রূপ-মঞ্চ-এর সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়, এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক অসিত চৌধুরীর উদ্যোগে সিনেমা ও নাট্যজগতের শিল্পী, কলাকুশলী এবং শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমী অসংখ্য মানুষের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় তৈরী হয়েছিল এই পরিকল্পনা। অতীতকে ধরে রাখতে, বর্তমানকে সযত্নে তুলে রাখতে এবং ভবিষ্যৎকে আরও সুন্দর করে তুলতেই এই বিশাল উদ্যোগ।

অসিত চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক এবং কালীশ মুখোপাধ্যায়কে সংগঠক সম্পাদক করে কাজ শুরু হয়। সংস্কৃতি-পরিষদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতায় এতবড় কর্মযজ্ঞ, এত বিশাল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয় বিবেচনা করেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু প্রথমে পত্র মারফৎ এবং পরে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেও দীর্ঘদিন কোন সুফল পাওয়া যায় না। তখন সংগঠক সম্পাদক খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের শরণাপন্ন হলেন। খাদ্যমন্ত্রীর সহায়তায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এব্যাপারে অবহিত হন এবং আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ই মার্চ

সংস্কৃতি-পরিষদ তাদের পরিকল্পনার ব্যাপারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শুভেচ্ছা জ্ঞাপক অভিমত লাভ করে।

১৯৫৯ সালে রবিতীর্থ, সুভাষ সংস্কৃতিসদন এবং বিধানসংগ্রহশালা (ডাঃ রায় অবশ্য সংস্কৃতি পরিষদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সন্তুষ্ট হয়ে ১৯৬১ সালে ২৪শে জুলাই সংগ্রহশালার সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করার সম্মতি দান করেন) স্থাপনের পরিকাঠামো সরকারের কাছে পেশ কার হয়।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শক্রমে শহরতলীর কোন অনুন্নত স্থানে এই কৃষ্টি কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয় এবং অনেক জায়গার মধ্য থেকে ডাঃ রায় স্বয়ং নির্বাচন করেন বারাকপুর পৌর এলাকার অন্তর্গত নোনাজাফরপুরের শান্ত গ্রাম্য পরিবেশকে। এই স্থানটি বারাকপুর স্টেশনের উত্তর-পূর্ব দিকে দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে জাফরপুর রোডের পূর্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানটি নির্বাচনের পিছনে কতকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ এই স্থানটি কলিকাতা, বারাসত এবং কল্যাণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এবং উপযুক্ত রাস্তাঘাট থাকায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ এখানকার পরিবেশ বেশ শান্ত এবং সবুজের যথেষ্ট সমারোহ এবং ভবিষ্যতে এর কাছাকাছি কোন কলকারখানা গড়ে উঠবার সম্ভাবনা নেই, যা কিনা এখানকার সুন্দর পরিবেশকে দূষিত করতে পারে।

স্থান নির্বাচন হ'ল। সরকারী সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্যক্তিগত উদ্যোগেই কাজ শুরু হ'লো। ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নোনাজাফারপুরের প্রস্তাবিত অঞ্চলে জমি সংগ্রহের কাজ শুরু হলো। পাশাপাশি চলতে লাগলো শিল্প-কলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য-প্রমাণাদি, নথি-পত্র সংগ্রহের কাজ। ঠিক করা হলো সরকারী সাহায্য পেলেই সংগ্রাহকদের কাছ থেকে জমি এবং অন্যান্য সংগৃহীত জিনিসপত্র সঠিক মূল্যে কিনে নেওয়া হবে। এইভাবে প্রায় ৬ বিঘার মতো জমি সংগৃহীত হ'লো, এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগেই শিল্পকলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি, নথিপত্র সংগ্রহ করা হতে লাগলো।

কেবলমাত্র কি নথি-পত্র সংগ্রহের কাজ। ডাঃ রায়ের পরামর্শে এবং কালীশ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে চলতে লাগলো চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস রচনার কাজ। আর এই সমগ্র পরিকল্পনা, তার অগ্রগতি, এই পরিকল্পনার সামগ্রিক রূপায়ণে শিল্পপ্রেমী জনগণের সহযোগিতা প্রার্থনা অর্থাৎ এই পরিকল্পনা বিষয়ক যাবতীয় ব্যাপারে জনগণকে অবহিত করা এবং তাদের সহযোগী করে তোলার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলো তখনকার দিনের শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক জনপ্রিয় পত্রিকা 'রূপ-মঞ্চ'। 'রূপ-মঞ্চ'র সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় তার যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি বিসর্জন দিয়েছিলেন এই আর্কাইভস্ গঠনের উদ্দেশ্যে। মূল পরিকল্পনাটি ছিল দশ লক্ষ টাকার। মূল সংগ্রহশালাটি নোনাজাফরপুরে হলেও কালকাতা শহরে বিভিন্ন সংগ্রহের প্রতিলিপি

সম্বলিত প্রদর্শনশালা তৈরীর পরিকল্পনাও করা হয়।

প্রাথমিক অবস্থায় জাফরপুরে সংগৃহীত জমির উপর একটি চার কামরা বিশিষ্ট বাড়ী তৈরি করা হয়। সেখানে আর্কাইভস্'এর জন্য শিল্পকলা সম্পর্কিত যাবতীয় মূল্যবান সংগ্রহ জড় করা হতে থাকে।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের নির্দেশে ১৯৬২ সালে ১২ই জানুয়ারি সংগঠক সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় রবিতীর্থ, বিধানসংগ্রশালা এবং সুভাষ সংস্কৃতি সদনের জন্য আড়াই লক্ষ টাকার একটি ব্যয় বরাদ্দ সরকারের কাছে পেশ করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারী সাহায্যের আশ্বাস মেলে। কিন্তু পূর্ব গগনে নতুন দিনের সূর্য যখন উদীয়মান তখনই এক ভীষণ ভয়ংকর কালো মেঘে এসে ঢেকে দিলো পূবের রক্তিম নীল আকাশ। ঘনিয়ে এলো রাত্রির অন্ধকার। ১৯৬২ সালের ১লা জুলাই, মারা গেলেন সকলের প্রিয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাংলা তথা ভারতের বুকে নেমে এলো শোকের ছায়া। দেশবাসী একটি বিশাল মানুষকে হারালেন।

ডাঃ রায়ের মৃত্যুর সাথে সাথে অকুল পাথারে পড়লেন সংস্কৃতি-পরিষদের কর্মীরা। আর্কাইভস্ গঠনের পরিকল্পনায় যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁদের অনেকেই পিছিয়ে গেলেন। এতদিনের পরিশ্রমের ফসল মাঠে মারা যাবার ভয়ে সংস্কৃতি পরিষদের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। মানসিক বল হারিয়ে ফেললেন।

সংস্কৃতি পরিষদের সভ্যরা যখন স্বপ্ন ভঙ্গের আশংকায় ভীত, শিল্পপ্রেমী জনগণ যখন হতাশ, তখনই এগিয়ে এলেন সেই সন্ন্যাসী, যাঁর প্রচেষ্টাতেই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই আর্কাভাইভস্ গঠনের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলেন—অর্থাৎ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তখন ইনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চারিত হ'লো। আবার পূর্ণ উদ্যমে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নির্দেশে প্রথমেই 'ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আর্কাইভস্ অব্ ইন্ডিয়া' কে (বিধানসংগ্রহশালা) আইনানুগভাবে রেজিস্ট্রিকৃত করা হল (১৯৬৪)রে সঙ্গে সঙ্গে অবলুপ্তি ঘটলো সংস্কৃতি পরিষদ রূপান্তরিত হ'লো F.T.A.I.-এ (Film & Theatre Archives of India)

ইতিমধ্যে সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে। বাংলার চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পের আদিযুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্ভাব্য সমস্ত ঐতিহাসিক সম্পদরাজিই সংগৃহীত। এর মধ্যে আছে ঐতিহাসিক তথ্যাদি—দলিল পত্রাদি, বিভিন্ন নজির, স্থির চিত্র, পুরাতন নাটক, পুস্তক পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, ব্যবহৃত দ্রব্যাদি—নাটকের সেট, চিত্রনাট্যের প্রতিলিপি, হস্তাক্ষর ও চিঠি-পত্রাদি এবং চলচ্চিত্র ও নাট্যশিল্পের আনুসঙ্গি ক আরও অজস্র তথ্য। সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বহু সম্পদও সংগৃহীত। তাছাড়া পাঠাগার বিভাগের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত চলচ্চিত্র ও নাট্য বিষয়ক দুষ্প্রাপ্য পুস্তকাবলীও সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮, ১৬ বা ৩৫ মিলিমিটারের

চলচ্চিত্র ছাড়া চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত সংগ্রহই সমাপ্ত। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় যে, এই বিপুল সংগ্রহ দেখে এবং বিশাল পরিকল্পনার কথা শুনে হলিউডের সে সময়ের কর্ণধার আর্থার নাইট বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

F.T.A.I-এর কাছে এখন মূল সমস্যা হয়ে দাড়ালো এই বিপুল মূল্যবান সম্পদরাজির উপযুক্ত সংরক্ষণ। অবিলম্বে সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করতে পারলে বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত মূল্যবান সম্পদ পুনরায় অবলুপ্তির গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। তাই কেবলমাত্র সংরক্ষণের চিন্তা মাথায় রেখেই মাত্র ১,৫০,০০০ টাকার একটি ক্ষুদ্রতর পরিকল্পনা গৃহীত হল। যার মধ্যে ১ লক্ষ টাকা সাহায্য হিসেবে সরকারের কাছে আবেদন করা হলো এবং বাকী ৫০,০০০ টাকা নিজেদের উদ্যোগে সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হলো। সরকারি সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে সংগঠকরা নিজেদের সঞ্চিত অর্থ নিয়েই কাজে নেমে পড়লেন। নোনাজাফরপুরে তৈরি হলো লম্বা করিডোর যুক্ত পাঁচকামরা বিশিষ্ট একটি বাড়ি অর্থাৎ 'বিধান সংগ্রহশালা'।

রাজ্য সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই নোনাজাফরপুরের সংরক্ষণ কেন্দ্রটির উদ্‌বোধন করা হবে এই আশা নিয়ে স্তুপীকৃত সম্পদরাজি এবং শিল্পপ্রেমীরা দিন গুনতে লাগলো।

ওরা স্বপ্ন দেখেছিলো, সাগরের বুক থেকে তুলে আনা রত্নরাজি ছড়িয়ে দেবে মানুষের মাঝে। মাঝপথে হায়, ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্নগুলো হারিয়ে যায় স্বপ্নেরই মাঝে।

প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা মিললো না। এগিয়ে এলেন না কোন ধনকুবের। সংগৃহীত সম্পদরাজির মুক্তির কান্না কেউ শুনলো না। উদ্যোক্তারা নিরাশ হয়ে পড়লেন।

অনেক পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত সম্পদরাজীতো এভাবে বদ্ধ ঘরে ফেলে রাখা য়ায না। সংগঠক সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগ নিলেন। নির্মিত ঘরগুলিতে ক্ষুদ্রাকারে হলেও আর্কাইভস্ খোলার ব্যবস্থা করা হলো।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার তৎকালীন মেয়র গোবিন্দ দে এবং স্বনামধন্যা অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন উদ্বোধন করলেন তৎকালীন ভারতের একমাত্র নাট্য ও চলচ্চিত্র সংগ্রহশালার লাগোয়া একটি মুক্তমঞ্চ (সুভাষ মঞ্চ)। বারাকপুরের নাট্যদল শ্রীনাট্যমের তত্বাবধানে এবং কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সেখানে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা চলতে লাগলো।

কালীশ মুখোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত আর্কাইভস্‌ও জীবিত ছিলো। যদিও উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে বহু নথিপত্র নষ্ট হয়ে যেতে লাগলো। প্রচারের অভাবে আর্কাইভস্-এর গুরুত্বও হ্রাস পেতে লাগলো।

১৯৮৬ সালে রূপমঞ্চের রূপকার কালীশ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আর্কাইভস্-এরও বিলুপ্তি ঘটলো। মূল্যবান নথিপত্র যা অবশিষ্ট ছিলো তা এদিক -

ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। বারাকপুরবাসী গর্ব করার মতো একটা বিষয় থেকে চিরতরে বঞ্চিত হলেও কালীশ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগ এবং ত্যাগ শিল্প-সংস্কৃতি প্রেমী মানুষেরা চিরদিন মনে রাখবে।

তথ্যসূত্র : কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকা। শ্রী নাট্যম-এর কর্ণধার চিত্ত দত্ত। 'সুভাষ মঞ্চ' পত্রিকা। সম্পাদক—কালীশ মুখোপাধ্যায়। সৌজন্য সাগ্নিক, শারদীয় ১৪০৬, বারাকপুর

■ বারাকপুর মহকুমার পত্রপত্রিকা

(প্রথম খণ্ডে সত্তরটি পত্রপত্রিকার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এরমধ্যে ১৪টি পত্রিকা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত।)

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে প্রকাশিত আরো দুটি পত্রিকা : *বরাহনগর বার্ত্তাবহ* (পাক্ষিক, জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৮, ইং ১৮৭১) *এবং আর্য্যাবর্ত্তরীতিবোধিকা* (মাসিক, আশ্বিন ১২৭৮, ইং ১৮৭১) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে প্রকাশিত

নাম	সম্পাদক	স্থান
সাংস্কৃতিক সমধ্বন	ডাঃ বিমলকান্তি রায়	খড়দহ
সপ্তাশ্ব	দিলীপকুমার বসাক	খড়দহ
বঁইচি	রঞ্জীব চক্রবর্তী (একটি সংখ্যায় অভিজিৎ লাহিড়ি)	খড়দহ
পথ	সুবীর মুখোপাধ্যায়	রহড়া
সিন্ধুসারস	তন্ময় রুদ্র	রহড়া
স্বরান্তর	দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক অরূপরতন হালদার	রহড়া
বয়ঃসন্ধি	তথাগত মুখোপাধ্যায়	রহড়া
দুমদাম এবং ২৫শে বৈশাখ	শমীন্দ্র ভৌমিক	রহড়া
মোহনা	দুলেন্দ্র ভৌমিক	রহড়া
ঋত্বিক	অসীম পাল	রহড়া
প্রজ্ঞানগর	অমিতাভ ভট্টাচার্য	রহড়া
আন্তর্জাতিক ছোটগল্প	সুখেন্দু ভট্টাচার্য	রহড়া
কৌশিক	শরণ্য দত্ত	নৈহাটি
উপলব্ধি কথা	কেশবরঞ্জন দে	শ্যামনগর

অবয়ব	রঞ্জিত মালো	শ্যামনগর
লেখা দিয়ে রেখাপাত	বিশ্বেন্দু চক্রবর্তী	বিজয়নগর নৈহাটি
অন্বেষণ	মনোরঞ্জন মজুমদার	বিজয়নগর, নৈহাটি
তৃষ্ণা	শমিত কর্মকার রমেশ গোস্বামী	কাঁচরাপাড়া
ব্যাস	মৃণালেন্দু দাস	কাঁচরাপাড়া
বাতিঘর	সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	কাঁচরাপাড়া
দেবশিশু	অজয় মজুমদার	হাজিনগর
ছোটগল্প ঃ নবনিরীক্ষা (প্রকাশনায়)	অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত সমরেশ বসু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সোমনাথ ভট্টাচার্য সমীরণ দাশগুপ্ত	নৈহাটি
আজকাল	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী	নৈহাটি
কয়েকটি কণ্ঠস্বর	সুমিত তালুকদার	নৈহাটি
মহাজন	ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়	নৈহাটি
রচিষ্ণু	পিনাকী দাশগুপ্ত নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত	নৈহাটি
অধুনা সাহিত্য	ঋষিকেশ মুখোপাধ্যায়	হালিশহর
অক্ষক্রিয়া		ভাটপাড়া
সন্ধানী	নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	বারাকপুর
একক	স্বপন ঘোষ	বারাকপুর
রূপক	বিক্রমজিৎ সেন	বারাকপুর
কলাম	রাজদ্বীপ ভট্টাচার্য	বারাকপুর
কস্তুরী	জয়ন্তকুমার সাহা	বারাকপুর
বলাকা	ধনঞ্জয় ঘোষাল	আড়িয়াদহ
বকমবকম	বিপ্রতীপ দে	সোদপুর
আলোকধারা	চম্পক দেবনাথ	সোদপুর
আগামী প্রজন্ম	হারাধন ভট্টাচার্য	পাণিহাটি
অবেক্ষণ	রাধু গোস্বামী	সোদপুর
আবার এলাম	স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	পাণিহাটি

আজকের সংলাপ	রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়	আগরপাড়া
	সঞ্জয় অধিকারী	
আলোচনা চক্র	চিরঞ্জীব শূর	বেলঘরিয়া
কস্তুরী	জয়ন্তকুমার সাহা	তালপুকুর
প্রবীণ আলেখ্য	সুকুমার চক্রবর্তী	মণিরামপুর
	প্রভাতকুমার বসু	
	শরৎচন্দ্র নন্দ	
অতএব ভাবনা	শংকর সরকার	নিমতা
অনুভব	অরুণ ব্যানার্জি	নিমতা
উত্তরণ	অনিমেষ চক্রবর্তী	নিমতা
একা	অধীর ভদ্র	নিমতা
দেবতা বারোমাস	সুভাষ সরকার	নিমতা
কালপত্রী	অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	নিমতা
তূণীর	অসীম বসাক	নিমতা
বালার্ক	সুধীন বসু	নিমতা
দৃক	অপূর্ব কর	নিমতা
একটুকু	অরুণাভ ভট্টাচার্য	নিমতা
চই চই	জয়ন্ত শূর	নিমতা
মেঘবর্ণ		নিমতা
মেঘমল্লার	শম্ভুনাথ রায়	নিমতা
চিত্রক	পার্থপ্রিয় বসু	দমদম পার্ক
লোকায়ত	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	দমদম
সূর্যোদয়ের পথে	অঞ্জলি দাস	আড়িয়াদহ
এই সহস্রধারা	শংকর রায়	বরানগর
বাক	সুজয় ভট্টাচার্য	বরানগর
বলাকা	ধনঞ্জয় ঘোষাল	আড়িয়াদহ
উপাংশু	শ্যামলকুমার বিশ্বাস	শ্যামনগর
অবমানব	সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নৈহাটি
অন্বেষণ	মনোরঞ্জন মজুমদার	নৈহাটি
মহাজন	ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়	নৈহাটি
সাপ্তাহিক জনবার্তা	দেবাশিস রায়	কাঁচরাপাড়া
নৈহাটি বার্তা	জয়ন্ত পালচৌধুরি	নৈহাটি
মুখোমুখি	অনিল পাল	বিজপুর

তথ্যসূত্র : বাংলা সাময়িক পত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র; সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার, রহড়া; নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বার্তালিপি); অশোকরঞ্জন সেনগুপ্তের সহযোগিতায়; হিমাংশু দে (অন্য কলম); অতএব ভাবনা।

■ পলতা মেকানাইস্‌ড ব্রীক ফ্যাক্টরি

(HOUSING DEPT. GOVT. OF WEST BENGAL)

নারায়ণচন্দ্র সাহা

এই ব্রীক ফ্যাক্টরির মূল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার হোতা ছিলেন বাংলার রূপকার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়। উদ্দেশ্য ছিল, কলকাতার বৃহত্তর জলসরবরাহ প্রকল্প পলতা ওয়াটার ওয়ার্কসের সেট্‌লিং ট্যাঙ্কের বা ঝিলের পলির সদ্‌ব্যবহার। সেট্‌লিং ট্যাঙ্ক বা ঝিলের তলায় যে পলিমাটি জমে উঠে, সেই পলিমাটি কেটে তুলে পাড়ে জমিয়ে রাখতে হত। সেই পলিমাটি যথা সময়ে সরিয়ে না ফেললে খুবই সমস্যার সৃষ্টি হত। তাছাড়া তা অন্যত্র সরাতে গেলেও আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা ও যানবাহন ইত্যাদির সমস্যাও দেখা দিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডা: বিধানচন্দ্র রায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, ওয়াটার ওয়ার্কসের পাশেই একটা ব্রীক ফিল্ড তৈরি করলে তাতে করে ইটও তৈরি হবে, বাজারে বিক্রয় করে কিছু রোজগারও হবে এবং সেট্‌লিং ট্যাঙ্কের পলির সমস্যাও মিটবে।

সেইমত ডা. রায়ের নির্দেশে চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে কোলাবরেশনে এই ব্রীক ফ্যাক্টরি গড়ে উঠে ১৯৬৩-৬৪ সালে। তখন এর নাম ছিল, ব্রীকস্ এ্যান্ড টাইলস্ বোর্ড। পরে ১৯৬৭ সাল নাগাদ এটা ডাইরেক্টর অব ব্রীক প্রডাকশনের অধীনে চলে আসে। এর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে। এখন ফ্যাক্টরির এরিয়া, প্রায় ২৯.০৫ একর।

বর্তমানে এখানে কর্মী সংখ্যা প্রায় চারশ' (অফিস ও বহির্বিভাগ সহ)

১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত যে ইট তৈরি হত তার আকার ছিল ১০"x৫"x৩" (দশ x পাঁচ x তিন ইঞ্চি)। এরপর (Modular) মোডুলার ইট তৈরির সিদ্ধান্ত অনুসারে তার আকার করা হয় ৮"x৪"x৪" (আট x চার x চার ইঞ্চি)।

এই ইট সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এই ইটের গঠন, আকার, আকৃতি স্থায়িত্বে অন্য যে কোনও ইটের তুলনায় অনেক ভাল ও উন্নতমানের।

এই মোডুলার ইট শুধু ভারতবর্ষেরই নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই নয়, ভারতের বাইরেও রপ্তানী করা হচ্ছে; যেমন—সৌদিআরব, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে। এর মাসিক উৎপাদন, এখন প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ (ফিনিস্‌ড/ বিক্রয় উপযুক্ত)। এই ইট পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, এছাড়া রেড ব্যাটস্ ও ঝামা ব্যাটস্ পাওয়া যায়।

শ্রেণী হিসাবে মূল্য নিম্নরূপ ঃ

১। স্পেশাল ক্লাস—২৬৭৩.০০ টাকা (ট্যাক্স সহ প্রতি হাজার)

২। ক্লাস 'এ'—২৪৬৪.০০ টাকা ”
৩। ক্লাস 'এ' পিক্‌ড—২৫১৩.৫০ টাকা ”
৪। ক্লাস 'বি'—২৩৬৫.০০ টাকা ”
৫। ক্লাস 'বি' পিক্‌ড—২৪৩৬.৫০ টাকা ”

(ক) ঝামা ব্যাট্‌স—২৭৫.০০ প্রতি কিউ মিটার

(খ) রেড ব্যাট্‌স—২২০.০০ প্রতি কিউ মিটার

এই ফ্যাক্টরিতে প্রথম থেকেই মাত্র দুটো মেসিনে আজও অবধি ৩৫ বছর ধরে ইট তৈরি হয়ে আসছে। অথচ যে দেশে এই মেসিন তৈরি হয়েছিল সেদেশে নাকি প্রথম এই মেসিনের পরিবর্তে আরও উন্নতমানের মেসিন ব্যবহৃত হচ্ছে। আজ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এই পুরানো মেসিন এখানের দক্ষ শ্রমিকরা নিজেরাই চালু রাখতে সচেষ্ট ও সক্ষম। মেসিনের যাবতীয় খুঁটিনাটি মেরামতি দক্ষ শ্রমিকরাই করে থাকেন। এইভাবেই তাঁরা ফ্যাক্টরির উৎপাদনের গতি রক্ষায় সদা জাগ্রত। এছাড়া পূর্বের তুলনায় ইটের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। এখন গ্রাহকরা আবেদন করলে প্রয়োজন মত ইট পাওয়ার কোনও অসুবিধা নাই। যারা এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল যে, এক সময় এই ফ্যাক্টরিতে মাত্র ৭৫ জন কর্মী ছিলেন রেগুলার পোষ্টে, অবশিষ্ট ১৭০ জন কর্মী ছিলেন (দৈনিক রোজে) অস্থায়ী হিসাবে। এরপর কর্মীদের দীর্ঘদিনের সক্রিয় প্রচেষ্টায় ১৯৭৭ সালে তাঁরা রেগুলার পোষ্টে স্থায়িত্ব পান।

লেখক পরিচিতি : বিশিষ্ট লেখক

■ বারাকপুর হবে 'ঐতিহ্যবাহী' স্টেশন

বারাকপুর, ১০ই নভেম্বর—১৩৮ বছরের পুরানো বারাকপুর রেলওয়ে স্টেশনকে 'ঐতিহ্যবাহী স্টেশন' হিসাবে সংরক্ষিত করা হবে। শুক্রবার রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই ঘোষণা করেছেন। তিনি এদিন এখানে কম্পিউটারাইজড রিজার্ভেশন টার্মিনালের উদ্বোধন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানেই সি পি আই(এম) সাংসদ তড়িৎ তোপদার বারাকপুর স্টেশনকে মডেল স্টেশন হিসাবে সংরক্ষণের জন্য আগামী বাজেটে অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান। তিনি শিয়ালদহ-লালগোলা সেকশনে যাত্রীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে রেলমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং দমদম স্টেশনকে অন্তত আংশিকভাবে প্রান্তিক স্টেশনে পরিণত করার দাবি জানান। —(গণশক্তি, ১১ নভেম্বর ২০০০)

■ বারাকপুর রোটারী ক্লাবের পক্ষ থেকে এবছরের Rotary International Award প্রদান করা হলো বারাকপুর গান্ধী মিউজিয়ামের নির্দেশক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সীকে, "For outstanding activities to the community throughout his life."

৬ অগস্ট ২০০০মণিরামপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাসভবনে একটি স্মৃতি-ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় শ্রী প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. ফুলরেণু গুহ, সাংসদ শ্রী তড়িৎবরণ তোপদার, বিধায়ক শ্রী মদনমোহন নাথ (কমিটির সভাপতি), উত্তর বারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান শ্রী মধুসূদন ঘোষ, স্থানীয় কাউন্সিলর শ্রী সমরেন্দ্র মোহন সান্যাল (সহ-সভাপতি), প্রাক্তন পুরপ্রধান শ্রী শিবধন মুখার্জি (সহ-সভাপতি) এবং মহাদেবানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ ড. দীপক সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী, অধ্যাপক কানাইপদ রায়, রোটারিয়ান শেখর ব্যানার্জি, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্য সেনগুপ্ত, শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তির সক্রিয় ভূমিকায় অনুষ্ঠানটি সাফল্য অর্জন করে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের উপর একটি শ্রুতিনাটক মঞ্চস্থ করে '(বারাকপুর) সাগ্নিক' নাট্যসংস্থা।

শহিদ শেখরের নিস্পন্দ হাতে দিদির রাখী

জম্মুর রজৌরি সেক্টরে দিদি মানি ঘোষ ভাই ক্যাপ্টেন শেখর ঘোষকে রাখী পাঠিয়েছিল। কিন্তু সে রাখী শেখর পরতে পারেনি। শনিবার ভোরে রাখীর তিনদিন আগে পাক হানাদার হঠাতে বীরের মৃত্যু বরণ করে শেখর। কিন্তু দিদির মন মানেনি। তাই রজৌরি থেকে সেনাবাহিনীর এই শহিদ বীরকে টিটাগড়ের রানী রাসমণি ঘাটে আনা হলে দিদি মৃত ভাইয়ের হাতেই রাখী পরিয়ে দিলেন। ... সওয়া নটা নাগাদ শহীদ শেখরকে রানী রাসমণি ঘাটে নিয়ে আসা হলো রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, সামরিক কায়দায় শেষকৃত্য করার জন্য। তারও আগে সকাল ৮টায় নোনাচন্দনপুকুরের জয়হিন্দ কলোনীতে সামরিক শকটে করে শেখরের কফিনবন্দী দেহটিকে আনা হয়। —সুনীতি মালাকার, সৌজন্য : সংবাদ প্রতিদিন, ১৫-৮-২০০০।

বারাকপুরে 'উদয়ন'-এর বালিকা শাখার উদ্বোধন করে তাদের মাঝে স্টিভ ও।

ছবি : অশোক মজুমদার।

সৌজন্য : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২-৪-২০০০

পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা ও সংবাদে

বারাকপুরের সেকাল একাল (প্রথম খণ্ড)

সংবাদ প্রতিদিন ঃ (১৫ নভেম্বর, ২০০০)

আঞ্চলিক ইতিহাসের দর্পণ—*কমলকান্ত পাল*

বিজ্ঞান-ঋদ্ধ যে কালে ই গ্রন্থের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনায় গ্রন্থলোক কম্পমান, সেই কালে তাথ্যিক সম্ভারে পুষ্ট পুস্তক প্রকাশনা দুঃসাহসের কাজ। এরকম একটি দুঃসাহসিক কৃতিত্বের পূর্ণ স্বল্পায়ত গ্রন্থ 'বারাকপুরের সেকাল একাল'। পশ্চিমবঙ্গের জেলা সমূহের অন্তর্গত অঞ্চলবিশেষের ইতিহাস এবং তার ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যবাহী পুস্তকের আজ একান্ত অভাব। কায়িক ও মানসিক প্রযুক্তি খাটিয়ে এই অভাব মেটানোর কাজে উৎসাহী মানুষের সংখ্যা যদিও অঙ্গুলিমেয়, তাহলেও সমালোচ্য পুস্তিকাটি এইরকম একটি প্রচেষ্টার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞান। অধ্যাপক কানাইপদ রায় এমনই একজন বিরল ব্যক্তি, যিনি সমমনস্ক অনুসন্ধিৎসুগণের সহযোগিতায় তাঁর আবাসভূমি বারাকপুরের শিরা-উপশিরায় অবাধে পরিভ্রমণ রত এবং নানা উপাচারে তথ্যের ডালি সাজিয়ে নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপহার দিচ্ছেন। হীরকদ্যুতিময় এই উপহার আন্তরিক ঔজ্জ্বল্যে বারাকপুরের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-বিস্তারী-আলোর সঙ্কেত—এ ভাবনা অত্যন্ত সঙ্গত।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিবেদক বারাকপুরের অধিবাসী নন, কিন্তু বারাকপুরের সম্বন্ধে এক হৈতুকী কৌতুহল তাঁর মনের মধ্যে জেগে ছিল অনেকদিন ধরেই। ব্যক্তিগত অন্বেষায় তাড়িত হয়ে একদা বারাকপুরের গঙ্গাধৌত গান্ধী ঘাটের সন্নিকটে তীরলগ্ন হয়ে কাটাতে হয়েছিল অনেকক্ষণ। সেই সময় থেকেই এই কৌতুহল দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠেছিল। কৌতুহল নিবৃত্তির উৎস সন্ধান প্রবৃত্ত হয়ে হতাশ হতে হয়েছে অনেকবার। অবশেষে, এই হতাশার কিঞ্চিৎ অবসান ঘটলো পুস্তিকাটি হাতে পেয়ে। অধ্যাপক কানাইপর রায় সম্পাদিত সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 'বারাকপুরের সেকাল একাল, প্রথম খণ্ড।' সুসম্পাদিত এই বিশেষ সংখ্যাটি উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্বর্তী বিচিত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত বারাকপুর মহকুমার মণিরামপুর নগরাঞ্চলের একটি প্রামাণ্য দলিল। সম্পাদককে ধন্যবাদ যে, তিনি এরকম একটি সুসম্পাদিত বর্ণিল পুস্তিকা-স্তবক

কৌতূহলী পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে একান্তভাবে একটি মানবিক কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। বসবাসের পরিতুষ্টি নিহিত থাকে বাসস্থানের সামগ্রিক জ্ঞাতব্যের অবহিতিতে। মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সেই প্রয়োজন সাধনে শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে বারাকপুরের নাগরিকগণের প্রতি যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, তার তুলনা নেই। বর্তমান প্রতিবেদকের মত বারাকপুরের একজন অনাবাসিকেরও ইতিহাস-চেতনা এতে সমৃদ্ধ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে সম্পাদক যাঁদের নিকট থেকে তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলী সংগ্রহ করেছেন তাঁরাও ধন্যবাদার্হ। পুস্তিকায় সংকলিত প্রবন্ধাবলী বিষয়ানুগ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুবিন্যস্ত। এর মধ্যে 'বারাকপুরের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধে শ্রী কানাইপদ রায় স্বল্প পরিসরে অত্যন্ত দক্ষতায় একটি অঞ্চলের সৃষ্টি রহস্যের উন্মোচন করেছেন এবং তাতে অপূর্ব নৈপুণ্য সজ্জিত হয়েছে শ্যামলী মহাপাত্র লিখিত এই মহকুমারই দেব-কন্যা হালিশহর জাতা 'মহীয়সী-নারী-রাণী রাসমণি'-র অতি সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যপূর্ণ বিবৃতি। সুচারু এই উপস্থাপনার অঙ্গে যদিও কিছু 'ইতঃস্তত-সঞ্চারমান' নগণ্য মুদ্রণ প্রমাদ দুর্নিবীক্ষ্য নয় এবং যা কোন অংশেই এই মহৎ প্রয়াসের মূল্যায়নে ক্ষুণ্ণতা ছড়াতে পারে নি। মণিরামপুরের কথায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সংক্ষেপে হলেও সংশ্লিষ্ট স্থানিক, ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসঙ্গের এক একটি প্রাথমিক অথচ সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে সফলকাম হয়েছেন বলে মনে হয়। মণিরামপুরের গর্ব রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনাবলীতে আনুষঙ্গিক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাবলী এবং জীবনী-কেন্দ্রিক কাহিনীর আশ্চর্য সমন্বয় অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপী ও অনেক অজ্ঞাত তথ্যানুসন্ধানে উদ্দীপনাসঞ্চারী। এ বিষয়ে অবশ্য একটি জিজ্ঞাসার অবকাশ সৃষ্ট হয়েছে 'বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। শ্রীআনন্দপ্রসাদ রায় স্যার সুরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান 'কলকাতার তারাতলা অঞ্চলে' লিখেছেন কি তথ্যনিষ্ঠ হয়েই, না কি মুদ্রণপ্রমাদ বশতঃ এ বিচ্যুতি? 'কলকাতার তালতলা' অনবধানতাবশে 'তারাতলা' হয়ে থাকলে মুদ্রাযন্ত্রের দায়বৃদ্ধি ঘটে। তা যদি না হয়, তবে এ বিষয়ে শ্রীরায় আলোকপাত করার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন। (দ্রঃ সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত 'বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯১)। এছাড়া, রাষ্ট্রগুরুর বিড়ম্বিত জীবনের দুটি উল্লেখ্য তথ্য দিয়ে শ্রীরায়ের রচনাকে সমৃদ্ধতর করা প্রয়োজন। একটি হল—১৯০৬ খ্রীঃ বরিশালে রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপরটি হল—গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পথে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয়, তখন তিনি ইংরাজ প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে এবং ইংরেজ সরকারের 'স্যার' উপাধি গ্রহণ করে অনেকের নিন্দাভাজন হন। (দ্রঃ

সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বাঙালি চরিতাভিধান, সংশোধিত ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯২)।

ছাউনি-শহর বারাকপুরের তথ্য-সমৃদ্ধ রচনাবলীর অন্তর্গত সিপাহীবিদ্রোহ-কেন্দ্রিক প্রবন্ধদ্বয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। কিন্তু এখানেও একটি জিজ্ঞাসা। সিপাহী মঙ্গলপাণ্ডের ছোঁড়া প্রথম 'গুলি' সার্জেন্ট হিউসনের গায়ে লাগেনি, অথচ সে মাটিতে পড়ে গেল। এই 'সে' কে? সার্জেন্ট হিউসন? না মঙ্গলপাণ্ডে? এদের যে কেউ হোক্—মাটিতে পড়ে যাওয়ার কারণ কি নিছক আত্মরক্ষার চেষ্টা? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকাশিত 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাঙ্‌লা' গ্রন্থেও এর কোন নিশ্চিত উত্তর নেই। অথচ 'ভারতের ইতিহাস অভিধানে বলা হয়েছে—মঙ্গলপাণ্ডের ছোঁড়া গুলিতে একজন ইউরোপীয় অফিসার নিহত হয়েছিল। "...Signs of unrest had appeared amongst the sepoys stationed at Berhampore and Barrackpore where on 29th March, 1857, a sepoy named Mangal Pandey murdered a European officer in broad daylight and had been suppressed : [দ্রঃ A Dictionary of Indian History : Published by Calcutta University, revised and Enlarged Edition 1972]। যতদূর জানি, এ বিষয়ে প্রথিত যশ IT ইতিহাসবিদ-দ্বয় Vincent Smith এবং Vanderkar ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহমতাবলম্বী। প্রবন্ধকার অধ্যাপক কানাইপদ রায় এ বিষয়ে যথার্থ আলোকপাত করলে সংশয়মুক্ত হওয়া যেত।

তাছাড়া, যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যাঙ্গাত্মক কাব্যেদ্ধৃতির উদ্দিষ্ট বিষয়ে সঠিক স্মরণিকা সাধারণ পাঠকের কাছে প্রবন্ধটিকে সহজগম্য ও অধিকতর প্রাঞ্জল এবং আস্বাদনীয় করে তুলতে পারত। প্রবন্ধটিতে এরকম একটি টীকার অনুভূত হল। তদানীন্তন সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে সমমনোভাবপন্ন হয়ে 'রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপটে'—কথাটি সকল ঐতিহাসিকের সমর্থনপুষ্ট না-ও হতে পারে। মনে হয়, সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়'-এ বর্ণিত 'মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগল'—কেবলমাত্র 'রাজশক্তির' ভীতি সঞ্চারের জন্য নয়—যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা বাঙালির সন্ত্রস্ত চিত্তকে তীব্র ব্যাঙ্গের কষাঘাতে প্রবুদ্ধ করতেও।

গ্রন্থশেষে তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর ভরপুর। বারাকপুরের ব্যবহারিক জীবনের একটি নিটোল ছবি এবং কয়েকটি মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র শোভিত এই পৃষ্ঠাগুলো গ্রন্থটিকে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

গ্রন্থটির সুপরিকল্পিত প্রচ্ছদ সোনায় সোহাগা যেন।

সাপ্তাহিক বর্তমান ঃ (২৯ এপ্রিল ২০০০)

'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই'—সেকালে বাঙালি চিন্তানায়েকের অন্তরে এ ছিল এক গভীর বেদনা। একালে আমরা আর সে বেদনা অনুভব করি না। কারণ, ঐতিহাসিকেরা বাঙলা দেশ ও বাঙালি জাতির সুবিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেছেন। কিন্তু তবু একথা বলতে বাধা নেই যে, আজও বাঙলা দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়নি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে "বারাকপুরের সেকাল-একাল প্রথমখণ্ড" (১৯৯৯) গ্রন্থটিকে ব্যতিক্রম হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গ্রন্থটি কোনও একজন রচিত বারাকপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। বহু লেখকের রচনার একটি সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন অধ্যাপক কানাইপদ রায় মহাশয়। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, খণ্ডে খণ্ডে বারাকপুরের কথা বলার পাশাপাশি এখানকার কোনও এক বা একাধিক জনপদের কথা তুলে ধরা হবে। যেমন, প্রথম খণ্ডের বিশেষ জনপদ হল—মণিরামপুর।

এই গ্রন্থের লেখকেরা সকলেই আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু বিষয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, সহজ ভাষায়, তথ্যপূর্ণভাবে প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। তবু বিশেষ করে অধ্যাপক কানাইপদ রায় রচিত 'বারাকপুরের উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটির কথা বলতে হয়। অত্যন্ত নিপুণ মুন্সিয়ানায় প্রবন্ধটি রচিত। তাছাড়া 'ফান্ ডেন্ ব্রোকের নকশা' (১৬৬০) গ্রন্থমধ্যে সংযোজিত হওয়ায় (১৭৫ পৃ.) গ্রন্থের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক গ্রন্থটি পাঠ করলে বারাকপুর অঞ্চলের অনেক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারবেন।

আজকাল ঃ (২৪ জুলাই ২০০০)

প্রসঙ্গ বারাকপুর

বহু বিস্তৃত আমাদের এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ। শহর, নগর, গ্রামগঞ্জ ছড়িয়ে প্রান্তে প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা এই রাজ্যের কিছু কিছু জনপদ নিয়ে এর আগে অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে অনেকের উদ্যোগে। বাংলার সমৃদ্ধ ইতিহাসের ছবি তো আদতে সেই সব স্থানিক ইতিহাসের হাত ধরেই। সম্প্রতি এমনই একটি স্থানিক ইতিহাসের চালচিত্র হাজির করেছে সাহিত্য-বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে'। কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় এই প্রকাশন থেকে বেরিয়েছে 'বারাকপুরের সেকাল একাল'-এর প্রথম খণ্ড। রাজ্যের মানচিত্রে বড় শিল্পাঞ্চল হিসেবে বর্তমানে পরিচিতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এই মহকুমা শহরটির। এই শহরেরই ইতিহাস ঘাঁটতে প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত পেছনের দিকে এগোতে সক্ষম হয়েছেন সম্পাদক মশাই। এই দীর্ঘ সময়রে পথে নানা উত্থান-পতন, ব্রিটিশদের ভারী

বুটের আস্ফালন, তার বিরুদ্ধে মঙ্গল পাণ্ডের অসি আর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মসির লড়াই এই শহরের চারিত্রলক্ষ্যন যুক্ত করেছে আলাদা মাত্রা। দু'বাংলার মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ভিন প্রদেশের সংস্কৃতিও। সবাইকেই বুকে ধরেছে 'শ্রমিকের পীঠস্থান' এই শিল্পশহরটি। নানা তথ্য, পরিসংখ্যান, মননশীল নিবন্ধ, প্রবীণ মানুষদের স্মৃতিচারণ, পুরনো দলিল-দস্তাবেজ, মানচিত্র এইসব ঘেঁটে আবিষ্কৃত হয়েছে বারাকপুরের সেকাল-একাল। চারটি অধ্যায়ে বিধৃত এই গ্রন্থে শহরের উৎস সন্ধান ছাড়াও অন্যান্য অধ্যায়ে তথ্য-পরিসংখ্যানে বারাকপুর, ছাউনি শহর এবং এলাকার প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ মণিরামপুর নিয়ে আছে একটি গোটা অধ্যায়। নানা জনের লেখায় এই অঞ্চল, এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্রগুরু এবং গান্ধীজির স্মৃতি, উৎসব, মন্দির, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধূলা, পত্রপত্রিকা, আদিবাসী সমাজ এবং আরো বিষয়ে আলো পড়েছে।

প্রতিবেদন ঃ উত্তর ২৪ পরগণা (৩০ নভেম্বর ১৯৯৯)

তথ্যে সমৃদ্ধ 'বারাকপুরের সেকাল একাল'—*গৌতম চন্দ্র কুর*

অতীত ছাড়া অসম্পূর্ণ বর্তমান। বর্তমানকে জানতে হলে অতীতকে জানতেই হবে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই অতীতকে জানার সুযোগ ভীষণভাবে কম। তেমন পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। সরকার কিংবা প্রশাসনও বর্তমান প্রজন্মকে অতীত অর্থাৎ ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার কোন উদ্যোগ নেয়নি। তবুও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের একটা স্বভাবজাত আগ্রহ থাকেই। ইতিহাস রসহীন, কষহীন তবুও ইতিহাস জানার প্রবল আগ্রহ সবার রয়েছে। সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকার সম্পাদক কানাইপদ রায় অন্ততঃপক্ষে ধন্যবার্দাহ 'বারাকপুরের সেকাল-একাল' জানানোর উদ্যোগ নেওয়ায়।

বারাকপুর কেন বারাকপুর হলো অর্থাৎ বানান কেন বদলে গেল এই জিজ্ঞাসাকেও নিরসন করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বারাকপুরের মনিরামপুর জনপদকে আলোকপাত করা হয়েছে মনিরামপুরের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য, ঘটনা জানা গেল। উত্তর বারাকপুর পৌরসভার জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত পৌরপ্রধান ও উপপৌরপ্রধানের নাম তাদের মেয়াদের সময়সীমা নিয়ে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মণিরামপুরের প্রসঙ্গে আলোকপাত করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এসেছে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির প্রসঙ্গ। রাষ্ট্রগুরুকে নিয়ে বেশ কিছু লেখা মুদ্রিত হয়েছে। তার মধ্যে অবশ্যই রত্ন হচ্ছে জাতির জনক মহাত্ম গান্ধীর লেখা ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২৫ সালের ১৪ মে বৃহস্পতিবার 'দ্য সেজ অব বারাকপুর' ও ১৯২৫ সালের ১৩ আগস্ট সংখ্যায় 'দ্য লায়ন অব

বেঙ্গল' নামে দুটি অমূল্য লেখা লিখেছিলেন। সেই লেখা দুটি পড়ার সৌভাগ্য লাভের সুযোগ পেলেন পাঠক। কানাইলাল ঘোষের 'রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঋজু ব্যক্তিত্ব', আনন্দপ্রসাদ রায়ের 'বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ', স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট' তথ্যমূলক লেখা। এছাড়া শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মণিরামপুর সদর বাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল একাল', কানাইপদ রায়ের 'মণিরামপুরের মন্দির ও উৎসব', শঙ্কর আচার্যের 'নাট্যচর্চায় মণিরামপুর', শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মণিরামপুরের পথ পরিচয় ও আদিবাসী সমাজ' গবেষকদের কাছে ভীষণ মূল্যবান। মণিরামপুরের স্কুল, শ্মশানঘাট, পরিবহন, ফেরী ঘাট, লোকসংখ্যার তালিকা, পাড়ার কথা, বাজপড়া প্রবন অঞ্চল, মহিলা সমিতি, নতুন বাজার সহ প্রয়োজনীয় তথ্যে ঠাসা কানাইপদ রায়ের 'তথ্য ও পরিসংখ্যানে মণিরামপুর'।

ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ যাদের গবেষণার কাজে যারা নিয়োজিত তাদের কাছে এই গ্রন্থ অবশ্যই প্রয়োজনীয় 'মেড ইজি'র মতো পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তথ্য আর পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ অনিসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে তা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বারাকপুরের বাকি জনপদ নিয়েও প্রকাশিত হবে এমন গ্রন্থ। আশা করবো প্রতিকূলতাকে সরিয়ে রেখে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ নেবে।

পৌর ও গ্রামীণ সংবাদ ঃ (৭-১২-৯৯)

বারাকপুরের সেকাল একাল ঃ একটা সময়োচিত প্রয়াস—*সুকুমার মিত্র*

ইতিহাসে আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে বহু আলোচনা হলেও কাজের কাজ হয়েছ সেই তুলনায় অনেক কম। তাই যখন আঞ্চলিক ইতিহাসের উপাদানকে এক জায়গায় জড়ো করার প্রয়াস কেউ নেন তখন অবশ্যই সেই উদ্যোগকে প্রশংসা জানাতেই হয়। 'নগর পেরিয়ে' পত্রিকা সম্পাদক 'বারাকপুরের সেকাল একাল' সম্পাদনাও তাই অবশ্যই প্রশংসনীয়। চারটি অধ্যায়ে ৪৫টি নিবন্ধ নিয়েই 'বারাকপুরের সেকাল একাল' মধ্যযুগ থেকে শুরু করে হালফিলের ঘটনাকে একটা জায়গায় সংকলনে সম্পাদনাগত নৈপুণ্য নজর কাড়ে। তবে বারাকপুর মহকুমার চটকল শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে বারাকপুরের ইতিহাস অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ও পানিহাটি কিংবা কাঁঠালপাড়া ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বা ভাটপাড়ার পণ্ডিত সমাজ শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ অথবা মূলাজোড় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস পৃথক পৃথক অধ্যায়ে সংযোজিত হিসেবে মনোযোগী পাঠককুল আশা করতেই পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গেও বারাকপুর মহকুমার গভীর সম্পর্ক ছিল। কুলিয়া গ্রামে তিনি এসেছিলেন নদী পথ

ধরে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বারাকপুর এই ভাবনায় ভাবিত হলে সম্পাদক অনেক মূল্যবান সম্পদ হয়তো উপহার দিতে পারতেন। আশা করবো পরবর্তী খণ্ডে এই বিষয়গুলি থাকবে। তবে এরই মাঝে যাঁরা চেয়েছেন ইতিহাসের কিছু উপাদানকে গ্রথিত করে একটা গ্রন্থ প্রকাশ পাক তাঁদের সদিচ্ছাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এঁদের বেশ কিছু লেখা বেশ মূল্যবান। বিশেষ করে সম্পাদক কানাই পদ রায়ের বারাকপুরের উৎস সন্ধানে, সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তীর বিস্মৃতি প্রায় রাষ্ট্রগুলি সুরেন্দ্রনাথ, কানাইলাল ঘোষ, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এক ঋজু ব্যক্তিত্ব, মণিরামপুর, রাষ্ট্রগুরু ও মহাত্মা গান্ধী সুপ্রিয় মুন্সীর লেখা থেকে বিরল কিছু তথ্য জানা গেল। বিড়ম্বিত অথচ গৌরবান্বিত সুরেন্দ্রনাথ আনন্দপ্রসাদ রায় সুরেন্দ্রনাথকে অন্যভাবে মূল্যায়ণ করেছেন। বেঙ্গলি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতি এলেখা থেকে জানা যায়। স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবধন মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর আচার্যের নাট্য চর্চায় মণিরামপুর, সদর বাজারে সঙ্গীত চর্চার সেকাল ও একাল শিবরতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিশ্রমী লেখা। রারাকপুরের দুটি সিপাহী বিদ্রোহ কানাইপদ রায়ের তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধ। বারাকপুর মহকুমার নানা তথ্য ফান ডেন ব্রোকের মানচিত্র ও কিছু আলোকচিত্র সংযোজনে বইটি অনেকাংশে সর্বাঙ্গ ীন হয়ে উঠেছে। সুন্দর প্রচ্ছদ, অলংকরণ ছাপা ও বাঁধাই নজর এড়িয়ে যায় না। এই ধরনের আঞ্চলিক ইতিহাসের আরো আরো উপাদানকে জড়ো করার উদ্যোগ নিক নগর পেরিয়ে। বারাকপুরের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস রচনায় বারাকপুরের সেকাল একাল একটা আকর গ্রন্থ হিসেবে তার মর্যাদা একদিন পাবেই। বারাকপুরের সেকাল একাল অবশ্যই একটা সময়োচিত প্রয়াস বলা যায়।

গণশক্তি (৭-১০-৯৯)

সাহিত্যসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বারাকপুর ঃ 'নগর পেরিয়ে' সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে সম্প্রতি গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ে সাহিত্য সভা হয়।

সভায় বারাকপুরের ইতিহাস সম্বলিত 'সেকাল-একাল' গ্রন্থটির প্রকাশ করা হয়। আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর ড. শ্যামলকান্তি চক্রবর্তী।

গাঙ্গেয়বার্তা ঃ (১৬-২-২০০০)

বারাকপুর পরিক্রমা ঃ সেকাল থেকে একাল—*শিবাশিস দেবরায়*

"...at the end of March the 34th sepoy Regiment, stationed at

Brrackpore, allowed one of its men to advance with a loaded musket upon the paradeground in front of the line and, after having called his comrades to mutiny, he was permitted to attack and wound the Adjutant and sergeant Major of his regiment.'' মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর লেখাতে 'The first was of Independence'-এ এভাবেই উঠে এসেছে বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা বারাকপুরের কথা। বারাকপুর বলতেই অবধারিতভাবে যা মনে পড়ে যায় তা হ'ল সিপাহী বিদ্রোহ—মাত্রাছাড়া সরকারি জিঘাংসার বলি মঙ্গল পাণ্ডে রচনা করলেন আমাদের পরিপুষ্ট চেতনার পটভূমি। 'সেই সময়' উপন্যাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনীতে—''মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগল বারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে...। অফিসারদের কোয়ার্টারে অতি বিশ্বস্ত আর্দালি, সহিস ও বাবুর্চিদের যেন আর তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন।'' কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় 'বারাকপুরের সেকাল একাল' বইটি অতি পরিচিত বারাকপুরের হাজারো আজানা দিকের সন্ধানী। একটি নয় দু-দুটি সিপাহী বিদ্রোহের জন্ম এই বারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩৩ বছর আগে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দেই বড়মাপের একটি বিদ্রোহ করেছিলেন এখানকার সিপাহীরা। ব্রহ্মদেশে যুদ্ধের জন্য সেনা পাঠানোর নির্দেশ বারাকপুরের সেনা ছাউনিতে এলে ৪৭ নং বেঙ্গল ইনফ্যানট্রি যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে, যা থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত। বারাকপুরের উৎস সন্ধানে পাওয়া যায় বারাকপুর, নবাবগঞ্জ, মণিরামপুর-এর আদি নাম ও আঞ্চলিক বিস্তৃতি। বারাকপুর সাহিত্য-ভূমি যাঁদের অবদানে উর্বর তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীরও সাহিত্যকর্মের সশ্রদ্ধ উল্লেখে বইখানি প্রকৃতই সমৃদ্ধ হয়েছে। বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকলেও মহাত্মা গান্ধী যাঁকে নির্দ্বিধায় বলেন 'বাংলার সিংহ', 'বারাকপুর মহাজ্ঞানী' তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বারাকপুর ও রাষ্ট্রগুরুর অচ্ছেদ্য বন্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাত্মাজীর লেখায়— ''I was privileged to visit sir Surendranath Benerjee at his residence at Barrackpore ... Nothing could keep him over night in Calcutta. It might almost be said that he never missed his last train for Barrackpore. রাষ্ট্রগুরুর স্মৃতিবিজড়িত মণিরামপুর লেখার লেখায় উন্মোচিত হয়ে কখন যেন পরিণত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রভূমিতে। মণিরামপুর-এব শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, খেলাধূলা, নারী সমাজ, উৎসব অনুষ্ঠান, অধ্যাত্ম চেতনা পথ পরিচয় এবং আদিবাসী সমাজ এক কথায় মণিরামপুরের সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এক আবেশী পরিক্রমা বলা যায় বইটিকে। ১৯১৬ সালে ২৯ ফেব্রুয়ারি মণিরামপুর এম. ই. স্কুলের সেক্রেটারিকে লেখা প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের তৎকালীন

স্কুল পরিদর্শক W. C. Wordswoth-এর লেখা চিঠি এবং এমন আরও কিছু চিঠিপত্রের সংযোজন বইটিকে আকর্ষণীয় করেছে। চতুর্থ অধ্যায়ে তথ্য ও পরিসংখ্যানে বারাকপুর শীর্ষক অংশে — উত্তর বারাকপুর পুরসভার এলাকা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, পুরপ্রধান ও উপপ্রধানদের নামের তারিকা ও সময়কাল, থানা, পোস্টঅফিস, পত্র-পত্রিকার পরিচয় ইত্যাদি প্রয়োজনীয় তথ্য স্থান পেয়েছে। এছাড়া আরও আছে একালের ব্যক্তিত্ব এবং ফিরে দেখা। স্পষ্ট ছাপা, সুন্দর বাঁধাই এবং ঝক্‌মকে পরিপাটি প্রচ্ছদে কানাইপদ রায়ের সম্পাদনায় 'বারাকপুরের সেকাল একাল' প্রকৃতই সংগ্রহ রাখার মত একটি বই।

কলকাতা দূরদর্শন

২৪ অগস্ট ১৯৯৯ কলকাতা দূরদর্শনের রাত্রি ১০.২০ মিনিটের বাংলা সংবাদে 'বারাকপুরের সেকাল একাল' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশের সংবাদটি পরিবেশন করা হয়।

কথাসাহিত্য ঃ (মে ২০০০, মিত্র ঘোষ পাবলিসার্স, কলকাতা)

গ্রন্থজিজ্ঞাসা—*অরুণ মুখোপাধ্যায়*

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'বারাকপুরের সেকাল একাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড। চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে রয়েছে বারাকপুরের উৎস সন্ধান, আলাদাভাবে মণিরামপুরের কথা, ছাউনী শহর এবং তথ্য, পরিসংখ্যান সমৃদ্ধ শহরের আদি ও বর্তমান কথা।

বারাকপুরের পূর্বনাম ছিল চানক। জনপদ হিসেবে চানকের নাম প্রথমে পাওয়া যায় বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসাবিজয়' কাব্যে। "চানক বহিয়া যায় বুড়নিয়ার দেশ/তাহার মেলান আছে আকনা মাহেশ।" দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী' কাব্যেও চানক-এর উল্লেখ আছে। "মুলাযোড় ইচ্ছাপুর সশস্ত্র চানক,/বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয় রঞ্জক।"

পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে স্থানটির নাম ছিল চানক, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই স্থানই নাম বদলে হয়ে যায় ব্যারাকপুর। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানীর সৈন্যরা এখানে এসে ব্যারাক তৈরি করেন। তা থেকেই এই স্থানের নাম ব্যারাকপুর হয়েছে বলে মনে করা হয়।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, মোহিতলাল মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, ঈশ্বর গুপ্ত, রামকমল সেন, রামপ্রসাদ সেন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র যাঁরা এই অঞ্চলের সঙ্গে জন্ম বা কর্মজীবনে জড়িত, তাঁদের নিয়ে নিবন্ধ লিখেছেন গ্রন্থের সম্পাদক কানাইপদ রায়। মহীয়সী রাণী রাসমণির কর্মের প্রসারতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, অনন্য তেজস্বিতা, অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্নেহের মহিমায় কীভাবে লোকমাতা হয়ে উঠেছিলেন, তা রীতিমত পড়তে ভাল লাগে।

মণিরামপুরের কথায় প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখেছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাচনিক দিক নিয়ে। ব্যক্তিত্ববান সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে কানাইলাল ঘোষের লেখাও মূল্যবান। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে (A National in Making) লিখেছেন, "প্রথম থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনে তিনটি আদর্শ ছিল, যথা (১) স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিভিন্ন জাতিকে সংঘবদ্ধ করা (২) হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন এবং (৩) জনসাধারণের উন্নতি বিদান করে প্রত্যেক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ স্থাপন।" এই সমস্ত ভাবনা বইয়ের পৃষ্ঠায় থেকে গেল—কাজে আর হল কতটুকু! এটা ভাবতেই বেদনা জাগে।

আনন্দপ্রসাদ রায় বিড়ম্বিত সুরেন্দ্রনাথকে তুলে ধরেছেন। মুদ্রিত হয়েছে সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ১৯০৯ সালের ট্রাস্ট দলিলের অনুলিপি, মহাত্মা গান্ধীর লেখা রাষ্ট্রগুরু সম্পর্কিত লেখা। স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রগুরুর বাড়ি এবং রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউট্-এর প্রাকৃতিক রূপ ও সাংগঠনিক রূপ তুলে ধরেছেন।

মণিরামপুর কপালেশ্বর (বিস্মৃত অধ্যায়), সারদেশ্বরী আশ্রম, এই অঞ্চলে বিবেকানন্দের আগমন, অলৌকিক ঘটনা, মন্দির, মসজিদ, উৎসব, সংগীতচর্চা, নাট্যচর্চা, নতুন তথ্যের সন্ধান দেবে। মণিরামপুরের পথ পরিচয় ও আদিবাসী সমাজ, বিদ্যালয়, টোল, খেলাধূলা—কিছুই তথ্যপরিসংখ্যানে বাদ নেই। এমন একটি অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক উপহার দেবার জন্য সম্পাদক ও লেখকবৃন্দ অসংখ্য ধন্যবাদ পাবেন।

(পরবর্তী খণ্ডে আরো পর্যালোচনা প্রকাশিত হবে)

'বারাকপুরের সেকাল একাল' প্রথম খণ্ডের ছাপার ভুল প্রসঙ্গে

পৃঃ	হবে না	হবে
২১	১০অক্টোঃ	১০ নভেঃ
৪২	তারাতলা	তালতলা
১৬৫	শক্তিপদ	শশীপদ

১৯৪০ সালে কাঁচরাপাড়ার হাইন্ডমার্সে সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে নজরুল আসেন। সৌজন্য : মণি ভট্টাচার্য।

লেডি ক্যানিং
সাহিত্যিক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সুকান্ত সদন, বারাকপুর। ছবি : অরুণ দাস।
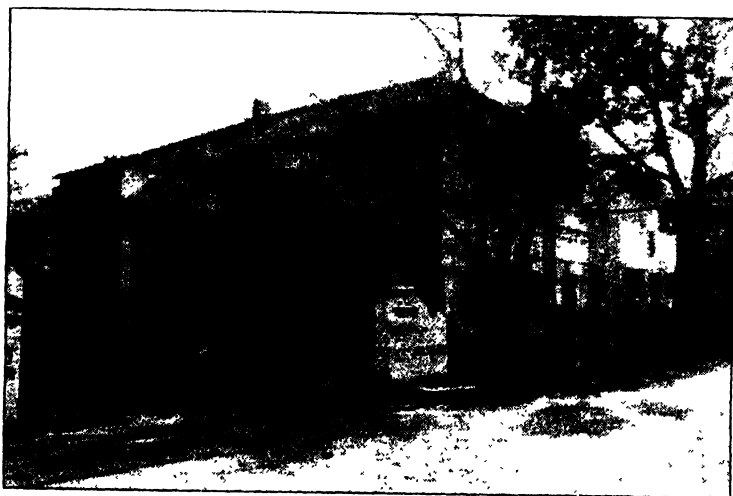
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ স্মৃতি বিজড়িত ১২৫ বছর অতিক্রান্ত উত্তর বারাকপুর পুরসভা। সৌজন্য : স্মরণিকা উত্তর বারাকপুর পুরসভা, এপ্রিল ১৯৯৬।
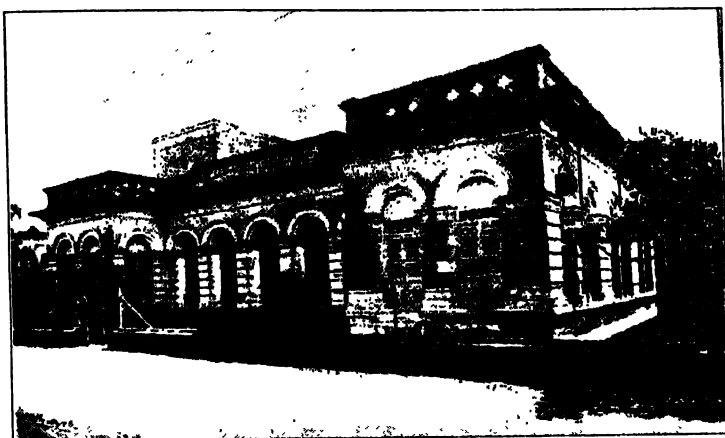
সেকালের নবাবগঞ্জে শ্রীধর বংশীধর স্কুল।
সৌজন্য : বংশ পরিচয়-জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সংকলিত-১৩৩৬।

ইছাপুর আদিবাসীপাড়ায় 'ঠুমকি নৃত্য'।
ছবি : প্রলয় ভট্টাচার্য।